জীবন রক্ষায় সংগ্রাম

প্রবন্ধ সংকলন

জীবন রক্ষার সংগ্রাম

জীবন রক্ষায় সংগ্রাম

প্রবন্ধ সংকলন

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ডাঃ শান্তিদাকান্ত রায়

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Сборник статей

На языке бенгали

সূচি

ভূমিকা ৫

ক্যান্সার রহস্য। ল. আ. জিলবের ৮

জীবনের উৎস। আ. আ. বাগ্দ্যাসারভ ৪৮

হৃৎপিন্ডের অস্ত্রচিকিৎসা। ব. ভ. পেত্রভস্কি ৬৯

মস্তিষ্কের অস্ত্রচিকিৎসা। এ. ই. কান্দেল ৮৭

মুখমণ্ডলের অস্ত্রচিকিৎসা। ন. ম. মিহেলসন ও ম. ব. কুশনির . ১২৯

জীবন রক্ষার সংগ্রাম। ভ. আ. নেগোভস্কি ১৫৫

দ্বিতীয় হৃৎপিন্ড। ভ. প. দেমিখভ ১৮৫

পলিওমাইয়েলাইটিস বিজিত। ম. প. চুমাকভ ২১২

ভূমিকা

বিজ্ঞানের দ্রুততম অগ্রগতির এই যুগে, বর্তমান শতাব্দীতে, মানুষের অন্য নানা বিষয়ের জ্ঞানের মতই চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নত হচ্ছে ও দ্রুত প্রসার লাভ করছে। অবশ্য এমন এক একটা সময় আসে যখন অন্যান্য বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্যের পাশে এই বিজ্ঞানের সাফল্য ও অগ্রগতি তেমন আর চোখে পড়ে না। তাহলেও আমাদের কখনও ভোলা উচিত নয় যে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিযুক্ত মানুষের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ ও তারই চিকিৎসায়। দুনিয়ার যে কোন যন্ত্র বা কলকব্জার চেয়ে তা ঢের জটিল।

প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, পরজীবী-উদ্ভূত টাইফাস প্রভৃতির মতো মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি যার ফলে আগে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাত তা এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বুক থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে। ম্যালেরিয়া এখন এদেশে নেই বললেই চলে, অথচ বিশ তিরিশ বছর আগে এ দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগত লক্ষ লক্ষ লোক। ডিপথেরিয়া রোগও নির্মূল হতে চলেছে; নিউমোনিয়া, এপেন্ডিসাইটিস, আমাশয়, যক্ষ্মা উদ্ভূত মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি আরও অন্যান্য রোগে এ যুগে লোকে আর মরে না বললেই চলে। যক্ষ্মা রোগের মৃত্যুর হারও এখন এদেশে বহুগুণ কমেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের সংখ্যাগত শুকনো হিসাব পত্রের মধ্যে সোভিয়েত জনগণের উন্নত ও সবল স্বাস্থ্য সপ্রমাণ করে এমন অনেক চমৎকার চমৎকার তথ্য আছে। সোভিয়েত শাসনের বছরগুলিতে এ দেশে রোগ ভোগের সংখ্যা প্রচুর কমেছে। মৃত্যুর হার কমেছে ৪ গুণ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমেছে প্রায় ৭ গুণ, দুগুণেরও বেশী বেড়েছে মানুষের আয়ু। এ দেশে এখন লোকে গড়পড়তা ৭০ বছর বাঁচে, বিপ্লবের আগে তা ছিল মাত্র ৩২ বছর।

কী করে বাস্তবে এই সাফল্য সম্ভব হল? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে বলতে হয় যে সর্বাগ্রে এর মূলে সোভিয়েত শাসন ও এ দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যার ফলে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও প্রতিনিয়ত উন্নত হয়ে এগিয়ে চলেছে মানুষের জীবন ধারণের মান, তার শিক্ষা ও দীক্ষা।

সোভিয়েত শাসনের বছরগুলিতে এ দেশের সর্বত্র তৈরী করা হয় ব্যাপক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বেড়াজাল যার দ্বারা সম্ভব হয়েছে দেশের সমস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

দুনিয়ায় এমন আর একটিও দেশ নেই যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এত ডাক্তার জনগণের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিযুক্ত। ৫০০ হাজার ডাক্তার ও ১,৫০০ হাজার সহকারী ডাক্তার ও নার্সদের এক গোটা সেনাবাহিনী এ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করছে।

সারা দুনিয়ায় যত ডাক্তার আছে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বা গোটা ইউরোপের ডাক্তার সমষ্টির অর্ধেকেরও বেশী সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯১৩ সালে গোটা রাশিয়ায় যত ডাক্তার ছিল এখন মাত্র এক বছরে তত ডাক্তার সোভিয়েত ইউনিয়নের ডাক্তারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাশ করে বেরোয়।

সোভিয়েত জনস্বাস্থ্য রক্ষার অগ্রগতির পিছনে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি শিল্প ও ওষুধ শিল্পের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রতি বছর বেরুচ্ছে ভাল ভাল, নতুন নতুন ওষুধ এবং যেমন ওষুধ তেমনি ডাক্তারী অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আজ প্রায় ২০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডাক্তারী কেন্দ্রীয় সংগঠন — সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমী। সবচেয়ে সেরা ও সবচেয়ে আধুনিক নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি সজ্জিত বহু ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক ও লেবরেটারী সেই আকাদমীর অন্তর্ভুক্ত। তাতে দেশের বাইরে ও দেশের ভিতর নাম ছড়িয়ে গেছে এই রকম প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাই যে শুধু কাজ করেন তা নয়। তাঁদের সঙ্গে কাজ করেন বহুসংখ্যক উদীয়মান ও পারদর্শী অল্পবয়স কর্মী।

কী বিষয় নিয়ে কাজ করছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা? আমরা যখন চিকিৎসা, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যের কথা বলি তখন সর্বদাই আমাদের মনে পড়ে যায় এখনও পর্যন্ত কত প্রশ্ন ও কত সমস্যা রয়েছে যার সমাধান হয়নি।

মানুষের মারাত্মক শত্রু, যে সব ব্যাধি আজও পর্যন্ত অজেয় রয়েছে এবং বিজ্ঞানের শক্তিশালী আক্রমণের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে চলেছে তাদের আমরা ভাল করেই জানি। যদিও বছরের পর বছর সে সব ব্যাধির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে তাহলেও এখনও পর্যন্ত তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। উপরোক্ত এই সব ব্যাধির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে ক্যান্সার ও আরও অন্যান্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, হৃৎপিন্ড ও রক্তের শিরার নানান রোগ এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি। তাই অপারেশন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্রচিকিৎসক, মাইক্রোস্কোপের উপর ঝুঁকে মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কুকুরের উপর পরীক্ষাকারী ফিজিওলজিস্ট, নতুন ওষুধের গুণ পরীক্ষাকারী ফার্মাকলজিস্ট এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা মানুষের এই সব জাত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত জীবন মরণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত মন্ত্রিমণ্ডলী ১৯৬০ সালের ১৪ই জানুয়ারি, 'সোভিয়েত জনগণের চিকিৎসার আরও উন্নতি এবং জনস্বাস্থ্যের আরও উন্নত ব্যবস্থা' এই শিরনামায় এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। সেই সিদ্ধান্তে

তাঁরা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আহ্বান জানান যার দ্বারা ডিপথেরিয়া, তুলারিমিয়া, পলিওমাইয়েলাইটিস প্রভৃতি রোগ যা এখনও দেশের কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে আছে তা নির্মূল করা যায়। সেই সঙ্গে টাইফয়েড, হুপিংকফ, ক্রিমী, অন্ত্রের ইনফেকশন ও ব্রুসেলোসিস প্রভৃতি রোগ প্রভূত পরিমাণে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা অবলম্বনেরও তাঁরা নির্দেশ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের সামনে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার নিম্নলিখিত জরুরী সমস্যা সমাধানে সর্ব শক্তি দিয়ে মনোনিবেশ করতে আহ্বান জানান। তাতে ছিল যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, সেপ্টিক টন্সিল, হামজ্বর প্রভৃতি আরও অন্যান্য রোগের ঔষুধপত্র ও কার্যকরী চিকিৎসার উপায় এবং রোগ প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে। শিশু মৃত্যুর হার আরও কমিয়ে আনার উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে দেশময় স্যানাটোরিয়াম, বিশ্রাম কেন্দ্র, অতিথিশালা ও গরমের সময়ে গিয়ে বিশ্রাম করা যায় সেই ভাবে সুসজ্জিত স্থানের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হবে। তাছাড়াও, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ওষুধপত্রের দামও খুবই কমানো হয়।

বর্তমান পুস্তকের লেখকেরা সকলেই সোভিয়েতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং প্রত্যেকেই নিজ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বড় পণ্ডিত। এই প্রসঙ্গে এ বললেই যথেষ্ট হবে যে এই পুস্তকের লেখকদের অর্ধেকেরও বেশী হলেন সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর পূর্ণ বা সহকারী সদস্য।

মানব জাতির জ্ঞানের এক প্রশস্ত ও বহুমুখী অংশ জুড়ে আছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মধ্যে বহুসংখ্যক যে যে বিষয় একত্র সংহত তার প্রত্যেকটি বিষয়কেই অনায়াসে পৃথক পৃথক স্বাধীন বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা চলে। স্বভাবতই অল্পপরিসর এই পুস্তকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভবও নয় বা সে উদ্দেশ্যও আমাদের ছিল না। তা না হলেও আমাদের মনে হয় যে বর্তমান পুস্তকে ডাক্তারী বিজ্ঞানের অনেক অতি প্রয়োজনীয় ও উপভোগ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে সমস্যাগুলিকে সাধারণভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'মূল সমস্যা' নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তাই আমরা আশা করি যে এই পুস্তকে বিজ্ঞানী চিকিৎসকেরা নিজ কাজ, তার সাফল্য, তার সামনেকার সমস্যা বা তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা পাঠকদের আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর
সহকারী সভাপতি প্রফেসর
ভ. দ. তিমাকভ

ল. আ. জিলবের
সোভিয়েত ইউনিয়নের
চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর
পূর্ণ সদস্য

ক্যান্সার রহস্য

মরুভূমির পটভূমিকায় আলাপ আলোচনা

অভিযানের সদস্যেরা পরিশ্রান্ত। কী কষ্টের মধ্য দিয়েই না মাসগুলো গেছে, কী ভয়ানক পরিশ্রমটাই না তাদের করতে হয়েছে! সে যেন একেবারে দম আটকানো গরম। আর কি ধুলো! বালির কণা মিশ্রিত সেই ধুলো দাঁতে পড়ে করকর করে ওঠে, কানের মধ্যে ঢুকে যায়, বাতাস না থাকলেও তার থেকে রেহাই নেই। কত জিনিস জানা গেল! এই উত্তপ্ত মাটির গভীরে হাজার হাজার বছর ধরে যা লুকিয়ে ছিল মানুষের দৃষ্টির অগোচরে তা আজ ধরা পড়ল। মিশরের মানুষ সেদিন অতি যত্ন সহকারে চেষ্টা করেছিল তাদের দেহাবশেষ যাতে কেউ কোনদিন স্পর্শ করতে না পারে, যাতে তার শান্তি ভঙ্গ না হয়। চার হাজার বছর পর এই শুধু আজই তার প্রথম শান্তি ভঙ্গ হল।

যা সংগ্রহ করা গেল তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বিরাট। মিশরের প্রাচীন রাজাদের কবরগুলিতে যা পাওয়া গেছে তাই নিয়ে গবেষণার কাজ শেষ করতে বছরের পর বছর সময় লাগবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাঁবুর প্রবেশপথের কাছে বসে আছে অভিযানের বৈজ্ঞানিক কর্মীরা।

'হ্যাঁ, ডাক্তার! রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া গেল কি?' অভিযানের নেতা একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর পেশা নয়, অথচ এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে তিনিও সমান আগ্রহশীল।

'ফল যা পাওয়া গেছে তাতে করে আর কোনই সন্দেহ থাকে না যে ওটা হল হাড়ের "সার্কোমা"।'

'"সার্কোমা"? সে আবার কি রোগ?'

'ক্যান্সারও যা এও তাই। দেহযন্ত্রের এক বিশেষ ধরনের টিস্যু (tissue) আক্রান্ত হলে তাকে বলা হয় ক্যান্সার; অন্য ধরনের টিস্যু আক্রান্ত হলে "সার্কোমা"। ক্যান্সার হল মানব দেহের আবরণী বা গ্ল্যান্ড টিস্যুর টিউমার আর "সার্কোমা" হল সংযোজনী বা কানেক্টিভ টিস্যু ও তার থেকে মাংশপেশী হাড় প্রভৃতি যে সমস্ত দেহযন্ত্রের অংশ জন্ম নিয়েছে, তার টিউমার।'

'কিন্তু আপনার এই সিদ্ধান্তটি ঠিক তো?'

'এতে আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। রঞ্জনরশ্মির ফটোগ্রলো বড় বড় বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা সকলেই এ ডাইয়াগ্নোসিস সমর্থন করেছেন।'

'অর্থাৎ আপনি কি তাহলে বলতে চান যে আজ থেকে ৪ হাজার বছর আগে যে য্ববয়সী মিশরীয় ফারাওটি বাস করে গেছে সে মরেছিল "সার্কোমা" রোগে? সত্যিই কি তাহলে এই বিংশ শতাব্দীর মতই তখনও মান্ষের টিউমার হত?' প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁর আশ্চর্য হয়ে যাবার ভাবটি গোপন করলেন না।

'হ্যাঁ, উর্তের অস্থির "সার্কোমা" রোগেই সে প্রাণ হারায়। বহ্ প্রমাণ পাওয়া যায় যে ক্যান্সার রোগ আজ পৃথিবীতে চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগেকার এবার্সের প্যাপিরসে ক্যান্সার জাতীয় টিউমার সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া আছে। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের রচনায়ও অন্র্প টিউমারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকালের বিখ্যাত চিকিৎসক হিপক্রাটিস যে শ্ধ্ ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে জানতেন তাই নয় তিনি ঐ রোগটিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে যান।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন কেন এই জাতীয় রোগের নাম রাখা হল ক্যান্সার?' প্রত্নতত্ত্ববিদ একটু ম্চকি হেসে ডাক্তারকে বললেন, 'আপনাদের প্রাচীন বিজ্ঞানে অবশ্য বহ্ বেয়াড়া ধরনের জিনিস আছে, কিন্তু তাহলেও টিউমারকে ক্যান্সার নাম দেওয়ার ব্দ্ধিটি কার মাথায় এল?'

'ঠিকই বলেছেন, কাঁকড়ার চেহারার সঙ্গে বেশীর ভাগ টিউমারেরই কোন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু তাহলেও চামড়ার উপরকার কতগ্লি টিউমারের চেহারা সাম্দ্রিক কাঁকড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।' ডাক্তার একটা কাঠি দিয়ে বালির উপর এ'কে দেখালেন কী ভাবে ক্যান্সার প্রসার লাভ করে, 'ভেবে দেখলে যেন একটা থাবার চিত্রের কথা কল্পনা করা যায়, — অবশ্য তা ভাবতেও স্দূরপ্রসারী কল্পনার প্রয়োজন।'

'দ্ঃখের বিষয় এই যে এরকম কল্পনা বিলাসিতা আধ্নিক ডাক্তারদের চরিত্রেও যথেষ্ট রয়েছে।'

'কেন, দ্ঃখের বিষয় হতে যাবে কেন? কল্পনা ছাড়া কি বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা ভাবা যায়? যেমন যেমন সঠিক তথ্য সংগৃহিত হবে তেমন তেমন বাস্তব থেকে সরে যাওয়া, অতি কল্পনা প্রসূত বেঠিক তত্ত্ব বাতিল হবে।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন ক্যান্সারের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কোন থিওরি চাল্ আছে ও তাদের পিছনে য্ক্তি কী?'

'থিওরির কমতি নেই। তবে এখনকার মতে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য থিওরিটি হল "পথভ্রষ্ট" কোষের (cell) থিওরি।'

'পথভ্রষ্ট কোষ! সে আবার কি?'

'ডিম থেকে যখন দ্রূণ তৈরী হয় তখন তার মাংসপেশী, হাড়, চামড়া ও অন্যান্য টিস্যু তৈরী হয় বিশেষ বিশেষ স্তরের দ্রূণকোষ থেকে। মনে করুন, যে সমস্ত দ্রূণকোষ থেকে চামড়া তৈরী হবে তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে গেল। তাহলে পরে এদের এক অংশ নিশ্চয়ই অব্যবহৃত থেকে যাবে ও শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়বে অন্য টিস্যুর মধ্যে, কেমন নয়! বহুদিন ধরে এই সমস্ত "পথভ্রষ্ট" কোষগুলির কোন হদিসই পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহলেও তাদের জীবনী শক্তি অটুট থাকে ও বিভিন্ন কারণে তারা আবার বংশবৃদ্ধি শুরু করে দেয়। এমনি ভাবেই টিউমারের সৃষ্টি হয়।'

প্রত্নতত্ত্ববিদ বললেন, 'এভাবে আদৌ নাও তো হতে পারে, কেননা মনে হচ্ছে এই থিওরিতে বড় বেশী কল্পনা স্থান পেয়েছে। প্রশ্ন জাগে কেন দ্রূণকোষ প্রয়োজনের তুলনায় বেশী তৈরী হল, কেন তারা অন্য টিস্যুর মধ্যে স্থান গ্রহণ করল, কেনই বা বছরের পর বছর নির্জীব থেকে হঠাৎ তারা বংশবৃদ্ধি শুরু করে দিল। এখানে উত্তর পাওয়ার তুলনায় প্রশ্নই জাগে বেশী — তাই নয় কি?'

অপ্রতিভ হয়ে ডাক্তার উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি, আমাদের এখনও অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনটির জন্য যখন ক্যান্সার চর্চা এই সমস্ত "কেন"'র উত্তর জোগাবে।'

প্রত্নতত্ত্ববিদ মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে চলুন যাই এখন শুয়ে পড়ি।'

সকলেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকলেন। বালু উড়িয়ে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল কয়েক হাজার বছর আগেকার ঠিক সেই দিনটির মতো যখন এ দেশে রাজত্ব করতেন 'সার্কোমায়' প্রাণ হারানো সেই মিশরীয় ফারাও।

কৃত্রিম উপায়ে টিউমার রোপণ করা কি সম্ভব?

মেডিকো-সার্জিক্যাল আকাদমীর প্যাথোলজি বিভাগে অধ্যাপক মিখাইল মাৎভেয়েভিচ রুদনেভ ক্যান্সার জাতীয় টিউমার সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা সবে শেষ করলেন।

এই অল্পবয়সী অধ্যাপকের বক্তৃতা শুধু যে ছাত্রদেরই আকৃষ্ট করত তা নয়। যেমন ডাক্তার তেমনি পশুচিকিৎসকরাও রুদনেভের কাছে পড়তে আসতেন। এখানে তৈরী হয়ে উঠছিল বৈজ্ঞানিক শিক্ষার এক নতুন ধারা।

তাঁর বক্তৃতাটি সত্যিই খুব উপভোগ্য হয়। রুদনেভ তাতে বলেন নিরীহ টিউমারের কথা যেগুলি অন্য টিস্যুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকে, ও ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের কথা যেগুলি, ছত্রাক যেমন রুটীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, ঠিক তেমনি ভাবেই পার্শ্বস্থ টিস্যুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। তারপর তিনি ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার কোষের কথা উল্লেখ করে

বলেন যে, এরা মূল টিউমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লিম্ফ বা রক্তপ্রবাহে প্রবাহিত হয়ে অন্য টিসু বা দেহের অন্য অঙ্গে আটকে গিয়ে সেখানে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তার ফলে কখনও কখনও এমনকি অনেক বছর পর একেবারে নতুন জায়গায় গজিয়ে ওঠে নতুন টিউমার। তিনি বলেন যে এই সমস্ত টিউমার, যাকে বলা হয় মেটাস্টেসিস, এরা যখন দেখা দেয় মস্তিষ্ক, যকৃৎ ও সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে (suprarenal gland) বা শরীরের সেই সমস্ত অঙ্গে যাদের কেটে বাদ দেওয়া অসম্ভব তখন আর রুগীকে ভাল করে তোলা যায় না। রুদনেভ ক্যান্সারের উৎপত্তির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'দুঃখের বিষয় এই যে ক্যান্সারের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত থিওরিগুলি সেরকম যুক্তিসম্মত নয়। ক্যান্সারের আসল কারণ এখনও জানা যায়নি, কিন্তু তাহলেও ক্যান্সার সৃষ্টির কতগুলি পূর্বাবস্থা নির্ধারণ করা গেছে। যেমন প্রথমেই উল্লেখ করা চলে বয়সের কথা। প্রাপ্ত বয়সেই যে ক্যান্সার হয় এটা আজ একরকম প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ক্যান্সার সম্বন্ধে আরও জ্ঞান সঞ্চয়ের সাফল্য নির্ভর করবে পরীক্ষামূলক গবেষণার উপর। সে গবেষণা এখনও শুরু হয়নি। আজ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে এক দেহ থেকে অন্য দেহে ক্যান্সার চালান করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

বক্তৃতা শেষ হলে পর বহু প্রশ্ন উঠল, এমনকি অধ্যাপকের বসবার ঘরেও তাঁকে প্রশ্ন করা চলতে লাগল। সেখানে জড় হয়েছিল তাঁর সবচেয়ে নিকটতম সহকর্মীরা।

প্রশ্ন করলেন নভিনস্কি, 'মিখাইল মাৎভেয়েভিচ, সত্যিই কি তাহলে এক পশুর দেহ থেকে অন্য পশুর দেহে ক্যান্সার সংক্রমণ করানো গেল না?' প্রশ্নকারক অল্পবয়সী পশুচিকিৎসকটি কিছুদিন হল মেডিকো-সার্জিক্যাল আকাদমীর পশুচিকিৎসা বিভাগ থেকে পাশ করে বেরিয়ে অধ্যাপক ভ. ইয়ে. ভরনৎসভের নেতৃত্বে পশুচিকিৎসা বিভাগে কাজ করছিলেন। এই লেবরেটারিতে তাঁকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত। রুদনেভের ঘরে এ প্রশ্ন তিনি এই প্রথমবার করেননি।

'ভেবে দেখুন একবার, মৃস্তিস্লাভ আলেক্সান্দ্রভিচ, কয়েকজন ত চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কেউই পারলেন না। আমার মনে হয় তাঁরা যে পারেননি তার কারণ যে-ভাবে চেষ্টা করা উচিৎ ছিল সে-ভাবে কেউ চেষ্টা করেননি। আমার মতে রোপণ করা উচিৎ ছিল সদ্যসৃষ্ট হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে এই রকম টিউমার এবং একজাতীয় পশুর দেহ থেকে ঠিক সেই জাতীয় পশুর দেহে। যেমন কুকুর থেকে কুকুরের গায়ে, ইঁদুর থেকে ইঁদুরের গায়ে এই রকম। করুন না, যাকে বলে ঠিকমত ভাবে চেষ্টা করে দেখুন না!'

প্রচুর প্রশ্ন উঠল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চলল। চার বছর পর ১৮৭৭ সালে ম. আ. নভিনস্কি পশুচিকিৎসা বিভাগে থিসিস পেশ করে তার মাস্টার ডিগ্রী লাভ করলেন। থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কৃত্রিম উপায়ে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার রোপণ'।

তিনি স্পষ্টভাবে পরীক্ষা করে দেখান যে এক রোগী কুকুরের দেহ থেকে এক টুকরো

টিউমার নিয়ে অন্য একটি সুস্থ কুকুরের দেহে তা রোপণ করা সম্ভব। রোপণ করা টিউমারের টুকরোটি ক্রমে বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত সুস্থ কুকুরটির মৃত্যু ঘটাতে পারে। শেষোক্ত কুকুর থেকে আবার তৃতীয় কুকুরেও ক্যান্সার চালান করা সম্ভব। এই ভাবে তিনি প্রমাণ করেন যে এক পশুর দেহ থেকে অন্য পশুর দেহে ক্যান্সার চালান দিয়ে লেবরেটারিতে পরীক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে ক্যান্সারের যোগান রাখা এখন সম্ভব।

টিউমার বিজ্ঞান এইভাবেই অগ্রগতির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ করে ও টিউমার সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কাজের প্রথম সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই ক্যান্সার প্রক্রিয়ার পরোক্ষ দর্শকের ভূমিকা থেকে সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়।

নভিনস্কি তাঁর বিরাট সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত হন, রুদনেভের অভিনন্দনের উত্তরে নভিনস্কি বলেন, 'প্রিয় মিখাইল মাৎভেয়েভিচ! আমি আর কি করেছি — আমি শুধু আপনারই চিন্তাধারার সত্যতা সপ্রমাণ করেছি। এখন নিশ্চয়ই ক্যান্সারের সত্যিকারের কারণ খুঁজে বের করতে আর বেগ পেতে হবে না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সহজ হল, কিন্তু তাহলেও,' রুদনেভ খানিকটা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটি এত শক্ত যে মনে হয় এখনও অনেক কাল অপেক্ষা করতে হবে।'

ই. ই. মেচনিকভের উক্তি

১৯১০ সাল ... প্যারিসে সবে আন্তর্জাতিক ক্যান্সার প্রতিরোধ কংগ্রেস শেষ হয়েছে। সেখানে সম্মিলিত হন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা। ব্যাক্টেরিওলজিস্টরাও উপস্থিত ছিলেন তবে বললে ঠিক হবে না যে তাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের খুব উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। সেখানে প্রায় খোলাখুলিভাবেই একথা স্বীকৃত হয়েছিল যে ক্যান্সারের কারণ আর যাই হোক ব্যাক্টেরিয়া নয়। সে সময় ১৫—২০ বছর ধরে ব্যাক্টেরিওলজিস্টদের জয়জয়কার চলছিল। প্রতিবছরই এ বিষয়ে চমকপ্রদ কোন না কোন কিছু নতুন আবিষ্কার হচ্ছিল। প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, সিফিলিস ও অন্যান্য বহু রোগের বীজাণু ঐ সময় আবিষ্কৃত হয়। মনে হচ্ছিল যে ব্যাক্টেরিওলজির সাহায্যে সমস্ত রোগেরই কারণ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে, কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই ভরাডুবি হয়ে গেল। ক্যান্সার জাতীয় টিউমার থেকে কত রকমের যে বীজাণু পাওয়া গেল তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু দেখা গেল এর একটিও ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ নয়। এরা ঘটনাচক্রে বায়ুর সঙ্গে বা চামড়া থেকে, বা অন্ত্রের মধ্য থেকে ক্যান্সারের ঘায়ে এসে পড়েছে। টিউমার উৎপত্তির সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই নেই।

পাস্তুর ইনস্টিটিউট, ইলিয়া ইলিচ মেচনিকভের ঘরে তাঁর নিকটতম সহকর্মীরা জড় হয়েছেন।

তাতে আলেক্সান্দ্র মিখাইলভিচ বেজরেদকাও আছেন। এ'র সঙ্গে একত্র মিলে মেচনিকভ প্রায়ই নিজের দেশ ওদেসাকে স্মরণ করতেন।

সমস্ত আলোচনাই অবশ্য চলছিল হালে শেষ হওয়া ক্যান্সার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে।

বেজরেদকা প্রশ্ন করলেন, 'ইলিয়া ইলিচ! ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে আপনার নিজের কী ধারণা?' মেচনিকভ তাঁর দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

বেজরেদকা বলে চললেন, 'সত্যিই এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা ক্যান্সার সৃষ্টি হয় না, বা ক্যান্সার সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকুল পালিত পরজীবীদেরও কোনই হাত নেই। বোঝা না হয় গেল যে এ রোগ সংক্রামক ব্যাধি নয়, কিন্তু কীই বা তাহলে এ রোগের কারণ যে-রোগ ধনী দরিদ্র, শহরবাসী বা গ্রামবাসী কাউকেই বাদ দেয় না?'

'হাজার হলেও আমার কিন্তু মনে হয় যে ক্যান্সারের কোন একটা সংক্রামক কারণ নিশ্চয়ই আছে,' মেচনিকভ যেন আস্তে আস্তে মেপে মেপে কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন 'নিজেরাই বিচার করে দেখুন যেদিন থেকে লেবরেটারিতে ক্যান্সার টিস্যু নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে কৃত্রিম উপায়ে চালান না করা সত্ত্বেও লেবরেটারিতে পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত পশুদের মধ্যে ক্যান্সার রোগটা যেন বেড়েই চলেছে। শাদা ইঁদুরের কথাই ধরুন; ১০—১২ বছর আগে ইনস্টিটিউটে এক হাজার ইঁদুরে মাত্র ৬টি ইঁদুর ক্যান্সারে ভুগত আর এখন এক হাজারে ভোগে ৯০টি ইঁদুর। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে অন্ততপক্ষে ক্যান্সারের একটি কারণ দেহের বাইরে থেকে আসে।'

বেজরেদকা বললেন, 'এর কারণ হয়ত আর কিছুই নয়; যে অবস্থায় এখন লেবরেটারিতে ইঁদুরগুলিকে রাখা হয় তাই হয়ত এদের মধ্যে ক্যান্সার বৃদ্ধির কারণ।'

উত্তরে মেচনিকভ বললেন, 'না! এদের রাখবার ব্যবস্থা একটুও বদলায়নি, আগের মতই রয়েছে। তাছাড়া, শুধু পশু নয় মানুষের মধ্যেও ক্যান্সারের এইরকম ভাবটা দেখা যাচ্ছে, মনে আছে আপনার, সম্মেলনে জার্মানির সেই কোন একটা মহাল সম্বন্ধে কী বলা হয়েছিল? গত দশ বছরে সেখানে ১১ জন লোক ক্যান্সার রোগে মারা গেছে ও তার মধ্যে আছে মহালের জমিদার ও তার বউ।'

'কিন্তু ইলিয়া ইলিচ, ক্যান্সার যদি সংক্রামক ব্যাধি হত তাহলে এ রোগে এতদিনে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ মরে যেত,' বেজরেদকা তাড়াতাড়ি আরও একটা যুক্তি উপস্থিত করলেন, 'কেন তাহলে আমরা আজ পর্যন্ত এমন একটা ঘটনাও জানি না যেখানে সার্জেন ক্যান্সারের উপর অস্ত্রোপচার করে নিজে তা থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে?'

মেচনিকভ আনমনাভাবে নিজের দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি, কিন্তু আলেক্সান্দ্র মিখাইলভিচ, সংক্রামক ব্যাধির মধ্যেও ত প্রকার ভেদ আছে। ক্যান্সারের বীজাণু যদি প্লেগ বা কলেরার বীজাণুর মতো সংক্রামক হত তাহলে

আপনার কথাই ঠিক, এতদিনে অবশ্যই দুনিয়ার অর্ধেকের বেশী লোক প্রাণ হারাত, কিন্তু এই ধরুন ক্রুপাস নিউমোনিয়ার কথা: কোন সন্দেহ নেই যে রোগটি বীজাণু জনিত রোগ ও বীজাণুগুলি দেখতে বর্শার ফলার মতো অথচ রোগটি মোটেই সংক্রামক নয়। ক্যান্সারের বীজাণুও ঠিক এই রকমই এক সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের বীজাণু যা সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। বরেল-এর মতো আমারও মনে হয় যে বীজাণুটি নিশ্চয়ই আল্ট্রা-ভাইরাস পরিবারের বীজাণু।' তারপর চশমাটি খুলে রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে মেচনিকভ বললেন, 'আমার মনে হয় যে ক্যান্সার ভাইরাস ইনফেকশন হল খুবই নিষ্ক্রিয় ধরনের ইনফেকশন এবং দেহের মধ্যে তা সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী পুরন রোগের এক বিশেষ অনুকূল অবস্থার পরিবেশ। লক্ষ্য করবেন যে তিল ও আঁচিলের উপরই বিশেষ করে চামড়ার ক্যান্সার হয়, পাকস্থলীর ঘাই পাকস্থলীতে ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে, তাই মনে হয় যে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অনেক কারণের সমন্বয় — তার মধ্যে ভাইরাস ইনফেকশনটিই শুধু বাইরে থেকে আসে, অন্য কারণগুলি সবই দেহের ভেতরকার। মনে হয় এ রোগে বংশপরম্পরার হয় আদৌ কোন প্রভাবই নেই অথবা তার প্রভাব অতি সামান্য। ক্যান্সারের ভাইরাস যখন আবিষ্কৃত হবে তখনই ধরা পড়বে কী করে একজনের দেহ থেকে এই ভাইরাস অন্যের দেহে সংক্রামিত হয় ও তখনই বোঝা যাবে যে, কেন এই রোগটি বাড়ছে অথচ বাড়ছে খুবই ধীরে ধীরে।'

'কবে আর তা হবে, ইলিয়া ইলিচ? ক্যান্সারের বীজাণু অনুসন্ধানে কত যে পরিশ্রম বৃথা ব্যয়িত হচ্ছে তা আর বলবার নয়।'

'যেখানে খোঁজা দরকার সেখানে খোঁজ করা হয়নি। খোঁজা হয়েছে ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস ও প্যারাসাইটের মধ্যে ক্যান্সারের উৎপত্তির কারণ। অথচ খোঁজা উচিৎ ছিল ভাইরাস। জানেন আলেক্সান্দ্র মিখাইলভিচ, পশুদের টিউমারের ভাইরাস হয়ত শীগ্‌গিরই বেরিয়ে যাবে, কেননা এইসব টিউমার এখন বহু লেবরেটারির হাতে সঞ্চিত রয়েছে যা নিয়ে সহজেই পশুদের উপর পরীক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু মানুষের ক্যান্সার সম্বন্ধে এখনই কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়ত আশাবাদীর মতই শোনাবে। সে ভাইরাস বের করতে এখনও ঢের দেরী।'

ক্যান্সার কি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সৃষ্টি হয়?

আঠারো শতাব্দীতে ইংলন্ডে ৭—৮ বছরের ছেলেরা চিমনি সাফ করার কাজে নিযুক্ত হত। তারা ধোঁয়া বেরোবার চিমনির মধ্যে ঢুকে চিমনি পরিষ্কার করত। এদের মধ্যে অনেকেই ২০—২৫ বছর বয়সে স্ক্রোটামের ক্যান্সারে (scrotal cancer) ভুগত বলে তখন আইনপ্রণয়ন

করা হয় যে চিমনি পরিষ্কারের কাজে ১৬ বছরের ছোট ছেলেদের নেওয়া চলবে না। তারপর থেকে দেখা যায়, চিমনি পরিষ্কারকারীদের মধ্যে ২০—২৫ বছর বয়সের জায়গায় ৩৫—৪৫ বছর বয়সে ক্যান্সার হচ্ছে। চিমনি পরিষ্কারকারীদের অন্য কোথাও নয় শুধু স্ক্রোটামের চামড়াতেই ক্যান্সার দেখা দিত। তার কারণ স্ক্রোটামের চামড়া খুবই কোঁচকানো তার সেই ঘোঁচগুলির মধ্যে সহজেই অনেকদিন ধরে চিমনির কালি লেগে থাকত ও সেখান থেকে স্ক্রোটামের চামড়ার অসংখ্য সিবেস্যস গ্ল্যান্ডের রসের সাহায্যে চিমনির কালি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ত। অন্য বৃত্তির শ্রমিকদের তুলনায় চিমনি পরিষ্কারকারীদের মধ্যে যদি বেশী ক্যান্সার হয় তাহলে বলতেই হবে যে চিমনির কালি থেকেই ক্যান্সার হয় অথবা কমপক্ষে চিমনির কালি ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়তা করে। শুধুই কি কালি! আজ অনেকদিন ধরে বহু বৃত্তি জানা আছে যাতে কাজ করলে ক্যান্সার হয়। যে সমস্ত শ্রমিক সবসময় আলকাতরা ও প্যারাফিন নিয়ে কাজ করে তারা যদি অনেকদিন ধরে সেই পেশায় বহাল থাকে তাহলে তাদেরও চামড়ায় ক্যান্সার হতে দেখা যায়। হতে পারে যে আলকাতরা ও প্যারাফিন ক্যান্সার সৃষ্টিকারক বা ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক। কিন্তু কী করে তা যাচাই করা সম্ভব?

টিউমার যদি এক পশুর দেহ থেকে অন্য পশুর দেহে চালান করা চলে যা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন নভিনস্কি, তাহলে নিশ্চয়ই যে সমস্ত জিনিস ক্যান্সার সৃষ্টিকারক তা ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে পশুর দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারা উচিত। চিমনির কালি বা আলকাতরা যদি মানুষের মধ্যে ক্যান্সারের জন্ম দেয় তাহলে পশুর দেহেও নিশ্চয়ই তারা ক্যান্সার সৃষ্টি করবে?

এই ধারণা নিয়ে বহু বিজ্ঞানী বিভিন্ন লেবরেটারিতে বিভিন্ন পশুর চামড়ায় আলকাতরা মাখিয়ে জোর পরীক্ষা চালালেন। একবার দুবার এমনকি শতবার মাখানো হল, দেহের বিভিন্ন অংশে মাখিয়ে পরীক্ষা শুরু করা হল। এমনকি চামড়ায় আঁচড় লাগিয়ে তার উপর আলকাতরা মাখিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করলেন ও আরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত রকমে চেষ্টা করা হল। লোম ঝরে পড়ল, চামড়া ফুলে উঠল, কিন্তু ক্যান্সার কিছুতেই সৃষ্টি করা গেল না। বহুদিন পর শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল যে বিশেষ ধরনের পশুর জন্য বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করলেই শুধু চলবে না বা এই সমস্ত পরীক্ষা সফল করতে হলে পরীক্ষা কর্তার শুধু বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকলেই চলবে না আরও একটা গুণ অবশ্যই থাকা চাই যা না হলে কৃত্রিম ক্যান্সার সৃষ্টি করা অসম্ভব, তা হচ্ছে ধৈর্য। সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে কৃত্রিম উপায়ে খরগোসের চামড়ায় ক্যান্সার সৃষ্টি করতে হলে এক আধ সপ্তাহ বা এক আধ মাস নয় এক বছরের উপর ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত তাতে আলকাতরা মাখাতে হয়, কমপক্ষে অন্তত সপ্তাহে দুবার করে। এই রকম ধৈর্যশীল বিজ্ঞানী হলেন দুই জন জাপানী বৈজ্ঞানিক ইয়ামাগিভা ও ইসিকাভা। ১৯১৬ সালে খরগোসের গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে এ'রা কৃত্রিম উপায়ে খরগোসের চামড়ায়

ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে এটা হল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে সুস্থ পশুদের মধ্যে প্রথম কৃত্রিম ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারার পর অন্যান্য পরীক্ষাকারীদের তরফ থেকে তার সত্যতা পরখ করে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর শুরু হল আলকাতরা জনিত ক্যান্সার সম্বন্ধে নানা দিক থেকে গবেষণা। প্রথমে এক আধটা তারপর দশ বিশ একশোটা করে এ বিষয়ে নতুন নতুন প্রবন্ধ বেরুতে শুরু করল। এরই মধ্যে এ বিষয়ে অন্তত হাজার রকমের গবেষণা হয়েছে। আলকাতরার সাহায্যে ইঁদুর ও আরও অন্যান্য কয়েক রকম পশুর দেহেও ক্যান্সার সৃষ্টি করা গেছে।

আলকাতরা নানা রকমের পদার্থের মিশ্রণে তৈরী হয়, কাজেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এর মধ্যেকার সেই পদার্থটি খুঁজে বের করা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য যা আসলে দায়ী। রসায়নবিদেরা লেগে পড়লেন জোর অনুসন্ধানে ও আলকাতরা থেকে নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ বেরুল। ইঁদুরের উপর সেই সমস্ত পদার্থের ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা অধ্যয়ন করতে লাগলেন বায়োলজিস্টরা। অনেক বছর পর ১৯২৬ সালে বেরুল যে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় আলকাতরার সেই সমস্ত পদার্থ থেকে যেগুলি ৮০০° থেকে ৮৫০° ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে। আরও কয়েক বছর অক্লান্ত গবেষণার ফলে পাওয়া গেল এমন কতগুলো বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ যা ব্যবহার করে জীবজন্তুর মধ্যে ক্যান্সার বা 'সার্কোমা' জাতীয় টিউমার সৃষ্টি করা সহজ। মেথিলকোলাণ্থ্রেনের মতো কয়েকটি জটিল অর্গানিক রাসায়নিক পদার্থ খুবই কম মাত্রায় এমনকি কখনও কখনও মিলিগ্রামেরও কম ডোজেই টিউমার সৃষ্টি করে। টিউমার অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না, দেখা দেয় ৮ থেকে ১০ মাস বা আরও পরে।

বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে এই পরীক্ষার সাফল্য বিভিন্ন রকমের, যে জন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যত বেশী ভোগে টিউমার রোগে সে জন্তুর মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে তত সহজে ও নিশ্চয়তার সঙ্গে টিউমার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। নেংটি ইঁদুর বা ধেড়ে ইঁদুর যাদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় সবচেয়ে বেশী টিউমার হতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে প্রায় শতকরা শত ক্ষেত্রেই টিউমার তৈরী করা চলে। কিন্তু গিনিপিগ বা খরগোস যাদের এমনিতেই কম টিউমার হয় তাদের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে সব ক্ষেত্রেই টিউমার সৃষ্টি করা অসম্ভব। যাই হোক না কেন এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে টিউমার সৃষ্টি করা যায়। এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে 'ক্যান্সারজেনিক' পদার্থ বলা হয়, অর্থাৎ যারা ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

ন. ন. পেত্রভ ও তাঁর সহকর্মীরা সুখুমির পরীক্ষাগারে ঠিক এই উপায় অবলম্বন করে বানরদের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বানরদের মধ্যে কিন্তু এমনিতে ক্যান্সার রোগ খুবই কম। ঐ ওষুধগুলি প্রয়োগের ৪ থেকে ১০ বছর পর তাঁরা দেখেন বানরের শরীরেও টিউমার গজিয়েছে।

এই সমস্ত তথ্য বিচার করে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে সত্যিই টিউমার সৃষ্টি করা সম্ভব। সমস্ত দেশের গবেষকরাই আজ তার প্রমাণ পেয়েছেন। জানা গেছে যে ক্যান্সার রুগীর দেহ থেকেও নাকি অনুরূপ রাসায়নিক পদার্থ খুঁজে বের করা যায়। লেনিনগ্রাদে ল. ম. সাবাদ ও তাঁর সহকর্মীরা ক্যান্সার রুগীর যকৃৎ থেকে অনুরূপ পদার্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন ও তা আবার ব্যবহার করে প্রমাণ করেন যে এগুলো ক্যান্সার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সৃষ্টির রাসায়নিক থিওরি আজ যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই তত্ত্বের সমর্থকদের একথা বলবার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে দেহের মধ্যে বিপাক বা মেটাবলিজম ব্যাহত হওয়ার ফলে প্রথমে তাতে বিশেষ ধরনের ক্যান্সারজেনিক পদার্থ সৃষ্টি হয় ও সেই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থই শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারের জন্ম দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্যান্সারজেনিক রাসায়নিক পদার্থ দেহের বাইরে থেকে এসে শরীরে অনুপ্রবেশ করে তার ক্রিয়া শুরু করে, যেমন দেখা যায় ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব তাদের মধ্যে, যারা এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত দ্রব্য নিয়ে কাজ করে।

মনে হল যে বহুযুগ ধরে ক্যান্সার রহস্য উদ্ঘাটনের যে প্রচেষ্টা চলছিল এইখানেই বুঝি তার সমাধান হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আনন্দে উল্লাস করার সময় এখনও হয়নি।

ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এমন পদার্থ যে অনেক!

সত্যিই যদি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাই ক্যান্সার সৃষ্টি হয় তাহলে প্রয়োজন খুব ভাল করে সেই সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যাতে মানুষকে এদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ক্যান্সার হওয়া বন্ধ করা যায়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লেবরেটারিতে তাই কাজের হৈচৈ পড়ে গেল। স্বাভাবিক, কৃত্রিম ও সিন্থেটিক সমস্ত রকমের সম্ভাব্য পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা শুরু হল। ১৯৪১ সালের মধ্যেই ১৬৯টি জিনিষ বেরুল যা দিয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করা সম্ভব। এখন অবশ্য এই সমস্ত আবিষ্কৃত পদার্থের সংখ্যা আরও ঢের বেড়েছে। উপকরণের দিক থেকে এই সমস্ত পদার্থ নানা রকমের। এদের মধ্যে সিন্থেটিক উপায়ে সংগৃহীত নানা জটিল অর্গানিক পদার্থ ছাড়াও রয়েছে খনিজ তেল বা তেলজাত পদার্থ, যৌন হরমোন, আর্সেনিক কম্পাউন্ড, কড়া তামাক, কড়া কফি ইত্যাদি। এমনকি ফ্রুকটোজ ও মুর্গীর ডিমের এলবুমিনের মতো নিরীহ জিনিষও দীর্ঘ দিন ধরে ইঁদুরের গায়ে ইঞ্জেকশন করে ক্যান্সার সৃষ্টি করা যায়।

সত্যিই কি তাহলে উপকরণ ও চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই সমস্ত জিনিষই ক্যান্সার সৃষ্টির মূল? আর শুধুই কি রাসায়নিক পদার্থ? না তা নয়। দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রকারের রশ্মির ক্রিয়াও মানুষের দেহে টিউমার সৃষ্টি করতে পারে। রঞ্জনরশ্মি,

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, রেডিয়াম রশ্মি এমনকি সাধারণ সূর্যের রশ্মিও টিউমার সৃষ্টিকারক।

কিন্তু তা কেমন করে হয়? রঞ্জনরশ্মি ও রেডিয়াম রশ্মি দিয়ে যে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়ে থাকে? বোঝা শক্ত, যা দিয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় তাই দিয়েই আবার কেমন করে তার চিকিৎসা হয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এগুলি দিয়ে সত্যিই চিকিৎসা করা সম্ভব, শুধু ব্যবহার করতে হয় কম ডোজ। সূর্য রশ্মির বেলাতেও ঠিক তাই। রোদের আলোয় রোদ পোহাতে অবশ্য কোনই দোষ নেই, তবে ধেড়ে ইঁদুরকে যদি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধারাবাহিকভাবে রোদে পোড়ান হয় তাহলে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যেই তার চামড়ায় ক্যান্সার হবে। আরও নানা রকম উপায়ে ক্যান্সার হয়। যেমন বারে বারে একই জায়গা পুড়ে যাওয়া, টিস্যুর মধ্যে এক প্রকারের কৃমির অনুপ্রবেশ, দীর্ঘ দিনের ঘা বা এমনকি বহুদিন ধরে মেকানিক্যাল ইরিটেশনের ফলেও ক্যান্সার হয়ে থাকে।

শরীরের উপর সূর্যের আলো, যৌন হরমোন বা ফ্রুকটোজের ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যটা কোথায়? ক্যান্সারজেনিক পদার্থগুলির চরিত্রগত, গুণগত, উৎপত্তিগত ও ক্রিয়াগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কেমন করে অনেক সময় তাদের একই প্রকারের টিউমার সৃষ্টি করতে দেখা যায়? এত প্রচুর পরিমাণে নানা রকমের ক্যান্সারজেনিক পদার্থ ও অনুক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও কেন এত অল্প সংখ্যক লোক ভোগে ক্যান্সারে? কেন ক্যান্সারজেনিক পদার্থ ইঁদুর জাতীয় পশু যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেশী ক্যান্সার হয় তাদের মধ্যে সহজে এবং বানর জাতীয় পশু যাদের মধ্যে এমনিতে কম ক্যান্সার হয় তাদের মধ্যে কদাচিৎ ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে? এই সমস্ত প্রশ্নই গবেষকদের সামনে বরাবর ছিল কিন্তু তার সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি।

রোগ মাত্রেই তার নিজস্ব কারণ আছে ও বেশীর ভাগ রোগেরই একটা করে কারণ থাকে। এমন অতি সামান্যই রোগ দেখা যায় যার কারণ একাধিক। কিন্তু এক রোগের কয়েক শত কারণ — এ একেবারে অবিশ্বাস্য!

দেহের মধ্যে ক্যান্সারজেনিক পদার্থ প্রবেশ করলে ক্যান্সার হয়। তা সন্দেহাতীত। কিন্তু কোন এক ঘটনার আগে যদি অন্য এক ঘটনা ঘটে তাহলে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কি সবসময়ই পরবর্তী ঘটনার কারণ বলা চলে? টিউমার সৃষ্টির রাসায়নিক থিওরিকে খুব জোরাল ইমারৎ বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তাতেও গভীর ফাটল ধরল।

ভাইরাসই কি ক্যান্সারের কারণ?

১৯১০ সালে প্যারিসে মেচনিকভ যখন বেজরেদকার সাথে ক্যান্সারের উৎপত্তি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন ও বলছিলেন যে ভাইরাসই নিশ্চয় ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ, নিউ ইয়র্কের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাগারে তখন মুর্গীর 'সার্কোমা' নিয়ে গবেষণা চলছিল। পাখী পালনের

কেন্দ্রগুলিতে এই রোগ বহুদিন ধরেই সুবিদিত ছিল। ঐরকম একটি কেন্দ্র থেকেই রোগগ্রস্ত মুর্গীটিকে পাঠানো হয়েছিল গবেষণাগারে। অল্পবয়সী ব্যাক্টেরিয়ালজিস্ট পেইটন রাউস বুঝতেই পারছিলেন না মুর্গীটিকে নিয়ে কী করা। আবার টিউমারে ব্যাক্টেরিয়া খুঁজব! এর কি কোনো অর্থ হয়! টিউমার উৎপত্তির ব্যাক্টেরিয়া থিওরি যে চিরতরে বাতিল হয়ে গেছে! আচ্ছা, এতে ভাইরাস খুঁজে দেখা যাক না কেন? দেখাই যাক না কী হয়? রাউস যত্ন করে টিউমারটি ঘষে তাতে জল দিয়ে তার নির্যাস তৈরী করলেন, তৈরী করা নির্যাসটি তিনি এমন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে ফিল্টার করলেন যাতে শুধু জীবকোষই নয় ব্যাক্টেরিয়াও আটকে যায় অথচ ভাইরাস সহজে পার হয়ে যেতে পারে। এই ফিল্টারে ছাঁকা নির্যাস নিয়ে রাউস কয়েকটি মুর্গীর বুকের মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন করলেন। দু সপ্তাহ পার হলে একটা মুর্গীর রোগ হল। তারপর আর একটা, তারপর আরও একটা, এই ভাবে একমাসের মধ্যে সবগুলি মুর্গীই রোগে পড়ল। বোঝা গেল যে 'সার্কোমা' ছাঁকা নির্যাসে সত্যি সত্যিই ভাইরাস ছিল যার দ্বারাই এই সমস্ত মুর্গীর মধ্যে টিউমার সৃষ্টি হয়।

রাউসের এক্সপেরিমেণ্টকে কেউ কোন গুরুত্বই দিল না, বা ওকে কেউ বিশ্বাসই করল না। এর আগে যে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল নভিনস্কির উপায়, সেই বহুলক্ষ টিউমার কোষ যুক্ত এক টুকরো টিউমার টিসু নিয়ে পশু দেহে রোপণ করে তাই থেকে টিউমার সৃষ্টি করা। আর এখানে বলা হচ্ছে যে টিউমার সৃষ্টি হয় টিউমারের নির্যাস থেকে যাতে একটিও টিউমার কোষ নেই। না, এ একেবারে অবিশ্বাস্য! হাতে কলমে একবার যা প্রমাণ হয়েছে এ যে ঠিক তার বিপরীত প্রতিপাদ্য!

যাচাই করে কিন্তু দেখা গেল যে রাউসের পর্যবেক্ষণ ঠিক। মুর্গীর 'সার্কোমা' নির্যাস, যাতে একটিও 'সার্কোমা' কোষ নেই, তাই ইঞ্জেকশন করে ১৪ থেকে ১৮ দিনের মধ্যেই সুস্থ মুর্গীর দেহে 'সার্কোমা' সৃষ্টি হল। তা হলে কি বরেল ও মেচনিকভের কথাই ঠিক, যাঁরা বারবার বলে এসেছেন যে টিউমার সৃষ্টি হয় ভাইরাসের সাহায্যে? ভাইরাস ছাড়া টিউমার নির্যাসে আর কিই বা থাকতে পারে। কাজেই মেনে নিতে হল যে সূক্ষ্ম ফিল্টার ভেদ করতে সক্ষম কোন এক প্রকার ভাইরাসের সাহায্যেই টিউমার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও এই 'সার্কোমাকে' আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এর গড়ন যেন ঠিক অন্যান্য ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের মতো নয়। সন্দেহ জাগে এ হয়ত 'খাঁটি' টিউমার নয়, শুধু ভাইরাস ইনফেকশনের বিরুদ্ধে টিসুর টিউমার জাতীয় এক প্রতিক্রিয়া। এ হয়ত এক বিকৃত টিউমার, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; আর সেই সাধারণ নিয়মটা হল এই যে টিউমার সৃষ্টির সঙ্গে ভাইরাস বা অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার কোনই সম্বন্ধ নেই।

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। রাসায়নিক থিওরির স্বপক্ষে নতুন নতুন প্রমাণ জমে উঠতে লাগল। তাই কেউই আর ভাইরাস যে টিউমার সৃষ্টি করতে পারে সে দিকে কোন

নজরই দিল না।' ভাইরাস নিয়ে যে তখন কম কাজ হত শুধু তাই নয়, ভাইরাস যে আসলে কী জিনিষ সে সম্বন্ধেও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে 'ভাইরাস' বস্তুটি তাহলে কী?

ভাইরাস বস্তুটি কী?

১৮০১ সাল, হাইতি দ্বীপে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, নিগ্রোদের কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। তারাও স্বাধীন হতে চায়! ফরাসী দেশে তখন রাজত্ব করছেন নেপোলিয়ন। জেনারেল লারুার্ক ২৫ হাজার ফরাসী সৈন্য নিয়ে হাইতি উপস্থিত হলেন। নিগ্রোরা আত্মরক্ষা করছে, কিন্তু নেপোলিয়নের স্বনামধন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা কি আর দাঁড়াতে পারে? যুদ্ধের পরিণতি আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধে নিগ্রোদের এক মিত্র জুটে গেল। দিন দিন নেপোলিয়নের সৈন্য সংখ্যা কমতে লাগল, ছিল ২৫ হাজার, রইল মাত্র ৩ হাজার। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর এটাই প্রথম পরাজয়। নিগ্রোদের বন্দুকের গুলি ফরাসী সৈন্যদের পরাজিত করেনি; তাদের পরাজিত করল হাইতির পীত জ্বর। এর বহুদিন পরে জানা যায় যে পীত জ্বরের কারণ হল — ভাইরাস।

১৮৭৫ সাল, নিরালা ফিজি দ্বীপে এক জাহাজ লাগল, হাম জ্বরে ভুগছে এমন একটি শিশু ছিল সেই জাহাজে। ফিজি দ্বীপে কিন্তু এ রোগ কখনো হয়নি। রুগ্ন শিশুটি হয়ে দাঁড়াল সেই দ্বীপের মহামারীর কারণ, হাম জ্বর সেখানে শিশু যুবক বুড়ো কাউকেই বাদ দেয়নি, সমস্ত ফিজিবাসী এক দফা ভুগে উঠল হাম জ্বরে। পরে জানা গেল যে হাম জ্বরের কারণ এক প্রকারের ভাইরাস।

১৯১৮ সাল, প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন তখনও নেভেনি, নতুন এক শত্রু এসে আবার প্রপীড়িত মানবজাতিকে বিপদের সম্মুখে হাজির করল, যে বিপদের বিরুদ্ধে কামান বা কূটনৈতিক দলাদলি শক্তিহীন। সারা দুনিয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারীর আগুন জ্বলে উঠল। দুই কোটি মানুষ প্রাণ হারাল। প্রথম মহাযুদ্ধে যত লোক মরেছে এ সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশী। পরে জানা গেল যে ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণ ভাইরাস।

১৯৩৫—১৯৩৬ সাল, ওয়াশিংটন প্রদেশের ইয়াকিমা উপত্যকায় ঘোড়াদের মধ্যে মড়ক লেগে গেল, অসংখ্য ঘোড়া প্রাণ হারাল। অন্যান্য প্রদেশেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মের দুই তিন মাসের মধ্যেই ২৭৬ হাজার ঘোড়া রোগগ্রস্ত হল। তাদের হয়েছিল মস্তিষ্কের ইনফ্লামেশন — এনসেফালাইটিস। এর কারণও এক প্রকারের ভাইরাস।

এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। মানুষ, গৃহপালিত জন্তু, পাখী, কুকুর, লোমশ বন্য জন্তু, মাছ, মৌমাছি, শুঁয়োপোকা ইত্যাদি বহু প্রাণীর জীবন নষ্ট করে ভাইরাস। এমনকি

তুলো, তামাক, আলু, ফলের গাছ প্রভৃতিও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। সামান্য এক কোষ যুক্ত ব্যাক্টেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত যে কোন জীব দেহে তারা আক্রমণ চালাতে পারে।

ভাইরাস শুধু যে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ের সমস্যা তাই নয়, এ এক মস্ত অর্থনৈতিক সমস্যাও বটে।

'ভাইরাস' জিনিষটা তাহলে আসলে কী?

... ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২ সাল। পিটার্সবুর্গে রুশ বিজ্ঞান আকাদমীর সভা চলছে, তামাক পাতার মোজেইক রোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন দিমিত্রি ইওসিফভিচ ইভানভস্কি। এই রোগে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ক্রিমিয়ার তামাক চাষ। এতে তামাক পাতার গায়ে মোজেইকের মতন নানা ছোপ ছোপ দাগ পড়ে যায় ও তারপর গাছটি আস্তে আস্তে বিনষ্ট হয়। ইভানভস্কি সুস্থ তামাক গাছে এই রোগে আক্রান্ত তামাক গাছের নির্যাস লাগিয়ে প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ্য করেন। তামাক গাছটি মোজেইক রোগে মরে গেল। বোঝা গেল যে রুগ্ন তামাক গাছের নির্যাসের মধ্যেই ঐ রোগের কারণ অন্তর্নিহিত। তখন ইভানভস্কি রুগ্ন তামাক গাছের নির্যাস ফিল্টারের মধ্য দিয়ে ছেঁকে নিলেন। সে ফিল্টারের ছিদ্র এমন সূক্ষ্ম যে যেকোন বীজাণু, বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাক্টেরিয়াও তাতে আটকে যায়। দেখা গেল যে সেই ছাঁকা নির্যাসও রোগ সংক্রমণ করতে সক্ষম, অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম ফিল্টারও রোগের বীজাণুগুলিকে আটকে রাখতে পারছে না।

পরে এদেরই নাম দেওয়া হয় ভাইরাস বা আল্ট্রা-ভাইরাস। কিছু দিন পর মানুষ ও পশুর মধ্যেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন ভাইরাসের সন্ধান মিলল। এরাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফিল্টার ভেদ করে যায়। এদের কৃত্রিম পুষ্টি-মিডিয়ামে (nutrient medium) কালচার করা সম্ভব নয়। একমাত্র জীবদেহের টিসুতে কালচার করেই এদের বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব।

ভাইরাস দেহের আয়তন কী? এক মিলিমিটারকে এক হাজার ভাগ করলে সেই এক এক ভাগ হল 'মাইক্রন'। আবার এক এক 'মাইক্রন'কে এক হাজার ভাগ করলে তার এক এক ভাগ হয় 'মিলিমাইক্রন'।

আল্ট্রা-ভাইরাসকে মাপা হয় মিলিমাইক্রনের হিসাবে।

বসন্তের ভাইরাস হল সবচেয়ে বড় ভাইরাস এবং তার আয়তন প্রায় ২০০ মিলিমাইক্রন। সাধারণ মাইক্রোস্কোপে শক্তিশালী লেন্স লাগিয়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি এদের চেহারা। সবচেয়ে ছোট ভাইরাসগুলির আয়তন কয়েক মিলিমাইক্রন মাত্র, যেমন ফুট-এন্ড-মাউথ ডিজিজের (foot and mouth disease) ভাইরাস। সবচেয়ে ভাল মাইক্রোস্কোপে সবচেয়ে শক্তিশালী লেন্স লাগিয়েও এদের দেখা যায় না; কিন্তু ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এদের ফটো তোলা গেছে, কেননা এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে যে কোন জিনিষকে একলক্ষ গুণেরও বেশী বড় করা যায়। ক্ষুদ্রতম ভাইরাসগুলিও

চেহারায় গোলাকৃতি, কোন কোন ভাইরাস চেহারায় লম্বাটে, কোনটি বা ইটের আকৃতি আবার কোন কোন ভাইরাস দেখতে বীজের সুতোর টুকরোর মতন।

এই সব ক্ষুদ্র দেহ ভাইরাস নানা প্রকার ব্যাধি সৃষ্টি করে। ভাইরাস ঘটিত সমস্ত রোগই কিন্তু উগ্র চরিত্রের নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে বছরের পর বছর এমনকি দশ বিশ বছর ধরেও চুপ করে থাকে। তখন, তাদের অস্তিত্বের প্রায় কোন আভাসই পাওয়া যায় না।

সকলেই জানে যে ঠোঁটের কোণে বা নাকের পাতায় কখনও কখনও 'জ্বরঠুঁটো' ওঠে; প্রথমে পরিষ্কার জল নিয়ে কতগুলি ফুসকুড়ির মতো দেখা দেয় তারপর শুকিয়ে সেগুলোতে কালো চটা পড়ে এবং চটাগুলো ঝরে গেলে পর আর জ্বরঠুঁটোর কোন চিহ্নই থাকে না। ঠাণ্ডা লাগলে বা সর্দি হলে বা দুর্বলকারক অন্যান্য রোগের পর এই সব ফুসকুড়ি দেখা দেয়। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ফুসকুড়িগুলির মধ্যে থাকে এক প্রকারের বিশেষ ভাইরাস। মানুষের এরা বিশেষ কোন ক্ষতি করে না, তবে খরগোসের পক্ষে তারা খুবই মারাত্মক, মস্তিষ্কের ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করে থাকে। এই ভাইরাস, যাকে হার্পিস ভাইরাস বলা হয়, শিশুকালেই তারা মানুষের দেহে আশ্রয় নেয় ও সারা জীবন সেখানেই থেকে যায়। এদের উপস্থিতি অনুভূত হয় তখন যখন অবস্থার পরিবর্তনে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে এদের আর বছরের পর বছর ধরে কোন হদিসই পাওয়া যায় না বা এদের রোগ উৎপাদন-শক্তিরও কোন পরিচয়ই মেলে না। অনুরূপ ভাইরাস যে শুধু মানুষের মধ্যেই দেখা যায় তা নয় পশুদের মধ্যেও আছে। যেমন সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক গিনিপিগের মস্তিষ্কেই মস্তিষ্ক আবরণীর ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করতে পারে এমন ভাইরাস থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা তার কোনই ক্ষতি করে না। কিন্তু গিনিপিগের মস্তিষ্কে স্টেরাইল শ্বেতসার ইঞ্জেকশন করে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন তার মস্তিষ্কের আবরণীতে ইনফ্লামেশন হয়েছে। শ্বেতসার মস্তিষ্ক কোষের ইরিটেশন সৃষ্টি করে, তার ফলে মস্তিষ্ক কোষ তার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক দ্রুত কোষ বিভাগ শুরু করে দেয় এবং এই হচ্ছে সেই আদর্শ অবস্থা যে অবস্থার পরিবেশে ঐ ভাইরাস দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্বেতসার ইঞ্জেকশন করে আমরা ঠিক সেই অবস্থার সৃষ্টি করে থাকি যে অবস্থায় মস্তিষ্ক আবরণীর ভাইরাস দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ও রোগ সৃষ্টির দিক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কাজেই সেই সমস্ত ভাইরাস যারা উগ্র রোগ সৃষ্টি করে ও রোগ সেরে গেলে পর মরে যায়, এমন ভাইরাস ছাড়া অন্য ভাইরাসও আছে যারা বহুকাল ধরে এমনকি জীবন ভোর শরীরের মধ্যে থেকে যায় এবং কেবল মাত্র বিশেষ অবস্থার পরিবেশেই তাদের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সব ভাইরাস যে টিস্যুকে আক্রমণ করে শুধু সেই টিস্যুর মধ্যেই

তারা গভীর পরিবর্তন ঘটায় ও প্রায়ই শেষ পর্যন্ত টিস্যু কোষগুলি মরে যায়। তাই প্রশ্ন জাগে মুর্গীর 'সার্কোমা' ভাইরাসের মতো এমন আর কোন ভাইরাস আছে কিনা যারা টিস্যু কোষগুলিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে টিস্যু কোষের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে টিউমার সৃষ্টি করে থাকে?

টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস

বহুকাল ধরে মুর্গীর 'সার্কোমা' সৃষ্টিকারী ভাইরাসই একমাত্র টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস হিসাবে গণ্য ছিল। বহুপরে আরও অন্যান্য টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৯৩৩ সালে শউপ ক্যানস্যাস থেকে ধরা বুনো খরগোসদের চামড়ার উপর দেখতে পেলেন শক্ত শক্ত আঁচিলের মতন অসংখ্য প্যাপিলোমা। এই সব প্যাপিলোমা গুঁড়িয়ে মন্ড তৈরী করে তা সুস্থ খরগোসের চামড়ায় ঘষে দিয়ে দেখা গেল যে তাদের গায়ে ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঐরকম প্যাপিলোমা জন্মায়। এমনি করে রোগগ্রস্ত খরগোসের দেহ থেকে অসংখ্য সুস্থ খরগোসের দেহে প্যাপিলোমা চালান করা সম্ভব হয়। আরও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই প্যাপিলোমার কোষে থাকে এক প্রকারের বিশেষ ভাইরাস যার সাহায্যেই এ রোগ সৃষ্টি হয়। প্যাপিলোমা ফিল্ট্রেট, যাতে একটিও প্যাপিলোমা কোষ থাকে না — থাকে শুধু ভাইরাস, সেই ফিল্ট্রেট দিয়েও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তার সাহায্যে এক পশুর দেহ থেকে অন্য পশুর দেহে সহজেই প্যাপিলোমা চালান করা সম্ভব। যে সমস্ত প্যাপিলোমা গ্রস্ত খরগোসকে অনেক দিন ধরে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে ১০ থেকে ১৮ মাসের মধ্যেই নিরীহ প্যাপিলোমা, ক্যান্সার জাতীয় টিউমারে পর্যবসিত হয়ে ধাক ধাক করে বাড়তে থাকে, তারপর মেটাস্টেসিস হয়ে পশুটি মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। এই পর্যবেক্ষণ শুধু যে ক্যান্সার গবেষক বৈজ্ঞানিক পন্ডিতদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাই নয়, চিকিৎসকদের মনেও যথেষ্ট কৌতূহল জাগায়। কেননা মানুষের মধ্যেও কোন কোন টিউমারের বিবর্তন খরগোসের প্যাপিলোমার মতই অনুরূপ ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। যেমন কণ্ঠনালী ও মূত্রথলির ক্যান্সার, এর শুরু ছোট্ট একটু আঁচিলের মতো প্যাপিলোমা থেকে। বহুবছর পরে এরাই আবার প্যাপিলোমা থেকে ক্যান্সারে পর্যবসিত হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের টিউমারের সাথে এত সাদৃশ্য বিহীন মুর্গীর 'সার্কোমা' ও মানুষের টিউমারের সাথে সাদৃশ্য যুক্ত খরগোসের প্যাপিলোমা, এই দুইয়েরই কারণ ভাইরাস। মুর্গীর 'সার্কোমাকে' এখন আর তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলে না, কেমন নয়? অন্য দিকে এমনও ত হতে পারে যে খরগোসের প্যাপিলোমাই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম! প্যাপিলোমা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক নতুন প্রশ্ন জাগল

ও এক অদ্ভুত ঘটনা বেরিয়ে পড়ল। দেখা গেল যে যে-ভাইরাসকে সহজেই প্যাপিলোমা থেকে সংগ্রহ করা যায় প্যাপিলোমা উদ্ভূত ক্যান্সার টিস্যু থেকে সে ভাইরাসকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ক্যান্সার টিস্যু নিয়ে সুস্থ খরগোসের চামড়ায় ঘষে কিছুতেই আর প্যাপিলোমা সৃষ্টি করা যায় না। টিউমার থেকে তাহলে ভাইরাসগুলি গেলে কোথায়? বিশেষ অনুসন্ধানের পর বেরুল যে ভাইরাস মোটেও উধাও হয়নি, ভাইরাস শুধু হারিয়েছে তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা। সুস্থ খরগোসের গায়ে প্যাপিলোমা সৃষ্টির সামর্থ্য আর তার নেই। রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় 'মাস্কড' ভাইরাস বা লুক্কায়িত ভাইরাস।

লুকিয়ে গেলে পর ভাইরাসের কী পরিবর্তন হয়? এই রহস্যের খানিকটা এখন সমাধা করা গেছে। ক্যান্সার পর্যায়ে খরগোসের প্যাপিলোমার পর্যবেক্ষণ শুরু করলে কেউ হয়ত আজ জানতেও পারত না যে খরগোসের প্যাপিলোমা সৃষ্টি হয় ভাইরাস থেকে। এমনও হতে পারে যে অন্যান্য টিউমার যা নিয়ে আমরা এখন অনুসন্ধান চালাচ্ছি তাদের অনুসন্ধান কার্য চলছে ঠিক তখন যখন তার ভাইরাস লুকিয়ে গেছে, তাই হয়ত তাদের সৃষ্টিকারক ভাইরাসকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল উপযুক্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে। উচিত ছিল যে-সমস্ত টিউমারে এখনও ভাইরাসের অনুসন্ধান মেলেনি সেগুলিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা।

বহু বছর ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত নানান জীবজন্তুর মধ্যে ভাইরাস প্রসূত টিউমার আবিষ্কৃত হয়েছে। কীট পতঙ্গ, মাছ, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আজ এমন অনেক টিউমারের সন্ধান পাওয়া গেছে যা নিঃসন্দেহে ভাইরাস প্রসূত। দেখা গেছে যে প্রাণী দেহের ঐ সমস্ত টিউমার নির্গত ভাইরাসগুলিকে সংগ্রহ করে, যথাক্রমে আবার সেই সেই নির্দিষ্ট জাতের সুস্থ প্রাণী দেহে প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম উপায়ে সেই সেই নির্দিষ্ট টিউমার সৃষ্টি করা যায়। তাই টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের অস্তিত্ব আজ সকল গবেষকরাই মেনে নিয়েছেন।

টিউমার ও দুধ

আজ বহুদিন হল জানা গেছে যে ইঁদুরের স্তনে খুব বেশী ক্যান্সার হয়। লেবরেটোরিতে কৃত্রিম উপায়ে অতি সহজেই এই ক্যান্সার সৃষ্টি করা সম্ভব, তাই এ নিয়ে বহু রকমের গবেষণা হয়েছে।

ক্যান্সার উৎপত্তির যে বহুসংখ্যক থিওরি প্রচলিত আছে তার মধ্যে এক কালে খুবই প্রচলিত ছিল বংশানুক্রম থিওরি। এই থিওরি অনুযায়ী বাপ মায়ের ক্যান্সার চলে আসে

শিশুর মধ্যে। এই থিওরি প্রমাণ করবার জন্য আমেরিকান গবেষকরা বেছে নেয় দুই ইঁদুর পরিবার। এক পরিবার যাতে বংশানুক্রমে ক্যান্সার হয়েছে, অপরটি যাতে এ রোগ কখনও হয়নি। এদের দুই পরিবারকে আলাদা আলাদা রেখে পরিবারের ভিতর কয়েক ধাপ বংশবৃদ্ধি করানো হল। দেখা গেল এক পরিবারে বংশানুক্রমে প্রায় সমস্ত মাদী ইঁদুরেরই স্তনের ক্যান্সার হচ্ছে, অপরটিতে একটিরও ক্যান্সার হল না।

মনে হল ক্যান্সার উৎপত্তির বংশানুক্রম থিওরির চমৎকার প্রমাণ মিলেছে।

সত্যিই ত, আর কী প্রমাণ চাই! ক্যান্সারযুক্ত ইঁদুর পরিবারে সকলের ক্যান্সার হল আর ক্যান্সারবিহীন পরিবারে একটিরও হল না। এই থিওরি প্রমাণ করতে এর চেয়ে বেশী আর কী চাই? যারা বংশানুক্রম থিওরির সমর্থক তাদের জয় হল এবং মনে হল সমস্যাটার বুঝি সম্পূর্ণ সমাধান এইখানেই শেষ হল।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আবার সন্দেহ দেখা দিল। ক্যান্সারযুক্ত পরিবারের নবজাত ইঁদুরকে মায়ের দুধ খাবার আগেই মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ক্যান্সারবিহীন পরিবারে রাখা হল ও ঠিক সেইভাবে ক্যান্সারবিহীন পরিবারের নবজাতককে ক্যান্সারযুক্ত পরিবারে দেওয়া হল। বংশানুক্রমেই যদি ক্যান্সার হত তাহলে এই পরিবার পরিবর্তনে নিশ্চয়ই কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হত না। এর বা তার দুধ ত আর বংশগত গুণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না! যা আশা করা গিয়েছিল তা হল না। ক্যান্সারযুক্ত পরিবারের যে নবজাতক ইঁদুরকে লালন পালন করা হল ক্যান্সারবিহীন পরিবারে তার ক্যান্সার রোগ হল না, কিন্তু ক্যান্সারবিহীন পরিবারের যে নবজাতককে ক্যান্সারযুক্ত পরিবারে দেওয়া হল তার মধ্যে দেখা দিল ক্যান্সার রোগ। অনেক বার করে এই এক্সপেরিমেণ্টের পুনরাবৃত্তি করে প্রতিবারই কিন্তু একই ফল পাওয়া গেল। কাজেই প্রমাণিত হল যে বংশ বা বাংশানুক্রমের কোন তাৎপর্য নেই: আসল জিনিষ হল নবজাত ইঁদুর কোন দুধ খাচ্ছে। এই ধারণাটিকে আরও নানা ভাবে পরখ করা হল। ক্যান্সারযুক্ত মায়ের দুধ নিয়ে ক্যান্সারবিহীন পরিবারের ইঁদুরের চামড়ার নীচে বা পেটে ইঞ্জেকশন করে দেখা গেল যে তাদের ৮ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে ক্যান্সার হচ্ছে। বোঝা গেল দুধের মধ্যেই নিশ্চয় এমন জিনিষ আছে যা থেকে ক্যান্সার হয়। পরে বেরুল যে আসল জিনিসটি হচ্ছে ভাইরাস। বিটনার, যিনি এক সময় বংশানুক্রম থিওরির ভক্ত ছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত এই মত মেনে নিতে বাধ্য হন কেননা তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেন যে স্তনের ক্যান্সার দুধের মধ্য দিয়ে এক ইঁদুর থেকে অন্য ইঁদুরে বিস্তারিত হয়।

ইঁদুরের স্তন ক্যান্সারের ভাইরাস নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এই ভাইরাস যদি ইঁদুর জন্মাবার পর ৩—৪ সপ্তাহের মধ্যে তার দেহে প্রবেশ করে তাহলেই তার ক্যান্সার হয় ও সে ক্যান্সার ফুটে বেরোয় তার আট থেকে আঠার মাস বয়সের সময়। কিন্তু ইঁদুর জন্মাবার ৩—৪ সপ্তাহের পর যদি এই ভাইরাস তার দেহে প্রথম প্রবেশ

করে তাহলে আর তার ক্যান্সার হয় না যদিও প্রবিষ্ট ভাইরাস তার দেহের মধ্যে বেঁচে থাকে বাকি সারাটা জীবন।

ইঁদুরের 'লিউকিমিয়া' বা রক্তের ক্যান্সারের ভাইরাস নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে এই ভাইরাসের প্রতি তার সাসেপ্টিবিলিটি বা স্পর্শকাতরতা বজায় থাকে আরো ঢের কম, জন্মাবার পর কয়েক দিনের জন্য মাত্র।

অতএব দেখা যাচ্ছে মেচনিকভ যা ভেবেছিলেন তাই সত্যি। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি খুবই কমজোরি এবং এরা তখনি রোগ সৃষ্টি করে যখন তারা প্রতিরোধ শক্তিবিহীন কচি শরীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। দুঃখের বিষয় আমরা আজও মানুষের টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সে ভাইরাসগুলিও খুবই কমজোরি ও তাদের রোগ সৃষ্টি করার সামর্থ্য দেখা দেয় বিশেষ অবস্থার পরিবেশে।

প্রশ্ন জাগে সেই বিশেষ অবস্থার পরিবেশটা তাহলে কী? কৃত্রিম উপায়ে কি ভাইরাসের ক্ষমতা বা রোগ প্রজনন শক্তি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব? দেখা গেছে যে সত্যিই তা সম্ভব। সুস্থ খরগোসের চামড়ায় যদি প্যাপিলোমা সৃষ্টিকারী ভাইরাস ঘষে দেওয়া যায় তাহলে ২০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যেই তার গায়ে দেখা দেয় ছোট ছোট আঁচিলের মতো প্যাপিলোমা, তারপর সেগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু প্যাপিলোমা সৃষ্টিকারী ভাইরাস ঘষে দেবার আগে সুস্থ খরগোসের গায়ে যদি অন্য কোন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনিষ কয়েকবার মাখিয়ে তারপর প্যাপিলোমা সৃষ্টিকারী ভাইরাস রোপণ করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে আঁচিলের মতো প্যাপিলোমাগুলি তার গায়ে ঢের আগে বেরিয়েছে ও ঢের তাড়াতাড়ি তারা বড় হয়ে উঠছে। ৫—৬ মাসের মধ্যেই শরীরের অনেক বেশী জায়গায় সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে। খরগোসদের মধ্যে ঠিক এমনি দ্রুত প্যাপিলোমা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় যদি ভাইরাস ঘষে দেওয়ার আগে তার চামড়ায় কয়েক দিন অন্তর অন্তর ৫—৬ বার বেশ ভাল করে আঁচড় কাটা যায় বা তাতে তারপিন তেল প্রভৃতি মালিশ করা যায়। তাহলে ব্যাপার কী? এই অবস্থার পরিবেশে ভাইরাস কেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে? কী তার কারণ? আমরা যখন চামড়ায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনিষ মাখাই বা আঁচড় কাটি বা তারপিন তেল মাখাই তাতে করে চামড়ার উপরের স্তরের কোষগুলিকে আমরা জখম করি। ফলে, সেই জখম সেরে নেবার জন্য সেখানকার কোষগুলি দ্রুত কোষবিভাগ শুরু করে দেয় ও দেখা দেয় বিভাগরত প্রচুর কচি কচি কোষ। যদি এইভাবে জখমের পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহলে পর সেখানে জন্মায় আরও বিভাগরত নতুন নতুন কচি কচি কোষ, তৈরী হয় এক বিভাগরত কচি কোষের কেন্দ্র। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির পক্ষে এই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ কেননা ভাইরাস কচি বিভাগরত কোষের মধ্যেই সবচেয়ে সহজে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস যাতে রোগ সৃষ্টি করতে পারে

তার অন্যতম প্রধান অবস্থা হল আশ্রয়দাতার দেহের মধ্যে কাঁচ বিভাগরত কোষের আবির্ভাব।

আমরা তাহলে এখন নিঃসন্দেহে জানতে পারলাম যে জগতে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস আছে ও রোগ সৃষ্টির জন্য তাদের এমন কতগুলি উপযুক্ত অবস্থার পরিবেশ দরকার যা না হলে, দেহের মধ্যে অবস্থান করেও তারা রোগ সৃষ্টি করতে অপারগ।

উপরি উক্ত পরীক্ষাগুলি ক্যান্সার সৃষ্টির যে ভাইরাস থিওরি আছে তার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন পশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির অনেক টিউমার সৃষ্টির পিছনে রয়েছে বিভিন্ন ভাইরাস ইনফেকশন। এই সমস্ত ভাইরাস বিভিন্ন চরিত্রের। কোনটি বা খুব তাড়াতাড়ি ২—৩ সপ্তাহের মধ্যেই টিউমার সৃষ্টি করে, কোনটি বা অনেক দেরীতে, ৮ থেকে ১২ মাস বা আরও দীর্ঘদিন পরে এবং আশ্রয়দাতার দেহের বিশেষ অবস্থার পরিবেশেই এই রোগ সৃষ্টি করে থাকে। কোনটি আবার টিউমার ম্যালিগন্যাণ্ট হয়ে যাবার পর লুকিয়ে যায়। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির কতগুলি অনুকূল অবস্থাও আজ পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীরা কী বলেন

কতগুলি টিউমার সৃষ্টির পিছনে যে নিঃসন্দেহে ভাইরাস ইনফেকশন রয়েছে বর্তমানে এ সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব।

ভাইরাস থিওরির বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে ? টিউমার কি আর এক কারণে হয়! ভাইরাস হয়ত তার একটা কারণ।' তাঁরা যুক্তি রাখলেন যে, 'হ্যাঁ, এমন টিউমার আছে যার কারণ ভাইরাস, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। বেশীর ভাগ টিউমার থেকে কিন্তু আজও পর্যন্ত ভাইরাস বের করা সম্ভব হয়নি। এরকমটা তাহলে কেন হয় যে এক টিউমার থেকে ভাইরাস বেরোয় অথচ অন্যটিতে তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না ?'

ভাইরাস থিওরির সমর্থকরা বললেন, 'দাঁড়ান, এত ব্যস্ত হবেন না, নিজেরা ত ভাল করেই জানেন যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস বের করা অত সহজ ব্যাপার নয়। প্রতি বছরই ত বেশী বেশী সংখ্যায় নতুন নতুন ভাইরাস প্রসূত টিউমারের সন্ধান মিলছে, আবার কী চাই ?'

এই যুক্তি কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের খুশি করতে পারল না।

তাঁরা বললেন যে, 'ভাইরলজি আজ এমন এক উৎকর্ষের পর্যায়ে পোঁছেছে যে ভাইরাস যদি আদৌ থেকে থাকে তাহলে তা বেরুবেই। বেশীর ভাগ টিউমার থেকে যদি ভাইরাস না পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে বলতেই হবে যে এর কারণ এই যে তাতে ভাইরাস নেই।'

ভাইরাস থিওরির সমর্থকরা বললেন, 'কিন্তু শুনুন, এর অন্য কারণও ত থাকতে পারে? মনে আছে ইঁদুরের স্তনের ক্যান্সার বা রক্তের ক্যান্সারের কথা? সেই ভাইরাসের সন্ধান হয়ত কোনদিনই মিলত না, যদি না তাদের নবজাত ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা হত। হয়ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্যান্য টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসেরও সন্ধান মিলবে। মনে রাখবেন, ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে বহু টিউমারের মধ্যে ভাইরাসের মতো জিনিষ দেখতে পাওয়া গেছে।'

বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, 'না! ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের তথ্য মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা ভাইরাসের মতো যে সব জিনিষ দেখা গেছে মানুষের টিউমার টিস্যুতে, তার সুস্থ টিস্যুর মধ্যেও তা সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। যদিও সুস্থ টিস্যুতে এদের সংখ্যা কম বা সব ক্ষেত্রে এদের দেখাও যায় না। তাহলেও দেখা যখন গেছে তখন এ তথ্যের দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া, সত্যিই যদি ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ মানুষের টিউমারে ভাইরাস দেখে থাকে আমরা বুঝতে পারি না যে, ভাইরলজিস্টরা তাহলে সে ভাইরাসকে কেন বের করতে পারছে না।'

ভাইরাস থিওরির সমর্থকরা উত্তরে বললেন, 'আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে ভাইরাস তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারে যেমন দেখা যায় খরগোসের প্যাপিলোমার ক্ষেত্রে, যখন সে প্যাপিলোমা ক্যান্সারে পরিণত হয়। যে ভাইরাস রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়েছে তার অস্তিত্ব রোগ সৃষ্টি করার মাপ কাঠিতে কী করে বিচার করা যায়?'

বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, 'তাহলে তাকে অন্য কোন উপায়ে বের করুন। ভাইরাসের দেহ ত প্রোটীন দিয়ে তৈরী? সে প্রোটীন নিশ্চয়ই আশ্রয়দাতার টিস্যু প্রোটীন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামান্য রক্তের দাগ থেকে যদি ময়না তদন্তের ডাক্তার সঠিকভাবে বলে দিতে পারে কোন প্রাণী দেহের এই রক্ত, সত্যিই কি তাহলে মানব দেহের প্রোটীন থেকে ভাইরাস প্রোটীন তফাৎ করা অসম্ভব? ভাইরাস প্রোটীন, যে কোন প্রাণী দেহের প্রোটীনের পক্ষে বহিরাগত প্রোটীন। ভাইরাস যদি প্রাণী দেহের মধ্যে এমনকি লুকিয়েও থেকে থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়ার চরিত্র গুণে না হলেও সে ভাইরাসের নিজ দেহের প্রোটীন চরিত্রের দ্বারাই তাকে ধরা যেত। সমস্ত গবেষক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, যে-টিউমার থেকে ভাইরাস ধরা পড়ছে না, তাতে দেহ প্রোটীন ছাড়া কোন বহিরাগত অন্য কোন প্রোটীনেরও সন্ধান মেলেনি। অর্থাৎ, বলতে হবে যে তাহলে তাতে সেই প্রোটীন নেই যে প্রোটীনের দ্বারা তৈরী হয় ভাইরাসের দেহ। এই সব বাস্তব তথ্যের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, টিউমার সৃষ্টির সঙ্গে ভাইরাসের কোনই সম্বন্ধ নেই। এই সিদ্ধান্ত ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায়, বলুন?'

ভাইরাস থিওরির সমর্থকদের এ প্রশ্নের জবাবে বলবার কিছুই ছিল না। সত্যিই ত তাই! যে-টিউমারে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস মেলেনি তাতে এমন কোন প্রোটীনও পাওয়া যায়নি

যে প্রোটীন যার টিউমার হয়েছে তার টিস্যু প্রোটীনের তুলনায় ভিন্ন বা বহিরাগত। উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হল।

টিউমার কোষের প্রোটীন চরিত্রের প্রশ্নটি কিন্তু অন্য দিক দিয়েও খুবই মূল্যবান প্রশ্ন। ব্যাপার হল এই, যে দেহের মধ্যে তখনই প্রতিশেধক দ্রব্য প্রস্তুত হয় যখন তাতে প্রবেশ করে এমন প্রোটীন যে প্রোটীন টিস্যু প্রোটীনের তুলনায় ভিন্ন বা বহিরাগত। খরগোসের দেহে যদি মুর্গী বা হাঁসের মতো অন্য প্রাণী দেহের প্রোটীন প্রবেশ করান হয় খরগোস তখন তার দেহে সেই বহিরাগত প্রোটীনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশেধক দ্রব্য প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু খরগোসের দেহে যদি তার নিজের দেহের প্রোটীনই খানিকটা প্রবেশ করানো হয় তাহলে তার দেহে প্রতিশেধক কোন প্রক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না।

কাজেই টিউমারের মধ্যে যদি যার দেহে সেই টিউমার হয়েছে তার টিস্যু প্রোটীন ছাড়া অন্য প্রোটীন না মেলে তাহলে বলতেই হবে যে, সে দেহের তরফ থেকে সেই টিউমারের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিশেধক প্রতিক্রিয়া আশা করা অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে টিউমারের বিরুদ্ধে দেহের ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনই জন্মাতে পারে না, বা কৃত্রিম উপায়ে টিউমার বিরোধী ইমিউনিটি তৈরী করারও কোন উপায় বের করা অসম্ভব। আর যদি তা না হয়, টিউমারে যদি সত্যিই অন্য.প্রোটীন থেকে থাকে যা সেই প্রাণী দেহের সুস্থ টিস্যুতে নেই, তাহলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরী হওয়া সম্ভব। তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে এই যে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কী উপায়ে তা প্রস্তুত করা যায়।

ক্যান্সার বিজ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে টিউমার কোষ ও সুস্থ কোষের প্রোটীনগত সাদৃশ্য বা তফাতের প্রশ্ন এক অন্যতম মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণে গৃহীত মতটিকে যদি ধরা যায় তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই প্রতিষেধক ইমিউনিটি গড়ে উঠবার কোন আশা নেই। এবং তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে ক্যান্সারের ভাইরাস থিওরির মধ্যে এসে যায় মস্ত বড় ফাঁক।

তাহলে কি ধরে নেব যে সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরাই ঠিক যাঁরা বলেন যে, টিউমারে এমন কোন প্রোটীন নেই যা নাকি দেহের সুস্থ কোষের মধ্যে থাকে না? বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীরা আজও অবশ্য এই মতই পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তার মানে ত আর এই নয় যে তাঁরাই ঠিক!

কী উপায়ে তাহলে বের করা দেহের মধ্যেকার সেই বহিরাগত প্রোটীন?

অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন নানা রকমের প্রোটীন জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে থাকি। পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে পরিপাক হয়ে তারা আমাদের দেহ গঠনের কাজে লাগে। পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে গ্রহণ না করে আমরা যদি প্রোটীনকে চামড়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মাংসপেশী

বা অন্য কোন দেহাঙ্গের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করি তা হলে কী হয়? দেখা যায় যে এতে করে দেহের মধ্যে বিশেষ প্রকারের ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্যের সৃষ্টি হয় যা, হয় সেই প্রোটীনের সঙ্গে প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়, না হয় তার বিরুদ্ধে দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে প্রোটীন যদি বিষাক্ত প্রোটীন হয়, ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য তাহলে তার বিষ হরণ করে তাকে নির্দোষ করে তোলে। কিন্তু তা যদি দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয় ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য তাহলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ও সংযুক্ত পদার্থটি তলানি পড়ে যায়, তাই শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এই সমস্ত ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য খুবই বিশেষিকৃত দ্রব্য। এরা শুধু সেই সেই বিশেষ প্রোটীনের সঙ্গেই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় যা এদের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খরগোসের চামড়ায় যদি মুর্গীর ডিমের প্রোটীন ইঞ্জেকশন করা হয়, তাহলে তার দেহে তৈরী হয় এক প্রকারের ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য যা শুধু ঐ প্রোটীনের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া করতে পারে, হাঁসের ডিমের প্রোটীনের বিরুদ্ধে নয়। আর যদি মুর্গীর ডিমের জায়গায় হাঁসের ডিমের প্রোটীন তাকে ইঞ্জেকশন করা যায়, তাহলে তৈরী হবে সেই ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য যা শুধু হাঁসের ডিমের প্রোটীনের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া করতে পারে, মুর্গীর ডিমের প্রোটীনের বিরুদ্ধে নয়। এই সমস্ত ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য প্রধানত রক্তের মধ্যেই জমা হয়। যে খরগোসের দেহে বিশেষ প্রকারের প্রোটীন ইঞ্জেকশন করা হয়েছে তার রক্ত নিয়ে যদি সেই রক্তকে জমাট বাঁধতে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য জমাট রক্তের উপর ভেসে ওঠা সিরামের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে। ঐ সিরাম যদি আবার সেই বিশেষ প্রোটীনের সঙ্গে মেশান যায়, তাহলে পর দেখা যাবে যে যে-সিরাম এই কিছুক্ষণ আগেও স্বচ্ছ ছিল তা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা না করে ঐ সিরামকে যদি অন্য প্রোটীনের সঙ্গে মেশান যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সেই সিরাম আগেও যেমন স্বচ্ছ ছিল এখনও তেমনি রয়েছে।

এই সমস্ত ইমিউনিটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এক প্রোটীন থেকে অন্য প্রোটীনের তফাৎ করা চলে বা সঠিক বলে দেওয়া যায় দেহের মধ্যে কোন প্রোটীন রয়েছে। টিউমারে বহিরাগত প্রোটীন আছে কিনা ধরার জন্য এই সমস্ত ইমিউনিটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দেশে বহু বছর ধরে এই উপায়ে টিউমারের মধ্যে বহিরাগত প্রোটীনের অস্তিত্ব খুঁজে বের করার প্রচুর প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়নি। মানুষের টিউমারের ক্ষেত্রে বহিরাগত প্রোটীন বের করার প্রচেষ্টায় সমস্ত গবেষকই বিফল হয়েছেন। কয়েক জন অবশ্য পশুদের টিউমারে এই উপায়ে বহিরাগত প্রোটীনের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু অন্যেরা সে উক্তি খন্ডন করেন। মোটের উপর বহু বছর ধরে পরীক্ষার পরও এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল রয়ে যায় যে টিউমারে কোন বহিরাগত প্রোটীন থাকে না। এই বিশ্বাস এখনও এমনই সর্ববাদী সম্মত যে টিউমার সম্বন্ধে লেখা সমস্ত পাঠ্যপুস্তকেই এই ধারণা পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

যদি কোন রকম বহিরাগত প্রোটীন টিউমারে না থাকে তাহলে বলতেই হবে যে আশ্রয়দাতার দেহের তুলনায় অন্য প্রোটীন দিয়ে তৈরী ভাইরাস তাতে নেই। এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাইরাস থিওরি পরাজয় বরণ করল।

ব্যর্থতার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা

বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের পুরাতন সহকর্মিণী জ. ল. বাইদাকভা হাতের তিনটি মোটা খাতা দেখিয়ে বললেন, 'না! লেভ আলেক্সান্দ্রভিচ, আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়াই উচিৎ, এই দেখুন! এতে গত তিন বছরের অসংখ্য এক্সপেরিমেণ্টের সমস্ত তথ্য টোকা রয়েছে। দেখুন! একটাতেও আমরা অভীষ্ট ফল পাইনি; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, টিউমারে এমন কোন প্রোটীন থাকে না যা নাকি সুস্থ কোষের মধ্যে না পাওয়া যায়। অন্য গবেষকরাও সকলেই এক বাক্যে এই কথাই বলেছেন। ভাইরাস থিওরিকে এখন মূলগতভাবে পরিবর্তন করা দরকার।'

'ঠিক বলেছেন আপনি, জিনাইদা লেওনিদভনা। আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সমস্ত এক্সপেরিমেণ্টেই নেতিবাচক ফল পেয়েছি, টিউমারে কোন বহিরাগত প্রোটীনের সন্ধান আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। কিন্তু তার মানে কী সত্যিই এই, যে টিউমারে কোন বহিরাগত প্রোটীন থাকে না? এমনও ত হতে পারে যে আমরা এখনও সেই অবস্থাটি সঠিকভাবে জানি না যে অবস্থায় সেই প্রোটীনকে বের করা সম্ভব?'

'আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যত রকমে সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি ও সে প্রোটীন বের করার জন্য কত রকমের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছি বলুন তো? না! লেভ আলেক্সান্দ্রভিচ, আর চেষ্টা করার কোন অর্থ হয় না। টিউমার সমস্যার ক্ষেত্র থেকে সবাই মাইক্রো-বায়োলজিস্টদের বহুদিন তাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা বৃথাই আবার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করছি। ব্যর্থতা আমাদের স্বীকার করেই নেওয়া উচিত।'

'না, আমরা যদি এ নিয়ে কাজ করা ছেড়ে দিই তাহলে সত্যিই সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে যে, যে-প্রোটীন আমরা খুঁজছি টিউমারে তার পরিমাণ এত কম যে আশ্রয়দাতার দেহের প্রচুর স্বাভাবিক প্রোটীনের মধ্য থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এক মালগাড়ী বোঝাই বালির মধ্যে খানিকটা সুজি ফেলে ভাল করে মিশিয়ে দিয়ে চেষ্টা করুন দেখি সুজিকে বালি থেকে আলাদা করতে? কোন একটা উপায় ভেবে বের করা দরকার যাতে করে সুজিকে বালি থেকে আলাদা করা যায়, কেমন নয়? ঠিক তেমনি করে আমাদের আজ এমন এক উপায় বের করতে হবে যাতে দেহের মধ্যে অন্যান্য প্রোটীনের সঙ্গে মেশা খুব সামান্য একটুখানি অন্য প্রোটীনকেও খুঁজে পাওয়া যায়। টিউমারের প্রোটীনকে আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করার চেষ্টা করা উচিত। হয়ত শেষ পর্যন্ত বেরুবে যে এর কোন একটা গ্রুপে পড়ছে সেই ভাইরাস

প্রোটীন যাকে আমরা এত খুঁজছি, হয়ত শেষ পর্যন্ত বেরুবে যে সেই ভাইরাস প্রোটীন, যাকে আমরা এত খুঁজছি, তা টিউমার প্রোটীনের কোন একটা গ্রুপে বেশী পরিমাণ মিশ্রিত রয়েছে।

'কিন্তু এত আর আমাদের কাজ নয়! এ হচ্ছে বায়োকেমিকদের কাজ।'

'বায়োকেমিকদেরও তাহলে সঙ্গে নেব। আসল কাজ হল প্রোটীন নির্ধারিত করবার আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতি খুঁজে বের করা যাতে মেশানো অবস্থায় থাকলেও তাদের আলাদা আলাদা করে নির্ধারিত করা যায়। আসুন না এই উদ্দেশ্যে সেই সূক্ষ্ম "এনাফিল্যাকটিক রিএকশন" ব্যবহার করি যাতে দেহের মধ্যে এক গ্রামের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ প্রোটীন থাকলেও তা ধরা পড়ে যায়। এতেও যদি বিফল হই তাহলে অবশ্য ...'

'তাহলে কী করবেন লেভ আলেক্সান্দ্রভিচ?'

'আর কী করা যায় সে কথা ভাবা যাবে তখন।'

আলোচনাটি চলছিল ১৯৪৭ সালে। তারপরও বহুদিন ধরে চলেছিল এই সব আলোচনা। অনেক বছর ধরে ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর মনে হল আর বুঝি কিছুতেই সাফল্য লাভ করা যাবে না। বহু পরিশ্রম করা হল, এক্সপেরিমেণ্টের রাশিরাশি তথ্য জমে উঠল, কিন্তু আসল কাজ এক ধাপও এগুল না। তাসত্ত্বেও ঠিক হল যে কাজ বন্ধ করা নয় চালিয়ে যেতে হবে।

এক্সপেরিমেণ্টের পদ্ধতিই আসল

গিনিপিগের চামড়ায় বা শিরার মধ্যে যদি মুরগীর প্রোটীন বা অন্য কোন প্রোটীন ইঞ্জেকশন করা যায় গিনিপিগ সে ইঞ্জেকশন সহজেই সহ্য করে নেয়। এতে তার কোনই ক্ষতি হয় না বা ইঞ্জেকশনের জন্য তার দেহে কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে গিনিপিগটির শিরায় সেই একই প্রোটীন আবার ইঞ্জেকশন করে দেখুন; আপনি দেখবেন এক শোচনীয় দৃশ্য। ইঞ্জেকশনের দুই তিন মিনিটের মধ্যেই গিনিপিগটি হাঁচি দিতে শুরু করবে এবং পা দিয়ে নাক চোখ চুলকোতে থাকবে; তারপর আরম্ভ হবে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্প্যাজম বা অনিচ্ছাকৃত সঙ্কোচন এবং তার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু। পূর্বতন ইঞ্জেকশনের ফলে দেহের এই যে উগ্র স্পর্শকাতরতা একেই বলা হয় এনাফিল্যাকসিস। যে প্রোটীনের প্রথম ইঞ্জেকশন গিনিপিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ, দ্বিতীয় বার সে ইঞ্জেকশনেই গিনিপিগটি কেন মরে যায়? অনুমান করা হয় যে প্রথম বার প্রোটীন ইঞ্জেকশন করার পর দেহের মধ্যে যে ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী দ্রব্য তৈরী হয় তারা রক্তের মধ্যে দ্বিতীয় বার ইঞ্জেকশনকৃত প্রোটীনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে তলানি ফেলে দেয়। এই তলানি রক্তের শিরার মধ্যে অবস্থিত নার্ভের অগ্রভাগগুলিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, ফলে প্রথমে শুরু হয় রক্তের শিরার সঙ্কোচন এবং তারপর মৃত্যু।

এনাফিল্যাকটিক রিএকশন বা প্রতিক্রিয়া খুবই স্পেসিফিক জিনিষ। গিনিপিগের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন যখন দ্বিতীয় বার ইঞ্জেকশন করা হয় ঠিক সেই প্রথম ইঞ্জেকশনের প্রোটীন। এই প্রতিক্রিয়ার আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সে হল এই, যে দ্বিতীয় বার ইঞ্জেকশনের ফলে যদি মৃত্যু না হয় (সাধারণত তা হয়ে থাকে যদি দ্বিতীয় ইঞ্জেকশন খুবই কম ডোজের হয়), তাহলে সেই গিনিপিগটি ঐ নির্দিষ্ট প্রোটীনের প্রতি চিরকালের জন্য সমস্ত স্পর্শকাতরতা হারিয়ে ফেলে তাই তার একটুও ক্ষতি না করে সেই নির্দিষ্ট প্রোটীন তখন যত খুশী তত পরিমাণ তাকে ইঞ্জেকশন করা চলে।

* এনাফিল্যাকটিক প্রতিক্রিয়ার এই বিশেষত্বটি টিউমারের মধ্যে বহিরাগত প্রোটীন আছে কি না তা বের করবার জন্য কাজে লাগানো হয়।

মানুষের ক্যান্সারযুক্ত যকৃৎ থেকে টিসু নিয়ে তাকে গুঁড়িয়ে মন্ড তৈরী করে তারপর তাতে জল দিয়ে তাই থেকে আমরা প্রোটীন নির্যাস তৈরী করি। জল টিসুর মন্ড থেকে প্রোটীন টেনে নেয়। ক্যান্সারযুক্ত যকৃতে যদি ভাইরাস থেকে থাকে তাহলে তার দেহের প্রোটীনও নিশ্চয়ই আমাদের নির্যাসের মধ্যে আসবে তাই নয়? এখন কথা হল কী করে প্রমাণ করা যে, ক্যান্সারযুক্ত যকৃতের মধ্যে যকৃতের নিজস্ব প্রোটীন ছাড়াও ভাইরাস প্রোটীন আছে।

কতগুলি গিনিপিগ নিয়ে তাদের চামড়ার নীচে আমরা ঐ নির্যাস ইঞ্জেকশন করি। তিন সপ্তাহের মধ্যে কতক ক্ষেত্রে ক্যান্সারযুক্ত যকৃৎ নির্যাস নিয়ে ও কতক ক্ষেত্রে সুস্থ যকৃৎ নির্যাস নিয়ে আমরা এদের স্পর্শকাতরতা পরীক্ষা করি। আশা ছিল যে ক্যান্সারযুক্ত যকৃৎ নির্যাসে যদি ভাইরাস প্রোটীন থেকে থাকে তাহলে ক্যান্সার নির্যাস দ্বিতীয় বার ইঞ্জেকশন করলে তার প্রতি গিনিপিগগুলি নিশ্চয়ই ঢের বেশী স্পর্শকাতর হবে। পরীক্ষা করা হল। এক গ্রুপে নেওয়া হল শুধু সেই সব গিনিপিগ তিন সপ্তাহ আগে যাদের গায়ে ক্যান্সারযুক্ত যকৃৎ নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয়েছিল ও এখন করা হল সুস্থ যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন। না! দেখা গেল কোনই তফাৎ নেই। ক্যান্সারযুক্ত ও সুস্থ যকৃতের নির্যাসের একই ফল — গিনিপিগগুলি সেই কাশতে থাকে ও চুলকোতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কতগুলি শেষ পর্যন্ত দেহের খিঁচুনি (convulsion) হয়ে মরে যায়। মনে হল নির্যাস ইঞ্জেকশনের ডোজ কমিয়ে হয়ত তফাৎ ধরা পড়বে, তাই নানা রকম ডোজে ইঞ্জেকশন করে পরখ করা হল। খুব সামান্য ডোজে ক্যান্সারযুক্ত যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করতে গিনিপিগ মাত্র দুবার নাক চুলকাল। একই রকমের অন্য গিনিপিগে সুস্থ যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করেও তাই গিনিপিগটি দুই তিন বার মাত্র নাক চুলকাল আর কিছুই নয়। আবার সেই ব্যর্থতা! সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষাতেও ক্যান্সারযুক্ত ও সুস্থ যকৃতের প্রোটীনে কোন তফাৎ ধরা পড়ল না। তাহলে আর কী করা? সত্যি সত্যি এইখানেই হয়ত পরীক্ষা শেষ করা হত, কেননা করার মতো এমন কিছুই ত আর বাকি ছিল না!

লেবরেটারিতে নেমে এল নৈরাশ্য। কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এত বেশী নির্যাস তৈরী হয়েছিল যে লেবরেটারির রেফ্রিজারেটার ভরে গেল। এদের ত আর কল তলায় ঢেলে ফেলা যায় না! তাই ঠিক হল দেখা যাক না এগুলিকে বারে বারে গিনিপিগে ইঞ্জেকশন করে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়। যে সমস্ত গিনিপিগের চামড়ায় আগে ক্যান্সারযুক্ত যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয়েছিল ও তার তিন সপ্তাহের মধ্যে আবার সুস্থ যকৃতের নির্যাস শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন করা হলে অবস্থা মরমর হয়েও শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়, সে সমস্ত গিনিপিগের শরীরে আবার সুস্থ যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হল। ইঞ্জেকশনের পর ৫ মিনিট ১০ মিনিট ১৫ মিনিট কেটে গেল, শরীরে কোন প্রতিক্রিয়াই হল না। না চুলকানি, না হাঁচি, কিছুই নয়। বোঝা গেল যে তাদের শরীরে সুস্থ যকৃতের নির্যাসের প্রতি কোন স্পর্শকাতরতা নেই। কিন্তু ঐ রকম গিনিপিগদের গায়ে যদি সুস্থ যকৃতের নির্যাসের পরিবর্তে ক্যান্সারযুক্ত যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়ায় তাও ত দেখা দরকার? কীই বা হবে তাতে? দুই নির্যাসের মধ্যে ত কোন তফাতই পাওয়া যায়নি। করা হল ইঞ্জেকশন। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল, হঠাৎ গিনিপিগটি নাক চুলকাল, একবার দুবার কাশল, তারপরই শ্বাসের টান উঠল, তারপরই শুরু হল ভীষণ শ্বাসের কষ্ট এবং শেষে কনভালশন হয়ে গিনিপিগটি মরে গেল। সবাই অবাক। এও ত হতে পারে যে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে ঘটনাটি হঠাৎ ঘটে গেল? অন্য আর একটা গিনিপিগ, যার গায়ে আগে একবার ক্যান্সারযুক্ত যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয়েছিল ও তারপর সুস্থ যকৃতের নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয়, তার উপর আবার ঐ এক্সপেরিমেণ্ট পরখ করা হল। দেখা গেল ফল একই হচ্ছে। তৃতীয় বারে সুস্থ যকৃৎ নির্যাস দিলে কোনই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, কিন্তু ক্যান্সারযুক্ত নির্যাস দিলেই ভীষণ প্রতিক্রিয়া। বোঝা গেল, ওটা তাহলে নিশ্চয়ই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একের পর এক ঐ এক্সপেরিমেণ্ট চলতে লাগল। সোর গোল পড়ে গেল, সমস্ত লেবরেটারির কর্মীরা দেখতে এলেন এক্সপেরিমেণ্ট। এক্সপেরিমেণ্ট করতে করতে গিনিপিগ ফুরিয়ে গেল। তারপর থেকে যেমনি নতুন গিনিপিগ যোগাড় হয় অমনি ঐ এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়। মানুষের, ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, খরগোস, মুর্গী, বানর প্রভৃতি জন্তুর টিউমার নির্যাস নিয়ে তখন পরীক্ষা চলল। সবেতেই পাওয়া গেল ঐ একই রকম ফল। এদের মধ্যে যাদের গায়ে প্রথমে টিউমার নির্যাস ও পরে সুস্থ টিসু নির্যাস ইঞ্জেকশনের পর পুনর্বার সুস্থ টিসু নির্যাস দিলে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সেই রকম গিনিপিগের গায়ে পুনর্বার টিউমার নির্যাস ইঞ্জেকশন করে কিন্তু দেখা গেল যে হয় তারা ভীষণ কাতর হয়ে পড়ে না হয় মরে যায়। অর্থাৎ প্রমাণ হল টিউমার নির্যাসে তাহলে এমন প্রোটীন আছে যা সুস্থ টিসু নির্যাসে নেই। অর্থাৎ স্বীকার করতেই হবে যে সুস্থ দেহে ঐ প্রোটীন নেই বলেই সুস্থ দেহের পক্ষে ওটা বহিরাগত প্রোটীন।

এই সব এক্সপেরিমেণ্ট খুব স্পষ্ট ও সহজগম্য হয়ে দাঁড়ায় যখন টিউমার থেকে পাওয়া

সমস্ত প্রোটীনের পরিবর্তে তার কোন একটি বিশেষ গ্রুপের প্রোটীন নিয়ে এই এক্সপেরিমেণ্ট চালান হয়। এসিডের সাহায্যে তলানি ফেলে সংগৃহীত এই রকম একটি প্রোটীন গ্রুপে অভীষ্ট ভাইরাস প্রোটীনকে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী মাত্রায় (concentration)।

দুবছর জোর কাজ চালিয়ে এটা স্পষ্ট হল যে, টিউমারে নিঃসন্দেহে এমন প্রোটীন আছে যা সুস্থ দেহে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য গবেষকদের কাছে একে কী করে প্রমাণ করা?

১৯৫০ সাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর সভাপতিমণ্ডলীর সভা চলছে। টিউমারে বহিরাগত প্রোটীনের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক এক্সপেরিমেণ্টের বিবরণ পেশ হল। সভ্যগণ আলোচনার মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলেন না, কিন্তু একটা জিনিষ সম্বন্ধে সকলেই এক মত হলেন। সেটা হচ্ছে এই যে বিষয়টি খুবই সন্দেহজনক, কাজেই একে ভাল করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এর সত্যতা যাচাই করবার জন্য দুটো কমিশন গঠিত হল, একটি মস্কোতে অন্যটি লেনিনগ্রাদে। যাতে কড়াকড়ি যাচাই হয় তার জন্য এই কমিশন দুটির মধ্যে গ্রহণ করা হল টিউমার উৎপত্তির ভাইরাস থিওরির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীদের।

লেবরেটারিগুলি খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ল। কমিশনের সভ্যরা তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে ছোট বড় সব জিনিষ পরীক্ষা করলেন। যতভাবে সম্ভব সব রকমে সবকিছু পরীক্ষা করলেন। এমনকি নিজেদের গবেষণার মালমশলা নিয়ে এসে তাঁরা এই নতুন এক্সপেরিমেণ্টের সামনে এমন সব কঠিন কঠিন প্রশ্ন রাখলেন আপাতদৃষ্টিতে যার উত্তর দিতে এই এক্সপেরিমেণ্ট অপারগ। কমিশনের কাজ চলল প্রায় তিন মাস ধরে। এক্সপেরিমেণ্টটির দ্বারা লেবরেটারিগুলিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, কমিশন তা পুরোপুরি সমর্থন করলেন। সন্দেহের আর অবকাশ রইল না যে টিউমারের মধ্যে এমন প্রোটীন থাকে যা সুস্থ টিসুতে পাওয়া যায় না।

টিউমারের মধ্যে ভাইরাস প্রোটীনের খোঁজ করা হল এই বলে যে সুস্থ শরীরের পক্ষে তা বহিরাগত প্রোটীন, এবং সত্যিসত্যিই দেখা গেল যে টিউমারে এমন প্রোটীন থাকে যা সুস্থ শরীরে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল, এই নতুন প্রোটীনই যে সেই ভাইরাস প্রোটীন তার প্রমাণ কি? এমনও ত হতে পারে যে এই প্রোটীন অন্য কোন প্রোটীন। এমনও ত হতে পারে যে ভাইরাস দেহের কোষের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে সেই কোষের আভ্যন্তরীণ প্রোটীন গঠনের চিরাচরিত প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, এবং তার ফলেই টিসুর ভিতর সাধারণ প্রোটীনের জায়গায় নতুন প্রোটীনের উদ্ভব হয়?

ঠিক এইভাবেই আবার ব্যাখ্যা করা যায় যে শুধু ভাইরাস কেন, ভাইরাস ছাড়া ক্যান্সার প্রস্তুতকারী অন্য দ্রব্যও ত সুস্থ শরীরের প্রোটীনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে? বহুদিন আগেই ব. ই. জবারস্কি ত এই মতই প্রকাশ করেছিলেন যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিনিষগুলি প্রোটীন

সিন্থিসিসে ব্যতিক্রম ঘটায়। এমনকি তিনি প্রমাণ করেও দেখান যে টিউমারের মধ্যে বিশেষ ধরনের ক্যান্সার প্রোটীন বা টিউমার প্রোটীন রয়েছে।

এই সব এবং আরও নানান প্রশ্ন তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে গবেষকদের সামনে উপস্থিত হল, যার উত্তর দেবার মত কোনই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা তাদের জানা ছিল না। বেশ বোঝা গেল যে, এই সমস্ত প্রশ্নের সামান্য এক অংশের জবাব দিতে হলেও বহু লোকের সমবেত ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন।

খরগোসের যে প্যাপিলোমার কথা আগে বলা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহ যে অন্তত সে প্যাপিলোমার কারণ ভাইরাস ও তাতে বহিরাগত প্রোটীন থাকে। সেই প্রোটীন যদি ভাইরাস দেহের প্রোটীন হয়ে থাকে তাহলে পর প্যাপিলোমা থেকে ভাইরাস সরিয়ে নিলে সেই প্যাপিলোমা টিস্যুতে নিশ্চয়ই আর ভিন্ন জাতের বহিরাগত প্রোটীন পাওয়া যাবে না। কিন্তু কী ভাবে তা সরিয়ে নেওয়া?

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা মাম্পস-এর ভাইরাস সলিউশনে যদি রক্তের লোহিত কণিকা (erythrocyte) যোগ করা হয় তাহলে দেখা যায় ভাইরাস সেই রক্ত কণিকাগুলির গায়ে আটকে গেছে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই সমস্ত রক্ত কণিকার ফটো তুললে দেখা যায় যে রক্ত কণিকার গায়ে থোকে থোকে ভাইরাস আটকে রয়েছে। এই সমস্ত রক্ত কণিকা যখন টেস্ট টিউবে তলানি হয়ে পড়ে তখন সেই ভাইরাসগুলিকেও নিজেদের সাথে নীচে নামিয়ে নেয়। এমনি করে বারে বারে সলিউশনের মধ্যে রক্ত কণিকা যোগ করে সেই সলিউশনটিকে ভাইরাস মুক্ত করা যায়। দেখা গেছে যে প্যাপিলোমার ভাইরাসও রক্ত কণিকার গায়ে আটকে যায়, তাই এইভাবে প্যাপিলোমা নির্যাসকেও ভাইরাস মুক্ত করা সম্ভব। ভাইরাস মুক্ত প্যাপিলোমা নির্যাসে কি এমন কোন বিশেষ প্রোটীন থাকে যা সুস্থ খরগোসের শরীরে পাওয়া যায় না?

সমস্ত রকমে ও সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করে বিশেষ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ভাইরাস মুক্ত প্যাপিলোমা নির্যাসে সুস্থ শরীরের তুলনায় ভিন্ন ধরনের প্রোটীনটা থেকেই যায়। অর্থাৎ তাহলে স্বীকার করতে হয় যে সত্যিই ক্যান্সার প্রোটীনের অস্তিত্ব আছে।

অন্যান্য টিউমারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে সর্বতোভাবে প্রমাণিত হল যে, সুস্থ টিস্যুতে দেখা যায় না এমন যে নতুন প্রোটীন টিউমার টিস্যুতে পাওয়া যায়, তা ভাইরাস প্রোটীন নয়। কথাটা তখন দাঁড়াল এই যে টিউমারের মধ্যে এক বিশেষ জাতের প্রোটীন আবিষ্কৃত হওয়ায়, ভাইরাস থেকেই টিউমারের উৎপত্তি, এই যে থিওরি, তার জয় পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তি হল না। কিন্তু ইমিউনলজির দিক থেকে এতে মস্ত লাভ হল! কেননা এই প্রথম সন্ধান পাওয়া গেল যে টিউমার কোষের মধ্যে যে সমস্ত প্রোটীন থাকে তা স্বাভাবিক টিস্যুতে প্রাপ্ত প্রোটীন থেকে ভিন্ন। এখন তাহলে টিউমারের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে ইমিউনিটি তৈরী করতে পারা উচিত।

যেমন আমাদের দেশে তেমনি বিদেশে অতি যত্ন সহকারে বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে টিউমারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরী করা সম্ভব। তবে কৃত্রিম উপায়ে যে ইমিউনিটি তৈরী হয় তা খাঁটি হলেও অত্যন্ত দুর্বল। তার কারণ এই, যে টিউমারের মধ্যে যে বিশেষ প্রোটীন পাওয়া যায় তার ঘনত্ব এত কম যে তা নেই বললেই চলে।

যে সমস্ত ইমিউনলজিস্ট ক্যান্সার সমস্যা নিয়ে কাজ করে তাদের সামনে আর একটি কঠিন প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, সে হল এই প্রোটীনকে বেশী কনসেন্ট্রেশনে বিশুদ্ধ অবস্থায় কী করে সংগ্রহ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে অনেক শক্তি ক্ষয় করা হয়েছে এবং সময়ও ব্যয় হয়েছে প্রচুর। কিন্তু দুঃখের বিষয় শুধু ইঁদুরের রক্তের ক্যান্সার ছাড়া আর কোন টিউমারের সমস্যা আজও পর্যন্ত সমাধান করা যায়নি।

আমাদের লেবরেটারির তরুণ বায়োকেমিস্ট গ. ই. আবেলেভ ও ভ. স. সুভেৎকভ টিউমারের স্পেসিফিক প্রোটীন বের করে নেবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। আমরা এখন সেই প্রোটীন পেয়েছি। তার পরিমাণ অবশ্য খুবই কম — এক মিলিগ্রামের শত ভাগের কয়েক ভাগ হবে। কিন্তু তাহলেও অগ্রগতির দিকে এটা এক মস্ত পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই। জটিল সমস্যাটির তত্ত্বগত সমাধান হয়েছে বটে, তবে এর ভিত্তিতে এখনও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে যাতে করে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কৃত্রিম ইমিউনিটি সৃষ্টি করার উপায় আবিষ্কার করা যায়।

টিউমারে ভিন্ন জাতের প্রোটীন আবিষ্কারের অন্য আরও একটা দিক থেকে সার্থকতা রয়েছে। এর ফলে ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের উৎপত্তির কারণ নির্ধারণের জটিল প্রশ্নটি যেন খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

কেন টিউমার বড় হয়ে ওঠে? চামড়ার কোষগুলির কথাই ধরা যাক। যে কোষগুলি বছরের পর বছর বহু বছর ধরে চমৎকার নিয়ম বজায় রেখে চামড়ার উপরি ভাগ মসৃণ রেখে, এক সারির পর আরেক সারি এইভাবে গজিয়ে এসেছে, তারা হঠাৎ কেন এত দ্রুত ও এত বিশৃঙ্খলভাবে গজাতে শুরু করে একটার পিঠে আরেকটা চড়ে বসে টিউমার সৃষ্টি করে সমানে বড় হয়ে উঠতে থাকে? সুস্থ শরীরে কোষ গজানর এক বাঁধা-ধরা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে; তাদের বংশবৃদ্ধির এক বিশেষ ধারা ও বিশেষ গতিবেগ রয়েছে যাতে করে বিশৃঙ্খলভাবে কোষগুলি এক জায়গায় স্তূপীকৃত না হতে পারে। কোষ গঠনের এই যে বাঁধা-ধরা নিয়ম, তা দেহের অন্যান্য ক্রিয়ার মতোই মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়। শত শত বছরের বিবর্তনের ফলে দেহের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও কোষের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। কোষের রাসায়নিক গঠন পরিবর্তিত হলে তার বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও পরিবর্তন ঘটে। এক বিশেষ প্রকারের প্রোটীনযুক্ত কোষের বংশবৃদ্ধির এখন যে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে কোষের প্রোটীন পরিবর্তিত হলে সেই

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অন্তত কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত হয়। কোষগুলি তখন এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। টিউমার কোষে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। স্বাভাবিক সুস্থ কোষ যখন টিউমার কোষে পরিবর্তিত হয় তার ভিতরকার প্রোটীন তখন বদলে যায়; তারা সম্পূর্ণ অন্যরকম কোষে পরিবর্তিত হয়। তাই তাদের বংশবৃদ্ধি তখন আর সুস্থ কোষের মতো নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। কেননা সে কোষের প্রোটীন যে বদলে গেছে। তারা এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে বংশবৃদ্ধি করে টিউমার সৃষ্টি করে।

টিউমার উৎপত্তির সবচেয়ে দুর্বোধ্য রহস্য টিউমার কোষের এলোমেলো বংশবৃদ্ধির কারণটি এখন যেন খানিকটা বোধগম্য হয়ে উঠছে। ভাইরাস, যদি সে তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা না হারায় তাহলে তা টিউমারকে আরও দ্রুত গতি বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইরাস উদ্ভূত টিউমারের প্রোটীন, পরে সেই ভাইরাসের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। খরগোসের প্যাপিলোমার ভাইরাসকে যদি প্যাপিলোমা উদ্ভূত ম্যালিগন্যান্ট টিউমার টিসুর সঙ্গে মেশানো যায় সেই ভাইরাস তাহলে খুব তাড়াতাড়ি, এমনকি ৩০ মিনিটের মধ্যেই তার রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মনে হয় এই ঘটনাটিই ভাইরাসের 'লুকিয়ে পড়ার' রহস্য।

সব কথা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় এই, যে ভাইরাস তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে জীব দেহের কোষের প্রোটীনকে বিকৃত করে ফেলে, তার ফলে সেই সব কোষের মধ্যে তখন দেখা দেয় এক নতুন ধরনের প্রোটীন যা সুস্থ কোষের মধ্যে থাকে না। সুস্থ দেহের অন্তর্নিহিত শক্তি, কোষের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তখন আর তত নিপুণতার সঙ্গে এই সব পরিবর্তিত কোষের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই এরা অতি দ্রুত ও এলোমেলো ভাবে বংশবৃদ্ধি শুরু করে দেয়।

নতুন তথ্য ও নতুন পথ

বহুকাল ধরে এই ধারণা চলে আসছিল যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্পেসিফিক, তার কোন পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ কোন এক ভাইরাস যদি ব্যাঙের মূত্রাশয়ে টিউমার সৃষ্টি করে, তাহলে পর সে ভাইরাস শুধু মূত্রাশয়েতেই টিউমার সৃষ্টি করবে শরীরের আর অন্য কোন অঙ্গে নয় এবং তাও আবার শুধু ব্যাঙের মধ্যেই অন্য কোন প্রাণীতে নয়। এই ধারণার ফলে মানুষের টিউমার সম্বন্ধে গবেষণা খুবই ব্যাহত হয়।

কথা হল এই, যে ভাইরাস থেকেই মানুষের টিউমার সৃষ্টি হয় ও সেই ভাইরাস যদি শুধুই মানুষকে আক্রমণ করে, তাহলে সেই ভাইরাস নিয়ে জন্তু জানোয়ারের উপর পরীক্ষা করার নিশ্চয়ই কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু দেখা গেল যে এই ধারণা ঠিক নয়। আসলে এমন

ভাইরাস আছে যার ক্রিয়া সত্যিই খুব স্পেসিফিক, কিন্তু এমন ভাইরাসও আছে, যারা বিভিন্ন প্রাণী দেহে ও বিভিন্ন অঙ্গে টিউমার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে দুইজন আমেরিকান নারী বৈজ্ঞানিক স্টুয়ার্ট ও এডি কর্তৃক আবিষ্কৃত, ইঁদুরের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের (parotid gland) ক্যান্সার থেকে পাওয়া ভাইরাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর সাহায্যে নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, শুয়োর ও খরগোস এই চার রকম প্রাণী দেহে ২৩ রকমের টিউমার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাহলে এমন ভাইরাসও আছে যারা বিভিন্ন প্রাণী দেহে টিউমার সৃষ্টি করে থাকে। কে বলতে পারে যে মানুষের মধ্যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি এই রকম ভাইরাস নয়? আমাদের মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে সত্যিই তাই; এদের মধ্যে অন্তত কতগুলি ভাইরাস সেই চরিত্রের।

আজ বিভিন্ন দেশে মানুষের রক্তের ক্যান্সার লিউকিমিয়াকে মানুষ থেকে জন্তুর মধ্যে চালান করবার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এ সম্বন্ধে ড. ম. বেরগলৎস অনেক কাজ করেছেন। লিউকিমিয়া রোগীর দেহ থেকে কোষবিহীন নির্যাস নিয়ে নেংটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে তিনি তাদের মধ্যে লিউকিমিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। রোগটিকে যে এইভাবে চালান করা গেছে তার কারণ নিশ্চয়ই ভাইরাস জাতীয় কোন জিনিষ। অর্থাৎ এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে মানুষের রক্তের ক্যান্সারের ভাইরাস ঘটিত চরিত্র।

কিন্তু ভাইরাস কি আর সবসময়ই টিউমারের মধ্যে এমন ভাবে থাকে যে তাকে বের করা সম্ভব? আমরা জানি সেই লুক্কায়িত ভাইরাসের কথা যারা রোগ সৃষ্টি করতে অপারগ। দেখা গেছে যে কোষের মধ্যে ভাইরাস এমন অবস্থাতেও থাকতে পারে যে তাকে সাধারণ নিয়মে কোষ থেকে বের করা অসম্ভব। সে অবস্থাটা তাহলে কী?

যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করে থাকে তাদের বলা হয় ব্যাক্টেরিওফাজ (ব্যাক্টেরিয়া খাদক) বা শুধু ফাজ। ফাজকে যদি যার উপর তার ক্রিয়া আছে এমন ব্যাক্টেরিয়ার কালচারে ফেলা হয়, তাহলে সেই কালচার গলে যায়। ফাজের প্রত্যেকটি অণুর মধ্যে থাকে প্রোটীন ও নিউক্লিক এসিড। ব্যাক্টেরিয়ার কোষের মধ্যে প্রবেশ করে নিউক্লিক এসিড সিন্থিসিসের সাহায্যে নতুন ফাজের অণু সৃষ্টি করে ও ব্যাক্টেরিয়া কোষ ভেঙ্গে যায়, মনে হয় যেন গলে গেল। এই গলে যাওয়া ব্যাক্টেরিয়ার কালচার থেকে ফাজকে সহজেই বের করা চলে।

কিন্তু এক এক সময় ফাজ ও ব্যাক্টেরিয়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সম্পূর্ণ অন্য প্রক্রিয়া দেখা দেয়। নিউক্লিক এসিড ব্যাক্টেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সিন্থিসিসের সাহায্যে নতুন ফাজের অণু সৃষ্টি না করে নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন আর সেই কালচার থেকে ফাজকে সাধারণ উপায়ে বের করা চলে না। কিন্তু এমন কিছুই কি আর করা যায় না যার ফলে সেই নিউক্লিক এসিড তার নিজ গুণ ফিরে পেয়ে সক্রিয় হয়ে আবার সিন্থিসিসের সাহায্যে ফাজের

অণু সৃষ্টি করে? এক অভিনব ঘটনা ধরা পড়ে গেল। দেখা গেল যে আল্ট্রাভায়োলেট ও রঞ্জনরশ্মির মতো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ নিউক্লিক এসিডকে আবার 'সক্রিয় করে' তোলে। রশ্মি ক্রিয়ার ফলে ব্যাক্টেরিয়া কালচারে দেখা দেয় নতুন ফাজের অণু, আর ব্যাক্টেরিয়ার কালচার তখন গলে যায়।

তেমনি করেই দেখা গেছে যে, উদ্ভিজ্য ও জীব দেহের অন্যান্য ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডও সে ভাইরাস কাবু করতে পারে এমন স্পর্শকাতর কোষের ভিতর প্রবেশ করে সিন্থিসিসের সাহায্যে, এমন সব ভাইরাস অণু সৃষ্টি করে ফেলতে পারে যার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীব কোষের মধ্যেও, ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড এমন ভাবে জমা হয়ে থাকতে পারে যা বিশেষ অবস্থার পরিবেশ পেলে তবে সিন্থিসিসের সাহায্যে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস অণু সৃষ্টি করে। কোষের মধ্যে জমা এই সব নিউক্লিক এসিডকে ভাইরলজির প্রথায় বা ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এখনও বের করা সম্ভব হয়নি।

মানুষ বা অন্যান্য জীব দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির পিছনে অনুরূপ কোন ঘটনা জড়িত আছে কি?

এরকম ধারণা করার অবশ্য যথেষ্ট ভিত্তি আছে। তার উপর আবার কয়েকটি এক্সপেরিমেণ্টও ইতিমধ্যেই এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করেছে। যেমন লিউকিমিয়া রোগে ভুগছে (লিউকিমিয়া হল রক্তের ক্যান্সার) এমন রোগীর টিসুর নিউক্লিক এসিড ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে অনুরূপ রোগ সৃষ্টি করা গেছে। এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিমধ্যে ক্যান্সারের কারণ অনুসন্ধানের দিকে মাত্র প্রথম পদক্ষেপ করা হয়েছে। এতে অবশ্য ভাইরলজির সাথে সাথে বায়োকেমিক অনুসন্ধানের উপায়গুলিরও অবদান কম নয়। আগামী কয়েক বছরে অনুসন্ধানের এই উপায়গুলি নিশ্চয়ই আরও প্রসার লাভ করবে ও টিউমার চর্চার ক্ষেত্রে জমে উঠবে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য।

এরই মধ্যে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে ভাইরাস, বিশেষ করে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও দেহের কোষের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রক্রিয়া হয়, সে প্রক্রিয়া যেমন জটিল তেমনি বহুমুখী। এর পৃথক পৃথক ধাপগুলিকে এখনও ভালোমত অধ্যয়ন করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এক্সপেরিমেণ্ট্যাল এংকলজি বা টিউমার বিজ্ঞান এখন দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পরীক্ষার নতুন নতুন পদ্ধতি যেগুলোকে এখনও পর্যন্ত সবে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলছে তাদের মারফৎ এরই মধ্যে অনেক নতুন তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্ত পদ্ধতিকে নিশ্চয়ই আরও ঢের উন্নত করা সম্ভব হবে এবং তা ব্যবহার করে আমরা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাব অনতি দূরের সেই যুগে যখন ক্যান্সারের রহস্য আর রহস্য থাকবে না।

টিউমার তাহলে হয় কেমন করে?

যদি ঠিক জন্মের পর পরই তার দেহে ক্যান্সারের ভাইরাস প্রবেশ করে তাহলেই ইঁদুরের স্তনের ক্যান্সার হয়। সাধারণত নবজাত ইঁদুরের মধ্যে এই ভাইরাস প্রবেশ করে তার মায়ের দুধের মাধ্যমে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন রক্তের ক্যান্সার, তাতে ইনফেকশন হয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ও সেই ইনফেকশন নিয়েই ইঁদুরের জন্ম হয়। খরগোসের প্যাপিলোমা, ইঁদুরের সার্কোমা প্রভৃতি সাধারণত রক্তশোষক পরজীবীর দ্বারা সঞ্চারিত হয়। এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্যের দেহে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাস সংক্রমণের আরও কতগুলি উপায়ের সন্ধান এখন পাওয়া গেছে।

মানুষের ক্যান্সার সংক্রামক ব্যাধি নয়।

এমন কোন ঘটনা জানা নেই যাতে করে প্রমাণিত হয় যে সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে রোগীর দেহ থেকে ক্যান্সার সঞ্চারিত হয়েছে। ক্যান্সার রুগীর সেবা শুশ্রূষা করে এমন ডাক্তার বা নার্সদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত লোকদের থেকে বেশী নয়। কাজেই বলা চলে যে সান্নিধ্যের ফলে এ রোগ সঞ্চারিত হয় না। জীবজন্তুর বেশীর ভাগ টিউমারের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ক্যান্সার হয়ত ইঁদুরের লিউকিমিয়ার মতো মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থাতেই মানুষের দেহে সঞ্চারিত হয়ে যায়? এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যে ভাবেই ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস মানুষের দেহে ঢুকুক না কেন, বহুদিন ধরে দেহের মধ্যে তার অবস্থিতির কোনই বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় না। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কেননা এদের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা খুবই কম। বাস্তবে রোগ সৃষ্টি করবার জন্য এদের চাই বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পরিবেশ। যতদিন পর্যন্ত না সেই পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এ ভাইরাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। কোন ক্ষতি না করে এরা মানুষের দেহে এমনকি তার সারাটা জীবন সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। এমনও দেখা যায়, খুব ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া অথচ এই ভাবে সেগুলো মানুষের দেহে সারা জীবন সুপ্ত রয়ে গেল। যেমন যক্ষ্মা রোগের বীজাণু। এই বীজাণু এক এক সময় মানুষের দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার দেহে সারা জীবনের জন্য সুপ্ত রয়ে যায় ও এই বীজাণুর তখন বাইরে থেকে কোন হদিসই পাওয়া যায় না। প্রায় প্রত্যেক মানুষের দেহেই ত যক্ষ্মা রোগের বীজাণু থাকে কিন্তু রোগ হয় কজনার? মানুষে হার্পিস (herpes) রোগের ভাইরাস, ইঁদুরে স্তন ক্যান্সারের ভাইরাস, গিনিপিগে মেনিঞ্জাইটিসের ভাইরাস এমনি করেই সারা জীবন সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে। কাজেই

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ক্যান্সারের ভাইরাস মানুষের দেহে বছরের পর বছর সুপ্ত থেকে যায় ও কোন কোন ক্ষেত্রে সারা জীবনেও তার রোগ সৃষ্টির কোনই কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। প্রশ্ন জাগে কী অবস্থায় তাহলে এদের কর্মতৎপরতা জেগে ওঠে? আমরা শুধু কয়েকটি এই রকম অবস্থার কথা জানি।

এর মধ্যে সর্বপ্রধান হল দেহের কোন না কোন অংশে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভ্রূণ সাদৃশ্য বংশবৃদ্ধিরত কোষ সমষ্টির অবস্থিতি। অন্যদিকে আবার যে সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় সেই সব প্রক্রিয়ার ফলেই এই রকম বংশবৃদ্ধিরত ভ্রূণ সাদৃশ্য নবীন কোষের নীড় তৈরী হয়। দেহের মধ্যে যদি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ ইঞ্জেকশন করা যায় বা বহুদিন ধরে বারে বারে এমনকি ফ্রুকটোজের মতো নিরীহ জিনিষও ইঞ্জেকশন করা হয়, তাহলে যেই টিস্যুতে সে ইঞ্জেকশন করা হল সেই টিস্যুতে প্রতিক্রিয়ার ফলে সামান্য কিছু টিস্যু বিনষ্ট হয়। যে কোন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ ইঞ্জেকশন করলেও এই একইভাবে খানিকটা টিস্যু বিনষ্ট হয়। নষ্ট হওয়া টিস্যুর জায়গায় সৃষ্টি হয় নতুন অপরিপক্ক টিস্যু। এভাবে এই প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে চলতে থাকে ও এমনি করেই সৃষ্টি হয় বংশবৃদ্ধিরত ভ্রূণ সাদৃশ্য নবীন কোষের নীড়। প্রত্যেকটি এই রকম নীড় থেকেই যে ক্যান্সার হবে তার কোন মানে নেই।

অবশ্য এই রকম নীড় আগে থেকে সৃষ্টি না হলে কখনই ক্যান্সার হয় না। এই অবস্থাটিকে তাই বলা হয় প্রাক্ ক্যান্সার পর্যায়। দেহের মধ্যে প্রথমে তাহলে বংশবৃদ্ধিরত নবীন কোষের নীড় তৈরী হয়। এই সমস্ত কোষগুলিই হল ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ। স্বভাবতই দেহের মধ্যে অবস্থিত ভাইরাস এই সব কোষের দিকেই ছুটে আসে ও সেখানে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ঐ টিস্যুকে ক্যান্সার টিস্যুতে পরিণত করে।

কাজেই ক্যান্সারের উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি খুবই এক জটিল প্রক্রিয়া যাতে রোগীর দেহের ভূমিকাই হল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। ক্যান্সার রোগ কোন এক বিশেষ অঙ্গের রোগ নয়, এ রোগ গোটা দেহের রোগ; কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের তত্ত্বাবধানে গোটা দেহ ক্যান্সারের উৎপত্তি ও সেই টিউমারের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে।

এখন বোঝা যাচ্ছে ক্যান্সার রোগ উৎপত্তির এত নানান কারণ কেন ধরা পড়েছে। এই সমস্ত কারণগুলিরই কাজ করার এক সাধারণ পথ আছে — সে হল, দেহে বংশবৃদ্ধিরত ভ্রূণ সাদৃশ্য অপরিপক্ক নবীন কোষের নীড় তৈরী করা। ক্যান্সারের এই সমস্ত কারণকে তাহলে ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ না বলে প্রাক্ ক্যান্সারের কারণ বলে অভিহিত করা উচিত। প্রাক্ ক্যান্সার আসল ক্যান্সারে পরিণত হয় শুধু তখনি যখন ভাইরাসের প্রক্রিয়ার ফলে প্রাক্ ক্যান্সারের স্বাভাবিক কোষগুলি টিউমার কোষে পরিণত হয়।

হাতে কলমে তাহলে একে কী করে প্রমাণ করা যায়?

এই সমস্ত তত্ত্বগত পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আমরা কী প্রত্যক্ষ ফল পেতে পারি? লেবরেটারি প্রথায় আমরা আজ বহু ভাইরাস প্রসূত রোগ নির্ণয় করতে পেরেছি এবং ভ্যাকসিন ব্যবহার করে তাদের রোধ করাও সম্ভব হয়েছে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সে রকম কোন ভ্যাকসিন বেরোবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? ক্যান্সার উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি যেমন অসম্ভব জটিল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়াও ঠিক তেমনি কঠিন।

বহুদিন ধরেই মানুষের জানা আছে যে কোন টিউমার যদি আপনা থেকে দেবে বা চুপসে যায় তাহলে সেই টিউমারের প্রতি সেই নির্দিষ্ট জীবদেহে ইমিউনিটি জন্মে। সেই জীবদেহে দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বার চেষ্টা করেও আর কোন রকমেই সেই নির্দিষ্ট টিউমার সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মৃত টিউমার কোষ ইঞ্জেকশন করে প্রাণী দেহে কিছুতেই টিউমারের প্রতি ইমিউনিটি তৈরী করা যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে যারাই কাজ করেছে তারা সকলেই উপরোক্ত পর্যবেক্ষণটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এবিষয়ে আর কোনই মতভেদ নেই যে একমাত্র সজীব কোষের সাহায্যেই টিউমারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরী করা চলে। আ. ম. বেজ্রেদেকা চামড়ার মধ্যে সামান্য কিছু সজীব টিউমার কোষ ইঞ্জেকশন করবার সুপারিশ করেন যাতে সেই কোষগুলি দেহের মধ্যে শুষে যাবার ফলে ইমিউনিটি তৈরী হয়। কিন্তু এতে করে কোনো ফল হয়নি, কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিই ইমিউনিটি দেখা দিল আবার অন্য ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন করা কোষ থেকে আস্তে আস্তে টিউমার সৃষ্টি হল।

সজীব টিউমার কোষের সাহায্যেই যদি ইমিউনিটি তৈরী হয় আর মৃত কোষ থেকে তা সম্ভব না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, যে পদ্ধতিতে কোষকে বিনষ্ট করা হয় সে পদ্ধতি কোন কাজের নয়। সে পদ্ধতি নিশ্চয়ই কোষ প্রোটীনকে এমনভাবে বদলে ফেলে যে তার দ্বারা আর ইমিউনিটি গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। প্রশ্ন তাহলে এই যে, কোষ বিনষ্ট করবার এমন পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে কোষ মরে যায় অথচ কোষ প্রোটীনের কোন পরিবর্তন না হয়। ভেবে চিন্তে নানা রকমের বহু উপায় খাড়া করা হল, কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। প্রশ্নটি রয়ে গেল অমীমাংসিত। যখন জানা গেল, টিউমারে থাকে দেহের পক্ষে অপরিচিত দুই রকমের প্রোটীন — টিসু প্রোটীন ও ভাইরাস প্রোটীন তখন স্বভাবতই টিউমারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করাতে এই দুই প্রোটীনের কার কী ক্ষমতা তা পরীক্ষা করে দেখারও সার্থকতা দেখা দিল। বিভিন্ন পশুর দেহে এই সমস্ত পরীক্ষা চালান হল।

ইতিপূর্বে পরিচিত সেই মুর্গীর সার্কোমা নিয়েই পরীক্ষা শুরু হল। সেই টিউমারের টিসু থেকে ভাইরাসকে এমন ভাবে বের করে নেওয়া হল যাতে তা যতদূর সম্ভব টিউমার টিসু প্রোটীন থেকে মুক্ত হয়। ভাইরাস সলিউশনে খানিকটা ফরমালিন যোগ করা হলে,

ফরমালিন সমস্ত ভাইরাসকে এমনকি মুরগীর সার্কোমা প্রস্তুতকারী ভাইরাসকেও সহজে মেরে ফেলে। মৃত ভাইরাস সলিউশন কতগুলি সুস্থ মুরগীর চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন করা হল এবং তার এক মাস পর সেই সব মুরগীর দেহে পুনরায় জীবন্ত ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দেখা গেল যে তাদের অর্ধেকের বেশী মুরগী সুস্থ রয়েছে। অর্থাৎ মৃত সার্কোমা ভাইরাস জীবন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরী করেছে।

খরগোসের প্যাপিলোমা নিয়ে যে পরীক্ষা করা হল তাতে আরও ভাল ফল পাওয়া গেল। এই রোগের জীবন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রায় শতকরা শত ক্ষেত্রেই ইমিউনিটি সৃষ্টি করা সম্ভব হল।

এইরকম সব এক্সপেরিমেন্টের অসম্ভব তাৎপর্য। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষের টিউমারের ভাইরাস যখন বের হবে তখন সেই ভাইরাসকে মেরে বা নির্জীব করে তার থেকে টিকা তৈরী করে ব্যবহার করার বাস্তব সার্থকতা দেখা দেবে।

প্রতিরোধের ব্যাপারটা না হয় হল, কিন্তু একবার ক্যান্সার হয়ে গেলে কী করা? টিকা দেওয়া মুরগীর দেহে জীবন্ত সার্কোমা ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে দেখা গেল সকলেই সুস্থ রয়েছে। কিন্তু তারপর তাদেরই গায়ে সার্কোমা টিস্যু ইঞ্জেকশন করে দেখা গেল সকলেরই সার্কোমা হচ্ছে। এই এক্সপেরিমেন্টটি খরগোসের মধ্যে করেও একই ফল পাওয়া গেল। টিকা দেওয়া খরগোসের গায়ে জীবন্ত ভাইরাস দিয়ে একটিরও রোগ হল না, অথচ প্যাপিলোমা জাতীয় ক্যান্সার টিস্যুর টিকা দিতে সকলের যে শুধু রোগই হল তাই নয় সবকটি খরগোস শেষ পর্যন্ত মরে গেল।

অর্থাৎ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি, সে হল এক জিনিষ আর টিউমার কোষের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। ভাইরাস ও টিউমার কোষের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টির পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন তাহলে বোঝা যায় টিউমার টিস্যুতে দেহের পক্ষে অপরিচিত দুই রকমের প্রোটীন পাওয়া যায় কেন — একটি হল ভাইরাস প্রোটীন, অপরটি টিস্যু প্রোটীন। খুব সম্ভব এর একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে ও অপরটি টিউমার কোষের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে। ভাইরাস প্রোটীন যে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি তৈরী করে তা আমরা আগেই দেখেছি। এখন পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে, টিউমার টিস্যু নির্যাসে দেহের পক্ষে অপরিচিত যে টিস্যু প্রোটীন থাকে তা সেই টিউমারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে কিনা।

এই সব এক্সপেরিমেণ্ট খুবই শক্ত। বহুদিন ধরে এর দ্বারা কোন ফল না পেয়ে আমরা স্থির করলাম বিফলতার কারণগুলি অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা দেখেছি যে, টিউমার যদি আপনা থেকে দেবে যায় বা গলে যায় তাহলে সেই দেহে দ্বিতীয় বার টিউমার কোষ ইঞ্জেকশন

করলেও কোন ক্ষতি হয় না, কেননা এর বিরুদ্ধে তার দেহে ইমিউনিটি জন্ম গেছে। বোঝা গেল যে টিউমার দেবে গেলে পর তাতে করে অপরিবর্তিত অবস্থায় মুক্ত হয় কিছু পরিমাণ টিসু প্রোটীন যা দেহের মধ্যে টিউমার কোষের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে। টিউমার টিসুকে তাহলে টেস্ট টিউবের মধ্যে এইরকম ভাবে গলাতে চেষ্টা করলে কী হয়? শেষ পর্যন্ত একটা উপযুক্ত উপায় বেরুল যাতে টিউমার টিসুকে গলিয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায় তার টিসু প্রোটীন, যা সেই টিউমারের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে। এই প্রোটীন প্রাকৃতিক ইমিউনিটির মতো তত শক্ত ইমিউনিটি তৈরী করতে না পারলেও, এর সাহায্যে, পশুদের মধ্যে অন্ততপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি জীবন্ত টিউমার কোষ ইঞ্জেকশন করার পরও টিউমার হওয়া বন্ধ করা যায়। অর্থাৎ, তাহলে আজ এমন বস্তুর সন্ধান মিলল যাতে একটিও জীবন্ত টিউমার কোষ নেই অথচ তার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে টিকা দিয়ে টিউমার হওয়া রোধ করা সম্ভব।

কিন্তু তা হলেও এটা হচ্ছে কেবল মাত্র প্রথম পদক্ষেপ। জন্তুর দেহের উপর পরীক্ষা করে এর দ্বারা যে ইমিউনিটি তৈরী হয় তা এখনও পর্যন্ত খুবই দুর্বল।

মনে হয় তার কারণ এই যে, যে-বিশেষ বস্তুটি ইমিউনিটি তৈরী করে, টিউমারের মধ্যে তার ঘনত্ব খুবই কম।

গবেষকদের সামনে তাই এখন মূল সমস্যা হল, এই বস্তুটিকে কী করে ঘন ও উপযুক্ত রকম শুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা যায়। কাজটি খুবই কঠিন কেননা বৈজ্ঞানিকদের হাতে এর কোন তৈরী উপায় এখনও পর্যন্ত নেই, সমস্তটাই অনুসন্ধানের পর্যায়ে; তবে বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা সমাধানের পেছনে যে পরিমাণ পরিশ্রম করা হচ্ছে তাতে আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে।

টিউমার থেকে ইমিউনিটি সৃষ্টিকারী বস্তুটি বেরুলে তাকে নানা কাজে লাগান যাবে। মনে হয় ক্যান্সার রোগের মেটাস্টেসিস রোধ করতে বা টিউমার কেটে বাদ দেওয়ার পর তার শেষ চিহ্ন নির্মূল করতে ঐ বস্তুগুলি খুবই কাজে লাগবে। এর সাহায্যে ক্যান্সার রোগ নির্ধারণের উপায়ও হয়ত বেরুবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ যা এর দ্বারা সম্ভব হবে তা হচ্ছে এই যে এই বস্তু ব্যবহার করে এমন সিরাম (serum) তৈরী হবে যা শরীরের মধ্যে বেছে বেছে শুধু টিউমার টিসুর বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া করবে। আজ বহু বছর ধরে এই সিরাম বের করার প্রচেষ্টা চলেছে। প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে ঐরকম সিরাম দিয়ে হয়ত ক্যান্সার রোগের সফল চিকিৎসা করা সম্ভব হবে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে সে ধারণা ভিত্তিহীন। ব্যাপার এই যে, ক্যান্সার বিরোধী সিরাম তৈরী হয় মানুষের টিউমার দিয়ে জন্তুর দেহ ইমিউনাইজ করে। এই সমস্ত সিরাম আসলে মনুষ্য দেহের পক্ষে বহিরাগত প্রোটীন। মানুষের দেহে প্রবেশ করবার ৫—৭ দিনের মধ্যেই এ প্রোটীনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এত কম সময়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সিরামের পক্ষেও টিউমার কোষের বড় একটা অংশ গলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তাই

ক্যান্সার বিরোধী সিরামের উপর চিকিৎসার আশা করা বৃথা। তবু অন্য কাজের জন্য এই সমস্ত সিরাম খুব দরকার। আজকাল রেডিওএকটিভ রশ্মি দিয়ে অনেক টিউমারের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু টিউমারে যখন রশ্মি দেওয়া হয় কিছু সুস্থ টিসুতেও তখন রশ্মি ক্রিয়া না হয়ে পারে না। এমন অনেক পদার্থ আছে যার দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেডিওএকটিভ রশ্মির ক্রিয়া করান সম্ভব।

ঐ সমস্ত পদার্থকে কি শরীরের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করান যায় না যার দ্বারা দেহের ভিতরে গিয়ে শুধু টিউমার টিসুর উপরই তারা রশ্মি ক্রিয়া করে টিউমার বিনষ্ট করবে? দেখা গেছে যে সাধারণ উপায়ে সেই পদার্থগুলোকে শরীরে প্রবেশ করালে তারা শরীরের বিভিন্ন টিসুতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে কতগুলি আবার শেষাশেষি হাড়ে গিয়েও জমা হয়, কিন্তু টিউমারে হাজির হয় অতি সামান্যই।

এই সব তথ্য যখন জানা গেল, তখন রেডিওএকটিভ পদার্থকে টিউমার টিসুতে নিয়ে হাজির করার জন্য ক্যান্সার বিরোধী সিরামকে ঐসব বস্তুর বাহক হিসাবে ব্যবহার করার খেয়াল জাগল। কতগুলি এক্সপেরিমেণ্টে সত্যিই দেখা গেল যে, রেডিওএকটিভ পদার্থগুলিকে যদি ক্যান্সার বিরোধী সিরাম প্রোটীনের সাথে যুক্ত করা যায় ও সেই সিরাম টিউমারে ভুগছে এমন জন্তুর দেহে ইঞ্জেকশন করা হয় তাহলে বাহক যেমন নির্ধারিত ঠিকানায় তার বোঝা বহন করে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবেই সেই রেডিওএকটিভ পদার্থগুলিও প্রধানত প্রায় সব গিয়ে জমা হয় টিউমারে।

কিন্তু মুশকিল হল এই, যে সুস্থ টিসুকে বাদ দিয়ে শুধু টিউমার টিসুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করবে এমন সিরাম তৈরী করা খুব কমই সম্ভব হয়। এখনও পর্যন্ত এমন কোন সঠিক উপায় জানা যায়নি, যার দ্বারা বর্তমান প্রয়োজন মেটাবার মত পরিমাণে এই রকম সিরাম তৈরী করা চলে।

আশা আছে টিউমার থেকে টিউমার বিরোধী ইমিউনিটি প্রস্তুতকারী সেই বিশেষ বস্তুগুলি বের করতে পারলে তার দ্বারা অনুরূপ সিরাম তৈরী সম্ভব হবে। তখন খুলে যাবে অনেক নতুন পথ ও বিশেষ করে সহজ হবে ক্যান্সার নির্ধারণের উপায়, কেননা রেডিওএকটিভ পদার্থ কোথায় গিয়ে জমা হয়েছে সে জায়গা অনুসন্ধান করে বের করা মোটেই কঠিন নয়।

আর সিরামের সঙ্গে যদি উপযুক্ত পরিমাণ রেডিওএকটিভ বস্তু মেশান সম্ভব হয় তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে টিউমারে জমা হয়ে এরা টিউমারকে সরিয়ে তুলবার কাজটিও সমাধা করবে।

ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বস্তু নিয়ে অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ক্যান্সার বিরোধী লড়াইয়ের অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। ঐসব বস্তু প্রত্যক্ষভাবেই ক্যান্সার সৃষ্টি করুক, যেমন কেউ কেউ মনে করেন, বা পরোক্ষভাবেই ক্যান্সার সৃষ্টিকারী শক্তিকে সক্রিয় করে তুলে টিউমার সৃষ্টি করুক, সকলেই একমত যে মানুষ যাতে এই সব জিনিষের সংস্পর্শে না আসতে

পারে তাই হল স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের এক অন্যতম প্রধান কাজ। দুঃখের বিষয় ধূমপান রোধ করার জন্য এখনও প্রায় কিছুই করা হচ্ছে না, যদিও প্রমাণ হয়ে গেছে যে ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে নিত্য যে সব নতুন নতুন বস্তু তৈরী হচ্ছে তাদের ক্যান্সার সৃষ্টি কর্‌র মত কোন ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা অবশ্য প্রয়োজন। এ কাজ করে থাকে স্যানিটারি ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান।

ক্যান্সার প্রতিরোধের প্রচুর কাজ হচ্ছে এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে। ক্যান্সার আছে কিনা, তা সময়মত খুঁজে বের করার জন্য এখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। কেননা যত আগে এই রোগ ধরা পড়ে তত সহজ তার চিকিৎসা।

এই সব সত্ত্বেও বলা চলে যে, যা করা হচ্ছে রোগটিকে প্রচুর পরিমাণে কমিয়ে আনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই রোগের সমগ্র চরিত্রটি যখন বিশদভাবে জানা যাবে কেবল মাত্র তখনই এর বিরুদ্ধে সফল লড়াইয়ের ভিত্তি রচিত হবে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক বড় বড় জিনিষ হাতড়াতে হাতড়াতেই আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন বসন্ত। বসন্তের আসল চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু জানবার আগেই বেরিয়ে যায় বসন্তের টিকা।

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক কোন জিনিষ তত্ত্বগত দিক থেকে খুব ভাল করে জানা হয়ে গেলে তবেই তার সম্বন্ধে করণীয় নির্ধারিত হয়। যেমন আণবিক শক্তি। দীর্ঘ দশ বছরের উপর গভীর তত্ত্বগত অনুসন্ধানের পর আমাদেরই চোখের সামনে এই সেদিন এর ব্যবহারিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে।

ক্যান্সারের বেলাতেও তাই। এই সমস্যা সম্বন্ধে আজ তত্ত্বগত দিক থেকে যে ব্যাপকতম অনুসন্ধানের কাজ চলেছে তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে এইসব তত্ত্বগত তথ্যের সফল প্রয়োগের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

* * *

ক্যান্সার রোগের চরিত্র নির্ধারণের সমস্যাটি আজ চার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আধুনিক বায়োলজি ও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সামনেও এই সমস্যা এক অন্যতম সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হতে চলেছে, তবে আজও এ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ পরিষ্কার নয় বা সেই সব বিষয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। ক্যান্সার সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন এখনও তাঁদের প্রচুর বাধা অতিক্রম করতে হবে। শুধু বাধা কেন, কত দুরাশা, কত ভুলভ্রান্তি হবে! কিন্তু তা হলেও ...

তত্ত্বগত টিউমার বিজ্ঞান আজ সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে, যত শীঘ্র সম্ভব এই পথেই আসুক এই ব্যাপক মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।

আ. আ. বাগ্দাসারভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের
চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর
পূর্ণ সদস্য

জীবনের উৎস

সার্জেন, থেরাপিস্ট, ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ, গাইনেকলজিস্ট বা শিশুচিকিৎসক, যেই হোক না কেন, ডাক্তারের পক্ষে ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা রক্ত পরিসঞ্চালন ছাড়া কাজ চালান মুশকিল।

খুবই কার্যকরী এই ব্যবস্থাটির ফলে চিকিৎসার বহু ক্ষেত্রে আজ প্রচুর উন্নতি হয়েছে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, খাদ্যনালী ও প্যাকস্থলীর উপর যে সব জটিল অপারেশন এখন করা হয় তা যে শুধু অস্ত্রচিকিৎসার টেকনিকের উন্নতির ফলেই করা সম্ভব হচ্ছে তা নয়, রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহার করাও এর এক অন্যতম কারণ। দুর্ঘটনা ও প্রসবজনিত প্রচুর রক্তক্ষয়ে বা রক্তাল্পতার চিকিৎসায় রক্ত পরিসঞ্চালন বাদ দিলে চলে না। দীর্ঘস্থায়ী রক্তাল্পতায় ও আরও অনেক রোগে রক্ত পরিসঞ্চালন আজকাল খুবই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এক কথায় রক্ত পরিসঞ্চালন যেন এখন চিকিৎসার এক সাধারণ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু শহরেই নয় এমনকি সুদূর মফস্বলের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেও তা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান রক্তের চাহিদা মেটানর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক এই বিষয়ে বিশেষিকৃত প্রতিষ্ঠানের এক ব্যাপক জাল গড়ে উঠেছে। তাতে আছে রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ক বহু ইনস্টিটিউট স্টেশন ও বিভাগ। এই সব প্রতিষ্ঠান একত্রে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্ত যোগানর ব্যবস্থা, বা যাকে বলে, ব্লাড স্যার্ভিস সংগঠিত করে।

রক্ত পরিসঞ্চালনের ইতিহাস থেকে

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে রক্তের রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। রক্ত পরিসঞ্চালন সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আমাদের যুগের ৩০ শতাব্দী আগে রচিত প্রাচীন মিশরীয় পুঁথির মধ্যে, গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক পিফিগরের

লেখায় ও প্রাচীন কালের বিখ্যাত কবি হোমার ও অভিদির কবিতায়ও এর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

কিন্তু রক্ত কী করে পরিসঞ্চালন করতে হয় তা সে সময় জানা ছিল না, ওষুধের মতই তা পান করা হত।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে এই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল ১৪৯২ সালে যখন ধর্মগুরু সপ্তম ইন্নকেন্টের যৌবন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁকে তিনটি দশ বছরের ছেলের দেহ থেকে সংগ্রহ করা রক্ত পান করতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে এই চিকিৎসার সঙ্গে রক্ত পরিসঞ্চালনের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগে ১৬২৮ সালে যখন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হার্ভে মানুষের দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের মূল নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে সমর্থ হন।

হার্ভের আবিষ্কারের ঠিক পরেই পশুদেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করা হয় এবং তার প্রাথমিক সাফল্যের পরই ভেড়ার ছানা ও বাছুরের দেহ থেকে মানুষের দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। ১৬৬৭ সালে ফরাসী প্রফেসর, একাধারে অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিক জাঁ দেনী এবং অস্ত্রচিকিৎসক এম্মেরেৎস বারে বারে রক্ত বের করে দেওয়ার ফলে দুর্বল হয়ে যাওয়া ১৬ বছরের একটি ছেলের শরীরে সাফল্যের সঙ্গে ২৫০ সিঃ সিঃ ভেড়ার রক্ত পরিসঞ্চালন করতে সমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে তখনকার দিনে বিভিন্ন রোগে দেহ থেকে খানিকটা করে রক্ত বের করে নেওয়ার খুবই প্রচলন ছিল। পশু থেকে মানুষে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রথম এক্সপেরিমেন্টে আশাপ্রদ ফল লাভের পর চিকিৎসকদের মনে যে উদ্দীপনা এসেছিল তা অচিরেই ধূলিসাৎ হয়, কেননা এরপর অনুরূপ সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অনুরূপ রক্ত পরিসঞ্চালনে রোগীর দেহে প্রথমে দেখা দেয় ভীষণ প্রতিক্রিয়া, তারপর তার মৃত্যু হয়। রক্ত দেওয়ায় প্রাণ হারানো রোগীদের ক্ষুব্ধ আত্মীয়স্বজন কর্তৃক কয়েক বার কাছারিতে ডাক্তারের বিরুদ্ধে নালিশ হওয়ার পর অনেক দেশেই কড়া শাস্তির ভয় দেখিয়ে আইন করে রক্ত দেওয়া বন্ধ করানো হয়।

পশুর রক্ত মানুষে পরিসঞ্চালন করা যে কখনই সফল হতে পারে না তা এখন পরিষ্কার বোঝা গেছে। এই দুই রক্ত পরস্পর মিশ খায় না। মানুষের রক্তের শিরায় ঢোকামাত্র পশুর রক্ত কণিকাগুলি ভেঙ্গে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির শরীরে দেখা দেয় ভীষণ প্রতিক্রিয়া এবং কখন সখন তার মৃত্যু হয়।

১৮১৯ সালে লণ্ডনে প্রফেসর ব্লুণ্ডেলই সর্বপ্রথম মানুষ থেকে মানুষে সফল রক্ত পরিসঞ্চালন করতে সমর্থ হন। কিন্তু ঠিক এরপরই আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ থেকে

মানুষে রক্ত দেওয়ায় কুফল ফলতে শুরু হয়। সে সময় তাই চিকিৎসার উপায় হিসাবে রক্ত পরিসঞ্চালন তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি।

আসল কারণ অবশ্য এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তখনও জানা ছিল না যে, দুই পৃথক মানুষের একজনের রক্ত সব সময় অন্যের রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না। তাছাড়াও, তখন রক্ত পরিসঞ্চালনের টেকনিক যেমন অনুন্নত ছিল তেমনি রক্ত সংরক্ষণ, বা রক্ত যাতে জমে না যায়, তারও তেমন কোন ব্যবস্থা জানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা ঠিক জানতেন না কী কারণে রক্ত পরিসঞ্চালন বিফল হয় বা পরিসঞ্চালনের পর প্রতিক্রিয়া হয়ে মানুষ মরে যায়।

এদিক থেকে বিচার করলে ১৯০০ সালকে যুগ পরিবর্তনের বছর হিসাবে ধরা যায়, কেননা সেই বছরেই ভিয়েনার ব্যাক্টেরিওলজিস্ট কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার আবিষ্কার করেন যে চরিত্রগতভাবে মানুষের রক্তকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। ল্যাণ্ডস্টাইনারের গবেষণা নিয়ে আরও অনুসন্ধান করতে করতে ১৯০৭ সালে ইয়ানস্কি ও ১৯১০ সালে মস মানুষের রক্তের আরও একটি অর্থাৎ চতুর্থ গ্রুপের সন্ধান পান, এই সব বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে ধরা পড়ে যে দুই ভিন্ন গ্রুপের রক্ত পরস্পর মেশালে পর রক্তের লোহিত কণিকাগুলি পরস্পর পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে যায় (এগ্লুটিনেশন), এবং ঠিক এই জিনিষটিই পরিলক্ষিত হয় তখন, যখন গ্রুপ হিসাবে মিশ খায় না এমন রক্ত পরিসঞ্চালনের পর দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এইসব আবিষ্কারের পর থেকেই রোগীর রক্তের গ্রুপের উপর নির্ভর করে তার রক্তের সাথে মিশ খায় এমন রক্ত বেছে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়াটি এখন তাই সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯১৪ সালে হিউস্টেন রক্ত জমে যাওয়া রোধ করার জন্য সোডিয়াম সাইট্রেট ব্যবহারের সুপারিশ করেন, তার সুপারিশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এর সাহায্যে তরল অবস্থায় রক্ত সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হয়, অর্থাৎ হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব হয় সংগ্রহ করা সঞ্চিত রক্তের যোগান।

এইভাবেই রক্তের গ্রুপ ঠিক করা ও রক্ত জমে যাওয়া রোধ করার পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পর রোগের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহার করার সুযোগ দেখা দিয়েছে।

১৮৩২ সালে, অর্থাৎ কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনারের আবিষ্কারের বহু আগে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সফল রক্ত পরিসঞ্চালন করতে সমর্থ হন পিটার্সবুর্গের ধাত্রীবিদ ভল্ফ। তারপর আ. ম. ফিলমাফিৎস্কি, ভ. ভ. সুতুগিন, ক. তাবুরে, ভ. রাউতেনবের্গ, ভ. ন. নিকলস্কি, গ. গ. প্রজোরভ প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানীরা রক্ত পরিসঞ্চালন সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় ও বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে, রক্ত সংরক্ষণ ও রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রশ্নদুটি সমগ্রভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রথম রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় ১৯১৯ সালে; করেন ভ. ন. সামভ।

১৯২৬ সালে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে মস্কোতেই দুনিয়ার প্রথম রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে 'লেনিন অর্ডার প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় হিমাটলজি ও রক্ত পরিসঞ্চালনের ইনস্টিটিউট'। আ. আ. বগোমলেৎস, স. ই. স্পাসকুকৎস্কি ও ম. প. কঞ্চালভস্কির মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা তার কাজ পরিচালনা করেন।

১৯৩০ সালে খারকভ, লেনিনগ্রাদ, মিনস্ক, কিয়েভ, ত্বিলিসি, বাকু, এরেভান ও ল্ভোভ প্রভৃতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন শহরে এই ইনস্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ রক্ত যোগান বা ব্লাড সার্ভিসের এক পাকা পোক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ব্যবস্থায় একত্র সংহত করা হয়েছে সমস্ত প্রজাতন্ত্রের রক্ত পরিসঞ্চালন ইনস্টিটিউট এবং প্রজাতান্ত্রিক, আঞ্চলিক, শহর ও জেলার সমস্ত রক্ত পরিসঞ্চালন স্টেশন ও বিভাগগুলি। সেই সব প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক কাজ করে, অন্যদিকে তেমনি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজের নির্দেশ রচনা করে, বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রক্ত যোগায় ও রক্ত পরিসঞ্চালনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করে।

প্রাণের ধারক

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ লক্ষ্য করে এসেছে যে আঘাত বা অন্য কারণে প্রচুর পরিমাণ রক্তক্ষয় হলে মানুষ মরে যায়। তাই খুবই স্বাভাবিক যে রক্ত ও প্রাণ আজ এক অর্থসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ দুটিকে এক বলে ধরে নেওয়া হয়। সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরের পক্ষে রক্তের প্রয়োজনীয়তাকে কিছুতেই আর বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়।

মানুষের শরীরের পক্ষে রক্ত এত প্রয়োজনীয় কেন? তার ভিতর কোন জিনিষটি আসলে প্রাণের ধারক?

একটি কাচের বয়ামে যদি রক্ত সংগ্রহ করে ধরে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে রক্ত দুই স্তরে ভাগ হয়ে গেছে। উপরে রক্তের স্বচ্ছ ও তরল স্তর — প্লাজমা, নীচে লাল ঘন স্তর যাতে থাকে রক্তের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও প্লেটলেট। কাজেই প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয় রক্ত ঠিক সেইরকম এক পদার্থ ঘটিত তরল পদার্থ নয়। এ জিনিষটা আরও ভাল করে বোঝা যায়

যদি এক ফোঁটা রক্তকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করা যায়। গোটা দৃষ্টি ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন আকারের প্রচুর কোষ বা কণিকা।

রক্তের কোষগুলির চরিত্র ও উপকরণ ভালভাবে পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, উপকরণগতভাবে রক্ত হল এক প্রকারের জটিল সজীব টিস্যু, এক তরল পদার্থ যার মধ্যে ভেসে বেড়ায় নির্দিষ্ট আকৃতির কোষ — শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা ও রক্তের প্লেটলেট।

রক্তের লোহিত কণিকা যাকে বলে এরিথ্রোসাইট তারা ছোট থালার মতো দেখতে। ধারগুলি তাদের মাঝখানের চেয়ে বেশী পুরু, মাত্র এক ঘন মিলিমিটার রক্তে সুস্থ মানুষে প্রায় ৫০ লক্ষের মত এরিথ্রোসাইট থাকে। এরিথ্রোসাইটে রঙের মতন এক রকম পদার্থ থাকে যাকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন (haemoglobin)। হিমোগ্লোবিনের জন্যেই রক্তের রং লাল।

শরীরের প্রত্যেকটি কোষ যাতে করে অনবরত অক্সিজেন পায় ও কোষের মধ্যে জমে ওঠা কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করত পারে জীবন ধারণের পক্ষে তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। টিস্যুর এই অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা যাতে মেটানো যায় তার জন্য দেহের মধ্যে সর্বক্ষণের জন্য দুটি প্রক্রিয়া চলছে — এক শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ও অপরটি রক্ত চলাচল। জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই দুটি মূল প্রক্রিয়ার ফলেই শরীরের মধ্যে অক্সিজেন টেনে নেওয়া ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করার কাজ চলছে।

মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজটি চালায় ফুসফুস। নিশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া অক্সিজেন প্রবেশ করে ফুসফুসের সূক্ষ্মতম অংশ এলভিওলাসে। এলভিওলাসগুলির গায়ে লেগে থাকে রক্তের শিরার সূক্ষ্মতম অংশ ক্যাপিলারি। এলভিওলাস থেকে ক্যাপিলারির পাতলা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করে রক্তে এবং ঠিক এমনি করেই আবার শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায় রক্ত থেকে।

এরিথ্রোসাইটে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার প্রধান কাজ হল অক্সিজেন টেনে নেওয়া। রাসায়নিকভাবে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে ঐ হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। অক্সিহিমোগ্লোবিন যুক্ত এরিথ্রোসাইট আর্টারির রক্তপ্রবাহে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছে তার অক্সিহিমোগ্লোবিন যায় ভেঙ্গে। তৈরী হয় আবার সেই হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেন। হিমোগ্লোবিন থেকে যায় কিন্তু অক্সিজেন গিয়ে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেহাংশ ও টিস্যুগুলির কোষের মধ্যে। রক্তের এই যে অক্সিজেন বহনের চরিত্র এটাই হল তার সবচেয়ে বড় চরিত্র ও এর জন্যই তাকে প্রাণের ধারক নামে অভিহিত করা হয়। অক্সিজেন ছাড়াও আর্টারির রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য বহন করে থাকে। অন্য দিকে ভেনের রক্ত টিস্যু থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও

দেহের মেটাবলিজমের অন্যান্য দূষিত পদার্থ বের করে নিয়ে আসে।

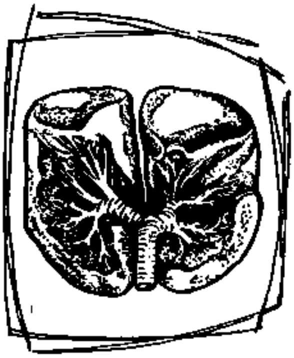

ফুসফুসের ভিতর রক্ত হাওয়া থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় এবং ত্যাগ করে দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড।

রক্তের তরল পদার্থ প্লাজমাও তেমনি দেহের পক্ষে খুবই উপকারি। তাতে থাকে প্রোটীন (এলবুমেন, গ্লবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেন), লবণ ও আরও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যা টিসু ও কোষের স্বাভাবিক জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্লাজমার সাহায্যেই টিসুতে পুষ্টি বহন ও টিসু থেকে ব্যবহৃত দ্রব্য চালানের জটিল প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়। পরে রক্ত থেকে এইসব ব্যবহৃত দূষিত পদার্থ ও আরও নানা রকমের রাসায়নিক বস্তু মূত্রাশয়, যকৃৎ, অন্ত্র ও চামড়ার সাহায্যে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

থাইরয়ড, সুপ্রারেনাল, হাইপোফাইসিস প্রভৃতি বিভিন্ন এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডের ভিতর তৈরী হওয়া রস থেকে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে। তাদের বলা হয় হরমোন। দেহের বৃদ্ধি, শরীরের মেটাবলিজম ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতার উপর হরমোনের প্রভাব খুব বেশী। রক্তের মাধ্যমে হরমোন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়, যাকে বলা হয় হিউমারাল একশন, তাকে আসলে পরিচালিত করে থাকে শরীরের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিষ্টেম।

হাওয়া ও রক্তের মধ্যে পরস্পর গ্যাস বিনিময় চলে ফুসফুস সংগঠনকারী ইউনিট অসংখ্য এলভিওলাসের ভিতর।

সবশেষে রক্তের মধ্যে নার্ভের অগ্রভাগ থেকে তৈরী এক প্রকারের বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যাদের বলে মাধ্যমিক বা মিডিয়েটর। শরীরের বিভিন্ন দূরবর্তী অঙ্গে নার্ভাস সিষ্টেমের সঙ্কেত পৌঁছে দেবার ব্যাপারে মিডিয়েটররা খুবই মূল্যবান কাজ করে থাকে।

রক্তের তরল অংশে ভাসমান রক্তের শ্বেত কণিকাগুলিও দেহের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদিও রক্তের লোহিত কণিকার তুলনায় শ্বেত কণিকার সংখ্যা খুবই কম (এক ঘন মিলিমিটারে মাত্র ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার), তাহলেও এদের কাজ যেমন ঢের বেশী বহুমুখী তেমনি জটিল।

দেহে শ্বেত কণিকার সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, তা পরিবর্তনশীল। এমনকি একই দিনের বিভিন্ন সময়ে সে সংখ্যা বদলাতে দেখা যায়। মাংসপেশীর সঞ্চালন, খাবারের পরিবর্তন, অসুখবিসুখ বা অন্যান্য কারণেও এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

রক্তের শিরার দেওয়াল ভেদ করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিসুতে প্রবেশ করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে লিউকোসাইটগুলির। এই কারণেই এদের কখন কখন ভবঘুরে কোষ নামে অভিহিত করা হয়। 'পরিভ্রমণের' সময় এরা বহন করে নিয়ে যায় শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক প্রকারের বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ।

লিউকোসাইটের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ফ্যাগোসাইটিক ক্রিয়া খুবই জোরালো। এদের এই বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন রুশ বৈজ্ঞানিক ই. ই. মেচনিকভ। তিনি দেখান যে লিউকোসাইটগুলি বিভিন্ন বীজাণু, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা বা দেহের মৃত কোষ প্রভৃতি আটকে ফেলে, তাদের হজম করে দেহকে ক্লেদ বা বহিরাগত পদার্থ থেকে মুক্ত করে। লিউকোসাইটের এই চরিত্রকেই ই. ই. মেচনিকভ ফ্যাগসাইটোসিস আখ্যা দিয়েছেন।

লিউকোসাইট শুধু যে দেহের ক্লেদ ভক্ষণ করে তাই নয়, তারা দেহের ভিতর প্রবিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী বীজাণুর বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে নিযুক্ত হয়।

প্রমাণ হয়ে গেছে যে, বীজাণুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বা কোন নির্দিষ্ট ইনফেকশনের বিরুদ্ধে ব্যাধি প্রতিরোধের ক্ষমতা (ইমিউনিটি) তৈরীর ব্যাপারে শুধু যে একমাত্র লিউকোসাইট বা ফ্যাগোসাইটই কাজ করে তাই নয়। দেহের নিজস্ব আরও অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কোন কোন রোগের বিরুদ্ধে শরীরের ইমিউনিটি তৈরী হয় শরীরের মধ্যে কতগুলি বিশেষ পদার্থ থাকার দরুন। তাদের বলা হয় এণ্টিবডি, এইসব পদার্থ শরীরে তৈরী হয় বিশেষ বিশেষ রোগে ভুগে ওঠার পর বা নির্জীব কৃত বিশেষ বিশেষ বীজাণু থেকে তৈরী ভ্যাকসিন গ্রহণ করবার পর। এমনকি বিশেষ রোগে ভুগে ওঠা মানুষের প্লাজমা ইঞ্জেকশন করেও পরদেহে ঐ রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা সম্ভব, কেননা ভুগে ওঠা মানুষের প্লাজমায় সে রোগের বিরুদ্ধে তৈরী এণ্টিবডি থাকে।

রক্তের উপাদান ও চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে হলে প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইটের কথাও বলতে হয়। রক্তের শিরার গায়ে যে কোন চোট লাগলেই কিছু থ্রম্বোসাইট ভেঙ্গে যায়। থ্রম্বোসাইট ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এমন এক পদার্থ নির্গত হয় সেখানে যা রক্তকে জমিয়ে ঢেলা তৈরী করে। এইরকম ঢেলাকে বলা হয় থ্রম্বাস। থ্রম্বাস রক্তের শিরাতে আটকে যায় ও তারই ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

রক্তের উপাদান ও চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে সব কথাই বলা হল। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষের শরীরের পক্ষে রক্তের প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ।

রক্ত সংরক্ষণের উপায়

আঙ্গুলের অগ্রভাগে যদি ছুঁচের খোঁচা লাগানো হয় তাহলে প্রথমে সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে থাকে তারপর রক্ত ঢেলা বেঁধে যায় — অর্থাৎ রক্ত জমে যায়। আরও ফয়লা ও গভীর ক্ষতেও ঠিক এই চিত্রটিই দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রক্তপাত হওয়ার পর সে রক্ত খুব তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায়, তৈরী হয় রক্তের ঢেলা। বলা বাহুল্য যে জমাট রক্ত দেহে পরিসঞ্চালন করা অসম্ভব।

* গত শতাব্দীতে রক্ত পরিসঞ্চালন কালে রক্ত যাতে জমে না যায় তার জন্য এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে রক্ত দিতে সোজাসুজি টিউব বা টিউব সিস্টেমের সাহায্যে দুই দেহের রক্তের শিরা যুক্ত করে রক্ত প্রবাহিত করা হত।

কিন্তু এই উপায়টি বেশী রকম জটিল বলে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। সহজে রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য এমন এক উপায় আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল যাতে শিরা থেকে বের করে নেওয়া রক্তের জমাট বাঁধা বন্ধ করা যায়।

ইতিমধ্যে ১৮৬৫ সালে একজন রুশ বিজ্ঞানী ভাসিলি সুতুগিন রক্ত সংরক্ষণের প্রথম প্রচেষ্টা করেন। রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ করার কোন রাসায়নিক পদার্থ না থাকায় তিনি রক্তকে তরল অবস্থায় রাখবার জন্য রক্ত থেকে ফাইব্রিনের ঢেলা বের করে নেন। একে বলা হয় ডিফিব্রিনেশন (defibrination)।

আগেই বলা হয়েছে যে আসলে সংরক্ষিত রক্ত পরিসঞ্চালন করা শুরু হয় ১৯১৪ সালের পর থেকে যখন সোডিয়াম সাইট্রেট নামে রক্তের জমাট বাঁধা রোধ করার এক বিশেষ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

রক্তের সাথে সোডিয়াম সাইট্রেট মেশালে সোডিয়াম সাইট্রেট রক্তের ক্যালসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়। ক্যালসিয়ামই হল রক্ত জমে যাওয়ার কারণ। ক্যালসিয়াম আয়নকে ধরে রাখবার জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার মিশ্রিত ৪% সাইট্রেট সলিউশন ব্যবহার করা হয়, এবং সেই সলিউশন অনায়াসে রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ করে রাখে বা যাকে বলে রক্তকে 'স্টেবল' (stable) করে।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল যে রক্তের শিরায় সোডিয়াম সাইট্রেট প্রবেশ করলে সে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে ও যে মানুষটির দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করা হল তার দেহ থেকে বুঝি রক্তপাত কিছুতেই আর বন্ধ হবে না। কিন্তু দেখা গেল যে সে ভয় অমূলক, কেননা জীবিত দেহে সোডিয়াম সাইট্রেট অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

এইভাবেই শেষ পর্যন্ত রক্ত পরিসঞ্চালনের এক অন্যতম মূল সমস্যার সমাধান হয়। দেহের বাইরে রক্ত সঞ্চয় করে সেই রক্ত অপরের দেহে পরিসঞ্চালন করার যে কল্পনা মানুষ এতদিন ধরে করে আসছিল এই আবিষ্কারের ফলে সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়।

রক্ত পরিসঞ্চালন করা যখন প্রথম শুরু হয় তখন বহু বড় বড় হাসপাতালে রক্তদাতা বা রক্তের ডোনারেরা সারাদিন ডিউটি দিত যাতে দরকার হলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে রক্ত দিতে পারে। আজ আর সেরকম ডিউটির দরকার করে না, কেননা আগে থেকে রক্ত সংগ্রহ করা ও সেই রক্ত সংরক্ষণ করে রাখার পথে যে সব সমস্যা ছিল তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গেছে। সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানই আজকাল সংরক্ষিত রক্ত ব্যবহার করে।

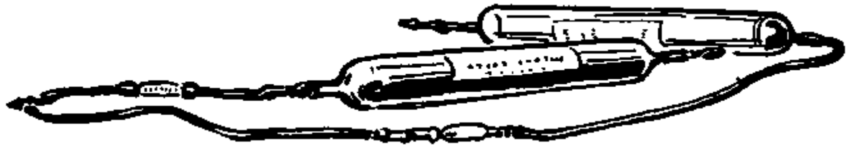

কিন্তু এই পর্যায়ে পেঁছতে রক্ত সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান আগে করে নিতে হয়েছে। ডোনার থেকে রক্ত নিয়ে সে রক্ত কাচের পাত্রে অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করলে তাতে কী কী পরিবর্তন হয়, তা নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন সময় কাল ব্যাপী ধরে রাখা রক্ত নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের কঠোর অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে হয়।

আ. আ. বগোমলেৎস, স. ইয়ে. সেভেরিন, দ. ন. বেলেঙ্কি, স. দ. বালাখভস্কি, ন. আ. ফিওদরভ, ফ. র. ভিনোগ্রাদ-ফিনকেল, প. স. ভাসিলিয়েভ, ম. প. দেপ্, আ. আ. বাগ্দাসারভ প্রমুখ বহু সোভিয়েত বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে আজ রক্ত সংরক্ষণের অনেক অতি মূল্যবান প্রশ্নের সমাধান হয়েছে। এমন কতকগুলি মিশ্র সলিউশন তাঁরা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন, যা শুধু রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ রেখেই ক্ষান্ত হয় না, সংরক্ষিত রক্ত বহুদিন ধরে সজীব রাখতেও সাহায্য করে। সংরক্ষিত রক্তের কোষগুলি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে রক্তের এরিথ্রোসাইট সংরক্ষিত অবস্থায় শুধু যে তার জীবনী শক্তি বজায় রাখে তাই নয়, রোগীর দেহে সেই রক্ত পরিসঞ্চালন করলে এরিথ্রোসাইটগুলি সেখানে তাদের কর্তব্য কাজ সম্পূর্ণভাবে পালন করে যায়।

এখনও পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি জটিল ও বহু পর্যায়ে বিভক্ত। এর মূল উদ্দেশ্য রক্ত জমে যাওয়া বন্ধ করা ও তাতে ইনফেকশন রোধ করা। সংরক্ষিত রক্তের মতো চমৎকার মিডিয়ামে পড়লে রোগের বীজাণু অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। দূষিত রক্ত ব্যবহার করলে রোগীর দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয় বলে তেমন রক্ত ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ।

তাই রক্ত সংরক্ষণের কাজটি পুরোপুরি এমনভাবে সমাধা করতে হয় যাতে রক্তের পাত্রে একটিও বীজাণু না ঢুকতে পারে। এই জন্য যে পাত্রে রক্ত ধরা হবে সে পাত্রটিকে আগে বিশেষভাবে বীজাণু মুক্ত বা স্টেরিলাইজ করে নেওয়া হয়।

যে রবার টিউব সিস্টেমের মধ্য দিয়ে ডোনারের রক্ত এম্প্যুলে এসে পড়ে তাকে সম্পূর্ণ হাওয়া মুক্ত করা হয় যাতে বাইরের বাতাস তার সংস্পর্শে না আসতে পারে। তাছাড়াও রক্ত সংগ্রহের জন্য পৃথক স্থান প্রস্তুত করা হয় যাকে বলা হয় অপারেশন বক্স। রক্ত সংগ্রহের আগে ঐ জায়গাটিকে আল্ট্রাভায়োলেট ল্যাম্পের সাহায্যে ভাল করে শোধন করে নেওয়া হয়। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি হল বীজাণু ধ্বংসকারী ও তার সাহায্যে হাওয়ার মধ্যে যে বীজাণু আছে তা মরে যায়।

• বিশেষ পোষাক পরে ডোনার অপারেশন বক্সের টেবিলে শুয়ে দেওয়ালের মধ্যেকার একটা ফুটোর মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতটিকে রাখে এক বিশেষ টেবিলের উপর। ডাক্তার তার ভেনে ছুঁচ ফুটিয়ে ডোনার থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। রক্ত রবার ও কাচের টিউবের মধ্য দিয়ে এসে, এম্প্যুলে পড়ে মিশ্রিত হয় রক্ত সংরক্ষক সলিউশনের সঙ্গে। তারপর হাওয়া যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এম্প্যুলটিকে ভাল করে সীল করা হয়। এম্প্যুলের গায়ে তখন লাগানো হয় এক টিকিট যাতে লেখা হয় ডোনারের নাম, তার রক্তের গ্রুপ, কোন তারিখে সেই রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, কতখানি রক্ত আছে সে এম্প্যুলে ও কোন ডাক্তার সে রক্ত সংগ্রহ করেছে।

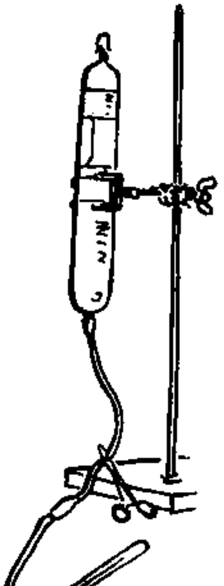

এইভাবে প্রস্তুত সংরক্ষিত রক্ত রেফ্রিজারেটারে ৩০ দিন পর্যন্ত জীবনী শক্তি বজায় রাখে। তাই এখন বিশেষ বাক্সে বন্দী করে (বাক্সগুলিকে বলা হয় আইসোথের্মিক বাক্স, তাতে তাপমাত্রা সবসময়ের জন্য ৪° সেঃ) সংরক্ষিত রক্ত দূরে দূরে দেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে ও সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সর্বদা সব গ্রুপের রক্ত জমা রেখে দরকার মত বিলম্ব না করে যে-কোন অবস্থায় রক্ত পরিসঞ্চালন করা সম্ভব হচ্ছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আজও অক্লান্তভাবে অনুসন্ধান করে চলেছেন কী উপায়ে রক্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে রক্ত সংরক্ষণের সলিউশনগুলিতে এখন (সাল্ফাথিওজল নাইট্রেট, সাল্ফাসিল নাইট্রেট, রিভানল প্রভৃতি) নানা রাসায়নিক ও এন্টিসেপ্টিক পদার্থ মেশান হয় যা বীজাণুর বংশবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এইসব নতুন প্রেসক্রিপশনের সংরক্ষণকারী সলিউশনের সাহায্যে এমনকি ৭০ দিন পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করা চলে।

নিম্ন তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণের প্রশ্নটি বিশেষ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে। আ. দ. বেলিয়াকভ ও ফ. র. ভিনোগ্রাদ-ফিনকেলের মতে নিম্ন

তাপমাত্রায় সংরক্ষিত রক্ত শুধু যে নষ্ট হয় না তাই নয়, এতে ১০০ দিনের উপর রক্তের জীবনী শক্তি বজায় থাকে।

কয়েক বছর হল সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা রক্ত সংরক্ষণের এক নতুন উপায় বের করেছেন। এতে আর রক্ত জমা প্রতিরোধ করতে পারে এমন সলিউশন ব্যবহার করতে হয় না, ব্যবহার করা হয় তথাকথিত আয়ন বিনিময়ক্ষম আলকাতরা। আলকাতরা হল এমন এক কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ যা তার পারিপার্শ্বিক মিডিয়াম থেকে কোন বস্তু শুষে নিয়ে তার পরিবর্তে অন্য বস্তু ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে। ঐ রকম আলকাতরার সংস্পর্শে এসে রক্ত তার ক্যালসিয়াম আয়ন হারিয়ে ফেলে ও সঙ্গে সঙ্গে তার জমে যাওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়। এইরকম রক্তকে বলে ক্যাথিওনাইট রক্ত। সাধারণভাবে সংরক্ষিত রক্তের তুলনায় একে ভাল মনে করা হয় এই জন্য যে এতে সোডিয়াম সাইট্রেট থাকে না। সোডিয়াম সাইট্রেট কিছু বেশী মাত্রায় পড়লে রক্তের কিছু কিছু ক্ষতি হয়। ক্যাথিওনাইট রক্তে, শুধু যে রক্তের লোহিত কণিকা (এরিথ্রোসাইট) তার জীবনী শক্তি বজায় রাখে তাই নয়, লিউকোসাইট ও থ্রম্বোসাইটও (প্লেটলেট) তেমনী তাদের জীবনী শক্তি বজায় রাখে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ক্যাথিওনাইট রক্তের রোগ সারানর শক্তি বিশেষ করে রক্তপাত বন্ধ করার শক্তি সাধারণভাবে সংরক্ষিত রক্তের চেয়ে অনেক বেশী।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে সংরক্ষিত রক্তের সংগ্রহ পদ্ধতিকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বিশেষ কারখানায় এম্পুল ও বোতলগুলির উপর বিশেষ মেকানিকাল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। তারপর সেগুলিতে সংরক্ষক বস্তু ভরে এম্পুল বা বোতলের মুখ বাতাস না ঢুকতে পারে এইভাবে টাইট করে রবারের ছিপি দিয়ে আটকে তাকে স্টেরিলাইজ করা হয়। সেই বোতল ও এম্পুলগুলিকে তখন পাঠানো হয় রক্ত পরিসঞ্চালন স্টেশনে। এবং সেইখানে সমাধিত হয় রক্ত সংরক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়, — তৈরী এম্পুল ও বোতলে ভরা হয় ডোনারের রক্ত।

দুই পর্যায়ে রক্ত প্রস্তুতিতে ডোনার থেকে রক্ত নেওয়া হয় বিশেষ বক্সে। ডোনারের রক্তের শিরার সাথে এম্পুল যুক্ত করার জন্য এমন রবার টিউব ব্যবহার করা হয় যার দুই দিকে দুই ছুঁচ। এক ছুঁচ রবারের ছিপির মধ্য দিয়ে গিয়ে এম্পুলে প্রবেশ করে অপরটি ফোটান হয় ডোনারের ভেনে। আস্তে আস্তে সংরক্ষক সলিউশন যুক্ত পাত্রটি রক্তে ভরে ওঠে।

উপরে যে বিবরণ দেওয়া হল সেই উপায় ব্যবহার করলে সংরক্ষিত রক্ত প্রস্তুতকারী স্টেশনের পরিশ্রম অনেক লাঘব হয়। রক্তের জন্য পাত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষক সলিউশন তৈরীর কাজটি এখন করা হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। এর ফলে গুণগত দিক থেকে যেমন উন্নততর উপায়ে রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে বহুদূর মফস্বলের সামান্যতম চিকিৎসা কেন্দ্রেও ডোনারের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে সংরক্ষিত রক্ত প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

ডোনার হওয়া মহা সম্মানী কাজ

ডোন্যরদের সংগঠন তৈরী না করলে চিকিৎসায় রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যাপক প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব নয়। ডোনার সংগঠন, মানে হল এমন সব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লোক সংগ্রহ করা যারা পরিসঞ্চালনের জন্য নিজেদের রক্তের সামান্য কিছু অংশ রোগী ও আহতদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ডোনার সংগঠন প্রস্তুত করার দিকে খুবই নজর দেওয়া হয়। অন্য লোকের জীবন রক্ষার জন্য নিজ দেহের রক্ত দেওয়ার মত মহৎ কাজ আর কী হতে পারে! আমাদের দেশে ডোনার হওয়া উচ্চ দেশপ্রেমিকতা ও মানবতার পরিচায়ক। এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ডোনারদের বিশেষ সম্মান করা হয় ও তাদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের সরকারি ডিক্রী অনুযায়ী ডোনার কাজের সময়েতেও রক্ত দিতে যেতে পারে। যে সময়ের জন্য সে কাজে অনুপস্থিত থাকবে সে সময়ের মাইনে সে পায় তার গড়পড়তা মাইনের হার অনুযায়ী। স্যানাটোরিয়াম ও বিশ্রাম কেন্দ্রের টিকিট বিলির সময় ডোনারদের কথাই সর্বাগ্রে বিচার করা হয়।

১৯৪৪ সালের ২৪শে জুনের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্ত ডোনার অনেকবার রক্ত দিয়েছে তাদের 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানিত ডোনার' মেডেলে ভূষিত করা হয়। হাজার হাজার ডোনার ইতিমধ্যেই এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বছরগুলিতে ডোনার হওয়ার সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের আহ্বানে ডোনারের দলে যোগ দেয় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারি, যৌথখামারের কৃষক, ছাত্র ও গৃহকর্ত্রীর দল। স্বদেশ রক্ষায় নিযুক্ত যোদ্ধাদের জীবন রক্ষায় সোভিয়েতের দেশ ভক্তেরা তখন হাজার হাজার লিটার রক্ত দিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ডোনার সংগঠন করার মূল নীতি হল যে, যে রক্ত দেবে, তার নিজের যেন এতে কোন ক্ষতি না হয়। বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে ডোনার ভুক্ত করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন স্বাস্থ্যরক্ষা দপ্তরের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী সেই সমস্ত মেয়ে ও পুরুষই ডোনার হতে পারে যাদের বয়স ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে, শরীর সুগঠিত ও যারা সম্পূর্ণ সুস্থ। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ডোনার ভুক্ত হতে, মেয়ে হলে — রক্তে অন্তত ৬৩% হিমোগ্লোবিন ও এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তে অন্তত ৪ মিলিয়ন লোহিত কণিকা থাকা চাই এবং পুরুষ হলে, অন্তত ৬৮% হিমোগ্লোবিন ও এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তের মধ্যে ৪ মিলিয়ন ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোহিত কণিকা থাকা চাই, তার নীচে হলে চলবে না।

যাদের টিউবারকুলোসিস, ব্রুসেলোসিস বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে বা যারা মেটাবলিক ও এন্ডোক্রিন রোগে ভোগে তাদের ডোনার ভুক্ত করা হয় না। সন্তান সম্ভাবনা, ঋতু অবস্থা বা কোলে দুগ্ধ পোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় মেয়েদের ডোনার ভুক্ত করা নিষিদ্ধ।

সমস্ত ডোনারকেই খুব ভালভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দলভুক্ত করা হয় এবং তাদের সকলকেই নানা রকম লেবরেটারি পরীক্ষা ও বুকের এক্সরে পরীক্ষা করে তারপর ডোনার ভুক্ত করা হয়।

এই রকম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হল ডোনারের কেমন স্বাস্থ্য তা জানা এবং বিশেষ করে নির্ধারণ করা যে, তার এমন কোন অসুখ আছে কিনা যা সে নিজে জানে না, অথচ তার রক্তের মধ্য দিয়ে রোগীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল রক্ত দিলে ডোনারের নিজের স্বাস্থ্য কী রকম থাকবে, কোন রকম ক্ষতি হবে কিনা তার এতে, এইসব দেখা।

একবারে ডোনার ২২৫ থেকে ৪৫০ সিঃ সিঃ রক্ত দিতে পারে। কিন্তু প্রথমবার হলে ২২৫ সিঃ সিঃর বেশী রক্ত দেওয়ার নিয়ম নেই। একবার রক্ত দেওয়ার পর তার ৬ সপ্তাহের মধ্যে আর দ্বিতীয় বার রক্ত দেওয়া চলে না। তাও আবার পরের বার রক্ত দিতে হলে সে সময়ের মধ্যে তার রক্ত পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে কিনা তার যাচাই হওয়া চাই।

রক্ত দেওয়ার আগে ডোনারকে হালকা প্রাতরাশ দেওয়া হয়। তারপর রক্ত দেওয়া হলে পর তাকে তিন পদ দিয়ে পেট ভরে খেতে দেওয়া হয়।

বহু পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে উপরি উক্ত নিয়মগুলি মেনে চললে রক্ত দেওয়ার পর ডোনারের একটুও ক্ষতি হয় না।

রক্ত ক্ষয়ের পর দেহের রক্ত প্রস্তুতকারী অঙ্গগুলির কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। তাই ১৫—২০ দিনের মধ্যেই রক্তের অবস্থা, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন ও এরিথ্রোসাইটের সংখ্যা পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। খুব তাড়াতাড়ি রক্তের পূর্বাবস্থা ফিরে আসা ও ডোনারের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা নির্ভর করে ভালো খাওয়া দাওয়া, শ্রম ও বিশ্রামের নিয়ম পালন করা এবং শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করার উপর।

রক্ত পরিসঞ্চালনের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট ও আরও অন্যান্য ইনস্টিটিউট ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এমন অনেক ডোনার আছে, যারা নিয়মিতভাবে ১০—১৫ বছর ধরে বা তারও বেশী সমানে রক্ত দিয়ে চলেছে। তাদের সকলেরই রক্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে ও তারা নিজেরা সকলেই সুস্থ ও কার্যক্ষম।

রোগীদের মধ্যে রক্ত পরিসঞ্চালনের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। প্রতিটি রোগী যার চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন সে যাতে এই অমূল্য চিকিৎসার উপকরণটি পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজন যতদূর সম্ভব ডোনারের সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া।

সকলেরই মনে রাখা দরকার যে, যে-কোন সুস্থ মানুষ কোন রকম ক্ষতি সহ্য না করে নিজ রক্তের সামান্য কিছু অংশ বিলিয়ে দিয়ে রোগীদের সাহায্য করতে পারে ও এমনি করে মরে যাচ্ছে এমন রুগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে।

কেন রক্ত পরিসঞ্চালন এত কার্যকরী

রক্ত পরিসঞ্চালন আজ পর্যন্ত বহু লোককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাই এ প্রশ্ন না করে পারা যায় না, সে রক্ত কী উপায়ে চিকিৎসায় সাহায্য করে থাকে। প্রথমে যাকে বলে রক্তের সেই পরিপূরক (compensatory) ক্ষমতার কথাই বলা উচিত। একে ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে যে, যার দেহে রক্ত দেওয়া হল তার রক্তের শিরার মধ্যে পরিসঞ্চালিত রক্ত নিজের জীবনী শক্তি অটুট রেখে রক্তের করণীয় সমস্ত কর্তব্যগুলি পালন করে থাকে।

পরিসঞ্চালিত রক্তের পরিপূরক ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় ভীষণভাবে কেটে যাওয়া ও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত রোগীর ক্ষেত্রে, মানুষ যখন খুব বেশী রকম রক্ত হারায়।

পরিসঞ্চালিত রক্ত রক্তপাতের ফলে খালি হয়ে যাওয়া রক্তের শিরাগুলিকে আবার পূর্ণ করে তুলে স্থায়ীভাবে রক্তের চাপবৃদ্ধি করে। এতে করে রক্ত চলাচল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, মস্তিষ্ক ও জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অঙ্গে শুরু হয় রক্ত প্রবাহ।

আঘাত জনিত বেশী রকম রক্ত ক্ষয়ে, প্রসব বা প্রসব জনিত রক্তাল্পতায় এবং পাকস্থলী বা ক্ষুদ্র অন্ত্রের ঘা, অর্শ ও একটপিক জেস্টেশন (ectopic gestation) প্রভৃতি রোগে পরিপূরণের উদ্দেশ্য নিয়েই রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়।

কিন্তু পরিসঞ্চালিত রক্তের এই পরিপূরক ক্ষমতাটিকে হারান রক্তের শুধুই পরিপূরণ, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে ভুল হবে।

এবিষয়ে প্রফেসর আ. ভ. গুলিয়ায়েভের এক্সপেরিমেণ্টটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন যে ভীষণ রক্তপাতে শুধু যে রক্ত পরিসঞ্চালনের ফলেই রক্ত চলাচলের পরিমাণ বেড়ে যায় তাই নয়, তথাকথিত সংরক্ষিত 'ডিপো' থেকেও কিছু রক্ত এসে যোগ দেয় রক্ত প্রবাহে। ব্যাপার হল এই যে, শরীরের সমস্ত রক্তই একসঙ্গে শরীরের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয় না, কিছু অংশ জমা থাকে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও টিসুর মধ্যে, যাদের বলা হয় 'ডিপো' (যেমন যকৃৎ, পিলে, মাংসপেশী ইত্যাদি)। 'ডিপোতে' থাকা অবস্থায় এই রক্ত সাময়িকভাবে রক্ত চলাচল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে রক্ত পরিসঞ্চালন ছাড়া আজকাল কোন জটিল অপারেশন করা হয় না। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি জীবন ধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দেহাঙ্গের উপর জটিল অপারেশন করে অস্ত্রচিকিৎসা বর্তমানে যে উন্নতি সাধন করেছে তার একমাত্র কারণ

এই নয় যে আজকাল অস্ত্রচিকিৎসার টেকনিকে অনেক উন্নতি হয়েছে; ব্যাপক রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োগও এর অন্যতম কারণ।

বড় বড় অপারেশনে আজকাল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়। এতে শুধু যে অপারেশন কালে হারান রক্ত পরিপূরণ করা হয় তাই নয়, অপারেশনের পরবর্তীকালীন জটিলতাও এর দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

আজ কয়েক বছর হল বিখ্যাত সোভিয়েত অস্ত্রচিকিৎসক আ. ন. বাকুলেভ, আ. আ. ভিশ্নেভস্কি, ব. ভ. পেত্রভস্কি, প. আ. কুপ্রিয়ানভ, আ. ভ. গুলিয়ায়েভ, ইয়ে. ন. মেশালকিন প্রভৃতি হৃৎপিণ্ড ও হৃৎপিণ্ডের সাথে যুক্ত বড় বড় রক্তের শিরার উপর অপারেশন করার জটিল প্রশ্নটি সাফল্যের সাথে সমাধান করেছেন। অস্ত্রচিকিৎসকদের সামনে মূলনীতিগত প্রশ্ন দাঁড়াল, হৃৎপিণ্ড কেটে তার গহ্বরে অপারেশন চালানো সম্ভব কিনা।

আগে সবসময়ই এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর মিলত। চিন্তা করাই কঠিন ছিল যে, হৃৎপিণ্ডের কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে তাকে রক্ত চলাচলের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব; অথচ হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন করতে হলে সাময়িকভাবে তার কাজ বন্ধ করতেই হবে। 'শুকনো হৃৎপিণ্ডের' উপর অপারেশন, অর্থাৎ এমন হৃৎপিণ্ড যা থেকে সমস্ত রক্ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে ও নতুন করে রক্ত পেঁছাচ্ছে না, একথা যে আগে কল্পনাই করা যেত না।

কিন্তু এইসব সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা আজ হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন চালাতে সমর্থ হয়েছেন। এর মূলে অবশ্য রক্ত পরিসঞ্চালনের অবদান অসীম, কিন্তু তা হলেও অস্ত্রচিকিৎসকদের তরফে এ এক অদ্ভুত পরিকল্পনা শক্তি ও অসম সাহসের পরিচায়ক।

অপারেশনের সময় রক্ত চলাচলের বৃত্ত থেকে হৃৎপিণ্ডকে বাদ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচল নির্বাহ করার কাজটি সাময়িকভাবে চালান হয় এক ধরনের পাম্পের মতো এক জটিল যন্ত্রের সাহায্যে। এর ফলে হৃৎপিণ্ড তার সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বন্ধ করলেও দেহের সমস্ত অঙ্গেই রক্ত পেঁছায়।

অনেক ক্ষেত্রে রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহার করা হয় সেই উদ্দেশ্যে যাতে সম্পূর্ণরূপে বা বহুলাংশে রোগীর রক্ত ডোনারের রক্ত দ্বারা অপসারিত হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানী গ্লজমান ও কাসাৎকিনা ডাক্তারদের বহুকালের স্বপ্ন, তথাকথিত অপসারণমূলক রক্ত পরিসঞ্চালনের বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি নির্ধারণ করতে সমর্থ হন। মানুষ যার শরীরে বিষ ঢুকে রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে তার পক্ষে অনুরূপ রক্ত পরিসঞ্চালন যে কত মূল্যবান তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

ধাত্রী চিকিৎসায় নবজাতকের কামলা বা তথাকথিত হিমলিটিক জণ্ডিস (hemolytic jaundice) রোগে আজকাল অপসারণমূলক রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দুরূহ

রোগের কারণ হল মা ও ভ্রূণের রক্তের পরস্পর অমিল, যাকে বলা হয় (রিসাস — ইনকম্প্যাটিবিলিটি বা রিসাস ফ্যাক্টরের অমিল)। এর ফলে ভ্রূণ রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যায় এবং তার জন্য অনেক মায়ের বারে বারে গর্ভপাত হয় বা মাতা মৃত সন্তান প্রসব করে, আবার কখন কখন এমন সন্তান জন্মে, জন্ম থেকেই যার সমস্ত শরীর ফুলে গেছে বা জন্ডিস হয়েছে। এই রকম নবজাত শিশুর প্রায়ই মৃত্যু হয়।

লেনিনগ্রাদের রক্ত পরিসঞ্চালন ইনস্টিটিউটে মা ও ভ্রূণের এই রকম রক্ত অমিলের প্রশ্নটির সফল সমাধান হতে চলেছে। যে সব গর্ভবতী মায়ের একবার রিসাস অমিল ধরা পড়েছে তাদের উপর বিশেষ নজর রাখা হয় এবং তারা যদি কখনও সেই রিসাস অমিল জনিত রুগ্ন সন্তান প্রসব করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই নবজাতকের দেহে অপসারণমূলক রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ নবজাতকের প্রায় নিজস্ব সমস্ত রক্ত দূর করে তার স্থান সম গ্রুপের কোন ডোনারের রক্ত দ্বারা পূরণ করা হয়। এই উপায়টি অবলম্বন করে একজন দুজন নয়, বহু নবজাতকের প্রাণ রক্ষা করা গেছে। বহু স্ত্রীলোক যাদের বারে বারে গর্ভপাত হত বা যারা বারে বারে মৃত সন্তান প্রসব করত এই উপায়টি অবলম্বনের পর তারাও ভাগ্যবতী মা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

পরিসঞ্চালিত রক্তের কাজ শুধু শূন্যস্থান পূরণের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিসঞ্চালিত রক্ত রক্তপাত বন্ধ করতে পারে, এবং শরীরকে বিষ মুক্ত করার কাজও তার আছে। তাই রক্তের এই গুণগুলিকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকেরা রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবহার করে থাকে অতি মাত্রার রক্তপাতপ্রবণতা রোগে বা সেই সমস্ত রোগে যাতে রোগের বিষ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়।

৫০—১০০ সিঃ সিঃর মতন কম মাত্রায় রক্ত পরিসঞ্চালন পাকস্থলীর ঘা বা ডুয়োডেনাল আলসারের (duodenal ulcer) রক্তপাত ও ফুসফুসের নানান রোগের রক্ত বমন বন্ধ করে। শরীরে বিষ ক্রিয়া হলে বেশী পরিমাণ রক্ত পরিসঞ্চালন তা সারাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। রক্তের লোহিত কণিকাগুলি বিষ টেনে নেয় এবং তারই ফলে বন্ধ হয় শরীরের উপর বিষক্রিয়া।

যাকে ইমিউন ট্রান্সফিউশন বলা হয়, তা আজকাল চিকিৎসা ক্ষেত্রে খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। ইমিউন ট্রান্সফিউশন মানে হল সেই রকম রক্ত পরিসঞ্চালন করা যে রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এমন মানুষ থেকে যাকে সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐ অসুখের মৃত ব্যাক্টেরিয়ার টিকা দেওয়া হয়েছিল। এই রকম রক্ত, যাকে ইমিউন রক্ত বলা হয় তা বহু সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ রক্ত রোগীর রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়িয়ে তোলে এবং আমাশয়, আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি রোগে চমৎকার ওষুধের কাজ করে।

পুড়ে যাওয়ায় ইমিউন সিরাম ব্যবহার করা এক চমৎকার আধুনিক চিকিৎসা। এটাও, সেই ইমিউন ট্রান্সফিউশনের মতই জিনিষ যা সম্বন্ধে উপরে বলা হয়েছে।

হিমাটলজি ও রক্ত পরিসঞ্চালনের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে ন. আ. ফিওদরভ ও স. ভ. স্কুরকোভিচ গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে পুড়ে যাওয়ায় পশুর দেহে এমন বিষ তৈরী হয় যা সেই পশুটির উপর ভীষণ বিষক্রিয়া করে বা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের দেহেও পুড়ে যাওয়ায় ঐ একই রকম প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়।

প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়ার পর যে সব পশু বেঁচে যায় তাদের রক্তে এক রকমের বিশেষ বিষপ্রতিষেধক পদার্থ তৈরী হয়। সেই রক্ত বা সেই সিরাম যদি ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়া অন্য পশুর দেহে পরিসঞ্চালন করা যায় তাহলে পর দেখা যায় সে চিকিৎসায় চমৎকার ফল হচ্ছে।

আশা করা যায় যে, এই গবেষণার ফলস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে এমন ইমিউন সিরাম তৈরী হবে যার সাহায্যে পুড়ে যাওয়ার মত মানুষের অন্যতম যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনার সফল চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

রক্ত পরিসঞ্চালন আজ বিশেষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার কারণ এই যে, রক্ত পরিসঞ্চালনের একটা বড় গুণ হল শরীরকে শক্ত ও সজীব করে তোলা। প্রধানত এই কারণেই মেটাবলিক অসুখ, শীর্ণতা, ক্রনিক রক্তাল্পতা, শিশুরোগ, বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ রোগ, মানসিক ব্যাধি ও আরও অন্যান্য নানান রোগের চিকিৎসায় রক্ত পরিসঞ্চালন আজ উচ্চ স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে সদ্য সংগ্রহ করা রক্ত পরিসঞ্চালনের চেয়ে কিছুদিনের সংরক্ষিত রক্ত পরিসঞ্চালনের শক্তিদায়ক ক্ষমতা বেশী। একে ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, সংরক্ষিত রক্তে একরকমের বিশেষ সক্রিয় উপাদান জন্মায় যাকে টিসু থেরাপিতে কাজে লাগানো হয় (এটা আবিষ্কার করেন আকাদেমিশিয়ন ভ. প. ফিলাতভ)। পাকস্থলীর ঘা এবং আরও কয়েকটি রোগে এইরকম সংরক্ষিত রক্ত প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

জয়ের আর এক পর্ব

রক্ত পরিসঞ্চালনের উন্নতি সাধন করতে করতে প্রশ্ন দাঁড়াল রক্তের ভিতরকার বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা।

রক্তাল্পতায় মানুষের রক্তের লোহিত কণিকা খুব কমে যায়। এ ক্ষেত্রে রক্তের সমস্ত উপাদান না দিয়ে শুধু রক্তের লোহিত কণিকা পূরণ করেই চিকিৎসা করা উচিত। ঠিক তেমনি, রক্তে শ্বেত কণিকা কমে গেলে পর শুধু শ্বেত কণিকা বা লিউকোসাইট পরিসঞ্চালন করাই উচিত। রক্তের প্রোটীন কমে যাওয়ায় দুর্বলতার ক্ষেত্রে শুধু প্লাজমা

(রক্তের তরল অংশ) দিয়েই চিকিৎসা করা উচিত যে প্লাজমায় দ্রব অবস্থায় থাকে রক্তের প্রোটীন।

রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতির ফলে আজ রক্তকে তার পৃথক পৃথক উপাদানে ভাগ করে ব্যবহার করার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সেই উপাদানগুলি হল রক্তের তরল পদার্থ — প্লাজমা, — সিরাম, রক্তের কণিকাময় পদার্থ — এরিথ্রোসাইট, লিউকোসাইট ও থ্রম্বোসাইটিক ম্যাস।

রক্তের পৃথক পৃথক উপাদান ব্যবহার করে নানা রকমের শক্ত অসুখে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে।

কী করে তৈরী করা হয় রক্তের এই পৃথক পৃথক উপাদান ?

প্লাজমা ও সিরাম

ডোনারের কাছ থেকে নেওয়া রক্ত দুই এক দিন দাঁড় করিয়ে রাখলে তাতে করে সেই রক্ত দুটি ভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যায় — একটি তরল স্তর (প্লাজমা), অপরটি জমাট স্তর (এরিথ্রোসাইটিক ম্যাস)। বিশেষ অপারেশন থিয়েটারে সেই দাঁড় করিয়ে রাখা রক্তের এম্পুলে লম্বা ছুঁচ ঢুকিয়ে তার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে রক্তের উপরকার তরল পদার্থ শুষে নিয়ে প্লাজমা তৈরী করা হয়। তারপর সেই প্লাজমাকে বিশেষ এম্পুল বা বোতলে ঢালা হয়।

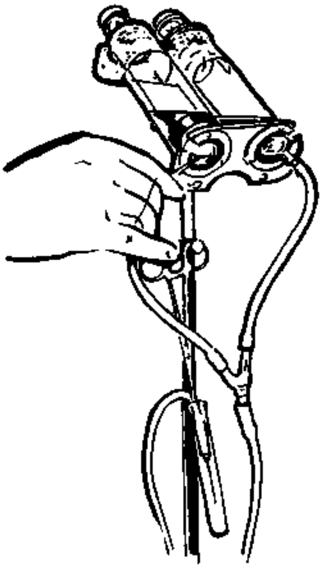

এইভাবে প্রস্তুত প্লাজমা খুবই উপকারী চিকিৎসার উপকরণ। শরীরে প্রোটীন যোগান, পুষ্টি যোগান, রক্তপাত বন্ধ করা বা নানান রোগের চিকিৎসার জন্যও প্লাজমা ব্যবহার করা হয়। প্লাজমা ও সিরামের উপকারিতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানীরা তাতে হিমোগ্লোবিন (হিমোগ্লোবিনাইজ্‌ড প্লাজমা), ভিটামিন (ভিটামিনাইজ্‌ড প্লাজমা) ও লবণ (ক্লোরাইড প্লাজমা) যুক্ত করার উপায় বের করেছেন।

শুষ্ক প্লাজমা চিকিৎসার পক্ষে খুবই মূল্যবান। তা প্রস্তুত করা হয় বিশেষ পাত্রে রক্তের তরল অংশ প্লাজমাকে শুকিয়ে।

এইভাবে শুকোনোর ফলে প্লাজমা হালকা হলদে রঙের গুঁড়োয় পর্যবসিত হয়। পরিসঞ্চালনের ঠিক আগে এই গুঁড়ো প্লাজমাকে ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে নেওয়া হয়।

হাওয়া ঢুকতে না পারে এইভাবে বন্ধ করা বোতলে ও এম্পুলে শুকনো প্লাজমাকে বহুদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায় ও দূর দূরান্তে পাঠান যায়। প্লাজমা খুব উপকারী বলেই মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় শুকনো প্লাজমা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

যেমন গেরিলা যুদ্ধ তেমনি সাবমেরিন জাহাজ বাহিনীতে রক্ত নেওয়া ও তাকে সংরক্ষণ করা দূরে থাকুক, অন্য জায়গা থেকে রক্ত পাঠানও অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে শুকনো প্লাজমা ব্যবহার করা হয়।

শুকনো প্লাজমার এক বড় সুবিধে এই যে, প্রয়োজনমত একে বিভিন্ন পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। যে সব কেসে রোগীর পক্ষে ঘন প্রোটীন সলিউশনের প্রয়োজন (যেমন প্রশস্ত ঘা জনিত দৌর্বল্য, অনশন জনিত স্বাস্থ্য ক্ষয় প্রভৃতি) সে ক্ষেত্রে পরিসঞ্চালনের জন্য প্লাজমা তৈরী করা হয় শুকনো প্লাজমার বোতল বা এম্পুলে সামান্য পরিমাণ ডিস্টিলড করা জল মিশিয়ে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য রোগীর দেহে প্রোটীন দেওয়া দরকার সে সব ক্ষেত্রে শুকনো প্লাজমার সাথে প্রচুর জল মেশান হয়।

লিউকোসাইটিক ম্যাস

শিল্পে ও টেকনিকে এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আণবিক শক্তি ও রেডিওএকটিভ পদার্থ ব্যবহারের ফলে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সামনে নতুন এক গুরু দায়িত্ব উপস্থিত হয়েছে।

আণবিক শক্তি ও সেই শক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার আজ মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে। কিন্তু আণবিক যন্ত্রের রেডিওএকটিভ রশ্মি বিকিরণের সামনে যথা যোগ্য সাবধানতা অবলম্বন না করলে, সেই রশ্মি ক্রিয়ার ফলে মানুষের দেহে এক ভীষণ রোগ সৃষ্টি হয় যার নাম রশ্মি-রোগ। এই রোগের এক প্রধান উপসর্গ হল এই যে, এতে দেহের রক্ত সৃষ্টিকারী অঙ্গগুলির কাজ করার ক্ষমতা কমে আসে। বিশেষ করে ব্যাহত হয় হাড়ের মজ্জা থেকে রক্তের শ্বেত কণিকা তৈরী হওয়া। তাই এই অসুখে খুব তাড়াতাড়ি কমে যায় রক্তের শ্বেত কণিকার পরিমাণ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হয় ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে শরীরের লড়াই করার ক্ষমতা। রশ্মি-রোগে তাই অনেক সময় কঠিন ইনফেকশন হতে দেখা যায়, বিশেষত সারা দেহ জুড়ে ইনফেকশন বা সেপসিস। স্বভাবতই এই অবস্থায় রক্তের শ্বেত কণিকার অভাব পূরণ করা রোগীর চিকিৎসার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

রক্ত থেকে লিউকোসাইট ও থ্রম্বোসাইটিক ম্যাস বের করে নেওয়ার এক অভিনব উপায় আমরা আবিষ্কার করেছি। স্বাভাবিক ডোজের লিউকোসাইটিক ম্যাস সংগ্রহ করতে হলে লাগে ৪৫০ সিঃ সিঃ রক্ত। এতে থাকে প্রায় দুই শত কোটি সুস্থ ও পূর্ণ জীবনী শক্তি সম্পন্ন

লিউকোসাইট। লিউকোসাইটিক ম্যাস পরিসঞ্চালন করাই রশ্মি-রোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা, কেননা এতে শরীরের কমে যাওয়া লিউকোসাইটের সংখ্যাই শুধু যে বৃদ্ধি পায় তা নয়, শ্বেত কণিকা সৃষ্টিকারী দেহাঙ্গগুলির কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

এমনি করেই শক্ত অসুখে লিউকোসাইটিক ম্যাস মানুষকে তার জীবন, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

এরিথ্রোসাইটিক ম্যাস

• অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় করান রক্তের উপরকার তরল পদার্থ শুষে নেওয়ার পর রক্তের বোতলে বা এম্পুলে যে তলানি পড়ে থাকে তাতে প্রধানত পাওয়া যায় রক্তের লোহিত কণিকা। কণিকাময় এই তলানির নামই হল এরিথ্রোসাইটিক ম্যাস।

এরিথ্রোসাইটিক ম্যাস — রক্তের খুবই মূল্যবান অংশ। একিউট ও ক্রনিক রক্তাল্পতা এবং আরও অন্যান্য এমন সব রোগে তা ব্যবহার করা হয় যেখানে রক্তের সেই পরিপূরকের গুণটি কাজে লাগান একান্ত প্রয়োজন।

এরিথ্রোসাইটিক ম্যাসকে যাতে বেশী দিন ধরে সংরক্ষিত করা যায় তার জন্য প্লাজমার পরিবর্তে তার সাথে মেশান হয় একরকমের সংরক্ষক সলিউশন।

ইদানীং বিজ্ঞানীরা রক্ত থেকে তার তৃতীয় কণিকাময় উপাদান — প্লেটলেট বা থ্রম্বোসাইট পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। দেখা গেছে যে থ্রম্বোসাইটিক ম্যাস রক্তপাত বন্ধের খুবই শক্তিশালী ওষুধ, বিশেষ করে সেই সব রক্তপাতে যেখানে রক্তপাতের কারণ শরীরে প্লেটলেটের অভাব। এইভাবে রক্তের সমস্ত উপাদান বা কম্পোনেন্টকেই আজ চিকিৎসায় কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে।

রক্ত থেকে তৈরী ওষুধ

রক্তের তরল পদার্থ থেকে দুটি মূল্যবান ওষুধ তৈরী হয় — হাম জ্বর বিরোধী সিরাম ও গামাগ্লোবিউলিন। গামাগ্লোবিউলিন হল রক্তের এক রকমের প্রোটীন যা দেহকে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়তে খুবই সাহায্য করে। এণ্টিমিজল্‌স সিরামের মতই গামাগ্লোবিউলিনও হাম রোগ প্রতিরোধে ও হাম রোগের চিকিৎসায় খুবই ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধগুলি ব্যবহার করে হাম রোগ জনিত শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। রক্তের রক্তপাত বন্ধ করার গুণ আছে দেখে বিজ্ঞানীরা রক্তপাত বন্ধ করতে পারে রক্তের সেই উপাদানটি বের করার জন্য খুবই সচেষ্ট হয়েছেন। লেনিনগ্রাদের রক্ত পরিসঞ্চালনের ইনস্টিটিউট 'থ্রম্বিন স্পঞ্জ' নামে রক্ত থেকে তৈরী এক রকমের জিনিষ বের করেছে, অপারেশনের সময় তারই একটুকরো স্পঞ্জ যদি রক্ত পড়ছে এমন জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে খুবই তাড়াতাড়ি রক্তপাত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। দরকার হলে এই রকমের স্পঞ্জ ক্ষতের মধ্যে রেখে

দেওয়াও চলে। রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঐ স্পঞ্জ ধীরে ধীরে শরীরে শুষে যায় এবং এতে শরীরের কোনই ক্ষতি হয় না।

হিমাটলজি ও রক্ত পরিসঞ্চালনের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে মানুষের রক্ত থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আর এক মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া গেছে যার নাম থ্রম্বিন। থ্রম্বিন হল শুকনো পাউডার। রক্ত বন্ধ করার প্রয়োজন হলে অস্ত্রচিকিৎসক এই পাউডারকে গুলে সেই সলিউশনে ভেজানো তুলো বা গজ রক্তপাতরত ক্ষতের উপর চেপে ধরে। এইভাবে কিছুতেই থামছে না এমন রক্তপাতও বন্ধ করা যায়। দাঁত তোলার পর দাঁত থেকে অনবরত রক্ত পড়া, নাক থেকে রক্ত পড়া প্রভৃতি সবেতেই থ্রম্বিন ব্যবহার করে রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

মানুষ, গরু ও ষাঁড়ের রক্ত থেকে এমন এক রকম ফাইব্রিনের পাতলা ফিতে তৈরী করা গেছে অপারেশনের পক্ষে যা অতি মূল্যবান। ফাইব্রিনের ফিতেগুলি নানান মাপের লম্বা ফিতের মতো, দেখতে যেন অবিকল রিলে জড়ানো ব্যাণ্ডেজ। একে রাখা হয় ঝালাই করে বন্ধ করা কাচের টিউবে বা কৌটোর মধ্যে।

পুড়ে যাওয়ার চিকিৎসায় ফাইব্রিনের ফিতে চমৎকার কাজ করে। পুড়ে যাওয়া বা ক্ষত স্থানটি ফাইব্রিনের ফিতে দিয়ে ঢেকে তার উপর ব্যাণ্ডেজ জড়ানো হয়। এই বায়োলজিক্যাল ব্যাণ্ডেজের ফলে ক্ষত খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

মস্তিষ্কের উপর অস্ত্রচিকিৎসায় ফাইব্রিনের ফিতে খুব ব্যবহার করা হয়। নিউরোসার্জেন প্রফেসর ব. গ. ইয়েগোরভ দেখিয়েছেন যে, এই ফিতে ব্যবহার করার ফলে মস্তিষ্কের ক্ষত খুব ভালভাবে সেরে ওঠে ও তাতে কোন স্কার টিস্যু জন্মায় না। মস্তিষ্কের ক্ষতে স্কার টিস্যু জন্মালে তাতে করে নানা রকম স্নায়বিক উপসর্গ দেখা দেয়।

রক্ত থেকে তৈরী করা এই রকমই আরও অনেক ওষুধ আছে।

বর্তমান সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা রক্ত থেকে আরও কার্যকরী ওষুধ বের করবার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। হিমাটলজি ও রক্ত পরিসঞ্চালনের কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট ও তার শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় এমন সব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কার্য তালিকা গ্রহণ করা হয়েছে যার সাহায্যে রক্তকে আরও দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত করা যাবে এবং রক্ত বা রক্তের বিভিন্ন উপাদানকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শক্ত অসুখের নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। রক্ত পরিসঞ্চালনের সমস্যা অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমন সলিউশন খুঁজে বের করারও ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে।

রক্ত সংরক্ষণ ও রক্ত পরিসঞ্চালনের যে সব সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি তা সমাধান করে এবং রক্ত ও রক্তের অন্যান্য উপাদান থেকে প্রস্তুত ওষুধগুলি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার মহৎ কাজে এই চিকিৎসার উপকরণটিকে আরও কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হবে বলেই মনে হয়।

ব. ভ. পেত্রভস্কি
সোভিয়েত ইউনিয়নের
চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর
পূর্ণ সদস্য

হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রচিকিৎসা

বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে এক মস্ত বড় পদক্ষেপ হল হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাতে বা তার নানা রকম অসুখে অস্ত্রচিকিৎসা। বহু শতাব্দী ধরে অস্ত্রচিকিৎসকদের পক্ষে হৃৎপিণ্ড ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। ধারণা ছিল হৃৎপিণ্ডে আঘাত লাগলে তার থেকে মানুষের আর রেহাই নেই। তাই সবচেয়ে সাহসী অস্ত্রচিকিৎসকও হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্র ব্যবহার করতে সাহস পেত না। মনে করা হত যে হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রচিকিৎসা হল আকাশ কুসুম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক বিলরৎ তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, পেরিকার্ডিয়াম (pericardium) কেটে হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন করা মানে হল সার্জেনের পক্ষে পাপের শেষ সীমা লঙ্ঘন করা। সে যুগে বিজ্ঞানীদের বক্তৃতায় বারে বারে এই মনোভাবটাই প্রকাশ পেত। আসলে অবশ্য এই সব উক্তি সে যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুন্নত অবস্থাকেই ব্যক্ত করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ডাক্তারদের তখনও বুকের অস্ত্রচিকিৎসার তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি, ইনফেকশনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বার মত তখন তাঁদের হাতে কিছুই ছিল না, বা সক ও রক্তক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার পথও তাঁদের জানা ছিল না। তাই খুবই স্বাভাবিক যে হাত বা পায়ের উপর সাধারণ অস্ত্রোপচারের পরও মারাত্মক জটিলতা গ্যাংগ্রিন, সেকেন্ডারী হেমারেজ (secondary haemorrhage), বা পেরিটোনাইটিস (peritonitis) হয়ে শতশত মানুষের জীবন নষ্ট হত। সে সময় অস্ত্রচিকিৎসার সামনে আরও এক বড় বাধা ছিল — সে হল এই যে এনেস্থেসিয়া বা অজ্ঞান করার কোন নির্ভরযোগ্য ও বিপদবিহীন উপায়ও তখন জানা ছিল না।

পাস্তুর ও লিস্টারের বিখ্যাত আবিষ্কার এবং রুশ মনীষী ন. ই. পিরগভ ও হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী জেমেলভেইসের গবেষণা এসেপ্টিক অস্ত্রোপচারের দিকে পদক্ষেপ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর ফলে অস্ত্রোপচারের পর কম্‌প্লিকেশন বা জটিলতা অনেক পরিমাণে কমে যায় (এসেপসিস হল এমন ব্যবস্থা যাতে অস্ত্রোপচারের সময় দেহের মধ্যে ইনফেকশন না পড়তে পারে)।

মর্টন যখন ইথারের সাহায্যে অজ্ঞান করার উপায় আবিষ্কার করেন তখন সেই উপায়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তাকে রাশিয়ায় কার্যক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন ন. ই. পিরগভ। এতে করে অস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি পথে বিরাট সুযোগের সৃষ্টি হয়। তারপর অস্ত্রচিকিৎসায় লোকাল এনেস্থেসিয়ার প্রবর্তন হয়। এই এনেস্থেসিয়া প্রবর্তনের কৃতিত্ব প্রাপ্য স্লেইখের ও বিশেষ করে সোভিয়েত অস্ত্রচিকিৎসক আ. ভ. ভিশ্নেভস্কির যিনি নিজে ইনফিলট্রেটিং নোভোকেইন এনেস্থেসিয়ার (infiltrating novocaine anaesthesia) প্রবর্তন করেন।

অস্ত্রচিকিৎসার উন্নতির পথে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রবর্তনও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সোভিয়েত চিকিৎসক প্রফেসর আ. আ. বগোমলেৎস, স. ই. স্পাসকুকৎস্কি, আ. আ. বাগ্দাসারভ, আ. ন. ফিলাতভ ও আরও অন্যান্যের প্রচেষ্টায় অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যাপকভাবে রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা ব্যবহার করা শুরু হয়। এর ফলে হাসপাতাল থেকে সক (shock) ও রক্তপাতের ভয় একেবারে দূর হয়ে গেছে এবং দুর্বল রোগীর পক্ষেও দেহের ভিতরকার বিভিন্ন অঙ্গের উপর জটিল দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে।

সবশেষে উল্লেখ করা দরকার যে এই হালে কয়েক বছর হল, ইনফেকশন বিরোধী হাতিয়ারের মধ্যে যুক্ত হয়েছে এণ্টিবায়োটিকের মতো শক্ত ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, বাইওমাইসিন প্রভৃতি আরও অন্যান্য এণ্টিবায়োটিকের সাহায্যে আজ সেপসিস, পেরিটোনাইটিস, সাপিউরিটিভ পেরিকার্ডাইটিস ও আরও অন্যান্য মারাত্মক ইনফেকশন উদ্ভূত রোগ যাতে মানুষ আগে মরে যেত তা সারানো সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়াও অনেকক্ষণ ধরে অপারেশনে দুর্বল রোগীর যাতে ইনফেকশন না হয় এণ্টিবায়োটিক সেই ব্যবস্থাও করে থাকে।

এই সমস্তই একত্রে বর্তমান যুগে অস্ত্রচিকিৎসাকে অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে সাহায্য করেছে। ফলে আজ শরীরের এমন সব অঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসা চালান সম্ভব হচ্ছে যাতে আগে হাতই দেওয়া যেত না। এর মধ্যে পড়ে হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম ও বড় বড় রক্তের শিরার অস্ত্রচিকিৎসা।

শরীরের এই সব অর্গান বা অঙ্গের উপর প্রথম হস্তক্ষেপ করার সৌভাগ্য হয় বিজ্ঞানী এক্সপেরিমেণ্টকারীদের। গত শতাব্দীর শেষে রুশী চিকিৎসক ন. ফিলিপভ ও ই. সাবানেয়েভ কুকুরের উপর এক্সপেরিমেণ্ট করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সেলাই করতে সমর্থ হন। বিদেশীদের মধ্যে দেলভেক্কিও, ব্লক এবং রেনও অনুরূপ এক্সপেরিমেণ্ট করেন।

গত শতাব্দীর এই সব অসমসাহসী এক্সপেরিমেণ্টের ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর কোন ক্ষত হলে সে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য এই বলে যে ভয় ছিল সে ভয়টা কেটে যায়। এই সব

এক্সপেরিমেণ্ট প্রমাণ করে যে গরম রক্ত সম্বলিত পশুদের হৃৎপিণ্ডের ক্ষতস্থান সেলাই করে দিলে সে ক্ষত জুড়ে যায়।

১৮৯৬ সালে রেন সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভেণ্ট্রিক্লের ক্ষতের উপর অপারেশন করেন। ১৯০২—১৯০৩ সালে প. গেরৎসেন, ন. সাখর্ভস্কি, গ. সেইড্লের, ই. গ্রেকভ ও আরও অনেকে হৃৎপিণ্ডের উপর অনুরূপ অপারেশন করতে সমর্থ হন। এরপরই শুরু হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এক নতুন যুগ হৃৎপিন্ড ও পেরিকার্ডিয়ামের ক্ষতের উপর অস্ত্রচিকিৎসা। হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচারের মোট হিসাব পেশ করতে গিয়ে ইউ. জানেলিদজে দেখান যে, ১৯২৭ সাল পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাত জনিত ৫৩৫টি অপারেশন করা হয়। দুঃখের বিষয় এই যে এর অর্ধেকের বেশী রুগী মরে যায়।

কিন্তু তাহলেও এই সামান্যতম সাফল্যও সার্জেনদের মনে ভরসা যোগায়; হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশনে তাঁদের ভয় ভেঙ্গে যায়, ব্যাপকভাবে তাঁরা শুরু করেন এই জটিল অঙ্গটির উপর অস্ত্রচিকিৎকার এক্সপেরিমেণ্ট।

সেই সময় বিখ্যাত সোভিয়েত অস্ত্রচিকিৎসক প. আ. গেরৎসেন লেখেন, 'যে-কোন অঙ্গের উপর অস্ত্রচিকিৎসা শুরু হয় সেই অঙ্গের আঘাতে সেখানে কী হয়েছে তা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ও ছিঁড়ে যাওয়া টিস্যু সেলাই করে। হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে সে ধাপ এখন কেটে গেছে।' প্রকৃতপক্ষে, সত্যিই সে ধাপ কেটে গিয়েছিল তখন, যখন শুরু হয়েছিল তার পরের ধাপ হৃৎপিণ্ডের নানান জটিল অসুখ ও হার্টফেইলিওরের (heart failure) অস্ত্রচিকিৎসা।

হৃৎপিণ্ডের অসুখে অস্ত্রচিকিৎসার প্রথম পরিকল্পনা করেন ইংরেজ সার্জেন সাণ্ডেইস। ১৮৯৮ সালে মাইট্রাল ডিসিজে (mitral disease) তিনি ভাল্ভগুলিকে ছুরি দিয়ে চিরে দেবার সুপারিশ করেন।

১৯২৫ সালে সোভিয়েত সার্জেন ই. দ্মিত্রিয়েভ কুকুরের উপর এক্সপেরিমেণ্টে আঙ্গুলের সাহায্যে হার্টের অরিফিসগুলি (ফুটোগুলি) ডাইলেট করতে সমর্থ হন। সেই বছরই সুত্তার এই উপায় অবলম্বন করে একজন রোগীর উপর অপারেশন করেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই প্রথম সাফল্যগুলি সত্যিই হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তখনও হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশনের সত্যিকারের বনিয়াদ তৈরী হয়নি যাতে করে ধারাবাহিকভাবে সে অপারেশন করা চলে। কেবল মাত্র বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের বছরগুলিতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ উন্নতির ফলে বিশেষ করে ব্যাক্টেরিওলজি, রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা, ফিজিওলজি ও অস্ত্রচিকিৎসার টেকনিকের উন্নতির ফলেই সত্যিকারের সেই ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ তৈরী হয় যাকে ভিত্তি করে হৃৎপিন্ড ও প্রধান প্রধান রক্তের শিরাগুলির রোগে অস্ত্রচিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

মনে রাখা দরকার যে হৃৎপিন্ড হল আমাদের দেহের এক খুবই জটিল অথচ ভীষণ শক্তিশালী ও কার্যক্ষম অঙ্গ।

সারা জীবন ধরে হৃৎপিন্ড বিরামবিহীনভাবে কাজ করে যায়। বিশ্রামের সময় মিনিটে গড়ে ৫ লিটার রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে আর্টারিতে পৌঁছয় এওর্টার মধ্য দিয়ে। রক্তপ্রবাহের এই পথটিকে বলা হয় রক্ত সঞ্চালনের দীর্ঘ পথ। কিন্তু পরিশ্রমের সময় এর পরিমাণ বেড়ে যায় ২০—২৫ লিটার পর্যন্ত। ২৪ ঘণ্টায় মানব দেহের এই অক্লান্ত পরিশ্রমী পাম্পটি রক্তের শিরায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ টন রক্ত ঠেলে দেয়।

হৃৎপিন্ডের দুটি ভাগ, দক্ষিণের অর্ধেক ও বামের অর্ধেক। এই ভাগদুটি আবার প্রত্যেকেই দুটি তলায় বিভক্ত — অরিক্ল ও ভেণ্ট্রিক্ল। ডান অংশটি ভেনের রক্তপ্রবাহ থেকে দুটি বড় ভেনের সাহায্যে রক্ত সংগ্রহ করে। এদের বলা হয় ভেনা কেভা। ভেনা কেভা দুটি এসে ডাইনের অরিক্লে যুক্ত হয়। সেখান থেকে রক্ত যায় ডাইনের ভেণ্ট্রিক্লে ও তারপর ভেণ্ট্রিক্লের সংকোচনের ফলে রক্ত সেখান থেকে পাল্মনারি আর্টারির মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। ফুসফুসের মধ্যে কম অক্সিজেন ও প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড যুক্ত ভেন প্রবাহিত কালো রক্ত পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে লাল হয়ে ওঠে এবং পাল্মনারি ভেনের সাহায্যে হৃৎপিন্ডের বাঁয়ের অংশ বাম অরিক্লে ফিরে আসে। হৃৎপিন্ড থেকে ফুসফুস ও ফুসফুস থেকে আবার হৃৎপিন্ডে রক্তের এই যে প্রবাহ একে বলা হয় লেসার সার্কিট বা রক্তপ্রবাহের ক্ষুদ্রতর পথ।

বাম অরিক্ল থেকে রক্ত চলে যায় বাম ভেণ্ট্রিক্লে ও সেখান থেকে এওর্টার মধ্য দিয়ে সারা দেহের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে সেই রক্ত দেহের সমস্ত অঙ্গ ও টিস্যুতে পুষ্টি ও খাদ্য সরবরাহ করে। খাদ্য সরবরাহের এই কাজটি চলে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্যাপিলারির সাহায্যে। এইসব ক্যাপিলারি থেকে আবার রক্ত গিয়ে জমা হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেনুলে, ভেনুল থেকে ভেনে ও ভেন থেকে ভেনা কেভায়। ভেনা কেভার মাধ্যমে রক্ত আবার ফিরে আসে হৃৎপিন্ডের ডান অংশে। রক্তপ্রবাহের এই পথটিকে বলা হয় গ্রেটার সার্কিট বা রক্তপ্রবাহের দীর্ঘতর পথ।

যা বলা হল এর থেকেই বোঝা যায় যে, ঠিকমতো রক্তপ্রবাহ চলতে হলে হৃৎপিন্ডে রক্তবহনকারী ও হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত নিকাশের শিরাগুলি ঠিক জায়গা মত স্বস্থানে থাকা চাই। হৃৎপিন্ডের ভিতরকার ভাল্ভগুলি ঠিক থাকা চাই ও হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে কাজের সঠিক ছন্দগতি বজায় থাকা চাই। মূল শিরাগুলির একটিও যদি সরু হয়ে যায়, কোন ভাল্ভে যদি ফাইব্রোসিস (fibrosis) দেখা দেয় বা কোন রকম অসুখ ও জন্মগত অসুখ জনিত তাতে ত্রুটি বা ডিফেক্ট দেখা দেয় তাহলে হৃৎপিন্ডের মতো এত জটিল অথচ চমৎকারভাবে তৈরী অঙ্গেও যথেষ্ট গোলযোগ উপস্থিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের এইসব গোলযোগ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ওয়াশিংটনে কার্ডিওলজিস্টদের (কার্ডিওলজি হল হৃৎপিণ্ডের কাজ ও ব্যাধি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের হৃদরোগ সম্বন্ধে যে হিসাব পেশ করা হয় তাতে বহু বক্তৃতায় উল্লিখিত হয় যে হৃদরোগের সংখ্যা ও এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে যে রোগের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের রোগই আজকাল ব্যাপকতার দিক থেকে দুনিয়ায় প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৃৎপিণ্ডের অসুখে ৭৪৫ হাজার লোক প্রাণ ত্যাগ করে — অর্থাৎ সেই বছরে মোট মৃত্যু সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। ঐ রোগে তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুগছিল প্রায় ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোক। অন্যান্য দেশেও সেই একই অবস্থা। হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে তাই আজ পর্যন্ত থেরাপিস্ট, সার্জেন ও শিশু চিকিৎসকেরা বহু সম্মেলন ও কংগ্রেস করেছেন।

কী করে ধরা যায় হৃৎপিণ্ডের অসুখ? রোগীকে তার কষ্ট সম্বন্ধে ভালো করে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শোনা এবং আরও নানা রকম লেবরেটারি পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হৃৎপিণ্ডের যে অসুখ হয়েছে তা ধরা পড়ে। কিন্তু তাহলেও এতে সবসময় সঠিক ডাইয়াগ্নোসিস হয় না। সার্জেনের ত আর সঠিক ডাইয়াগ্নোসিস না হলে চলবে না! এইসব জটিলতম অপারেশন করতে হলে আগে থেকে বিষদভাবে জানা চাই রোগের সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি, আক্রান্ত ভাল্‌ভের টোপোগ্রাফি, হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের ভার সহ্য করার ক্ষমতা ও সেইসঙ্গে দেহের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলির অবস্থা।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে নানা রকমের সূক্ষ্মতম উপায় রয়েছে যার সাহায্যে সঠিক ডাইয়াগ্নোসিস করা সম্ভব। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফির। ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাম হল কার্যরত হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তারই অঙ্কন বা প্রতিচ্ছবি। এই উপায়টিকে আমরা যে শুধু হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয়েই কাজে লাগাই তা নয়, এর সাহায্যে অপারেশনের সময় হৃৎপিণ্ডের অবস্থা কেমন যাচ্ছে তাও নির্ধারণ করে থাকি। এই যন্ত্র চিকিৎসককে সময় মতন সাবধান করে দেয় রোগীর সাংঘাতিক জটিলতা আসছে কিনা।

উদাহরণ, রোগীর নাম ত.., বয়স ২৫ বৎসর। অস্ত্রোপচারের সময় পেরিকার্ডিয়াম কাটতেই আকুলিনিচেভের সিস্টেমে তৈরী ভেক্টর-কার্ডিওস্কোপ দেখাল যে হৃৎপিণ্ডে জোর গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ১০ মিনিটের জন্য অস্ত্রোপচার বন্ধ রেখে আর্টারির মধ্যে রক্ত ঠেলে দেওয়া হল ও একই সঙ্গে দেওয়া হল হার্ট স্টিমুল্যাণ্ট। রোগীর অবস্থা এতে এত ভাল হয়ে উঠল যে অনায়াসে অস্ত্রোপচারের বাকি অংশ, সরু হয়ে যাওয়া মাইট্রাল অরিফিসকে ডাইলেট করা সম্ভব হল, রোগী চমৎকার সহ্য করে নিল অপারেশন।

মাইক্রোফোন যুক্ত এক রকম বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের টোন ও আওয়াজ রেকর্ড করে শোনা যায়। একে বলা হয় ফোনগ্রাফি (হার্ট সাউন্ড রেকর্ডিং)। হৃদরোগের ডাইয়াগ্নোসিস ও অস্ত্রোপচারের ফলাফল নির্ণয়ে এই যন্ত্রটি খুবই ভাল কাজ করে।

ডাইয়াগ্নোসিসের ক্ষেত্রে এর চেয়েও মূল্যবান উপায় হল এঞ্জিওকার্ডিওগ্রাফি। 'কার্ডিওট্রাস্ট' নামে শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয় এক প্রকার রেডিও ওপেক (radio opaque) দ্রব্য পাওয়া যায় যাতে ৭০% অর্গানিক আয়োডিন থাকে। সেই দ্রব্য হাতের ভেনের মধ্যে ইঞ্জেকশন করে তাই দিয়ে রক্তের শিরা ও হৃৎপিণ্ডের গর্ত ভরে ফেলে, তারপর কয়েক সেকেন্ড ধরে এক্সরে মেশিনে ফোটো তোলা হয়। এই ফোটোর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের গর্তের ভিতরের সার্ফেস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে সার্জেন বলতে পারেন তাতে কোন রোগ হয়েছে।

ইদানীং কয়েক বছরে হৃৎপিণ্ডের উপর অনুসন্ধান কার্য চালাবার যে সব উপায় বেরিয়েছে তাতে করে সার্জেন যে শুধু ওপেক তরল পদার্থই হার্টে পেঁাছে দিতে পারে তাই নয়, এমনকি নরম প্লাস্টিকের ক্যাথিটারও হৃৎপিণ্ডের গর্ত পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে তাই দিয়ে অরিক্ল, ভেণ্ট্রিক্ল ও পাল্মুন্যারি আর্টারির ভিতরকার চাপ নির্ণয় করতে পারে ও আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে হৃৎপিণ্ডের অসুখ আছে কি না। এইরকম আরও অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির বর্ণনা এখানে দেওয়া যেত যার সাহায্যে ডাক্তারেরা হৃৎপিণ্ডের অসুখ নির্ণয় করে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে আজকে হৃৎপিণ্ডের যে কোন অসুখের বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। ডাক্তারদের পক্ষে এ এক অমূল্য সম্পদ কেননা এইসব বিচার করেই ডাক্তাররা স্থির করে হৃৎপিণ্ডের কী অসুখ হয়েছে ও কী ভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে।

হৃৎপিণ্ডের বেশীর ভাগ রোগ — হাইপার টেনশন, হৃৎপিণ্ডের শিরার স্ক্লেরোসিস, হৃৎপিণ্ডের ভাল্ভের ও মাংসপেশীর রিউম্যাটিক ঘা প্রভৃতি চিকিৎসা করা হয় ওষুধের সাহায্যে। ইদানীং এই সমস্ত ওষুধের ক্রমশই উন্নতি সাধন করা হচ্ছে।

সোভিয়েত ডাক্তারেরা এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের নানা রকমের কার্যকরী উপায় বের করছেন। কিন্তু তাহলেও এ সব রোগ এখনও যথেষ্ট হতে দেখা যায়। ওষুধ ব্যবহার করে স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে বা অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেও এ অসুখ সবসময় সারানো যায় না। এই কারণেই অপারেশন বা অস্ত্রচিকিৎসা বর্তমানে কার্ডিওলজির এক মূল্যবান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও ক্রমশই বেশী প্রসার লাভ করছে।

বর্তমানে নিম্নলিখিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়: ১) হৃৎপিণ্ডের আঘাত বা তাতে ফরেন বডির অবস্থিতি, ২) জন্মগত হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা, ৩) জন্মের পর অর্জিত হৃৎপিণ্ডের অসুখ ও অক্ষমতা।

হৃৎপিণ্ডের আঘাত সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি। এক্ষেত্রে অপারেশন করা অস্ত্রচিকিৎসকের পক্ষে সাহসিকতার কাজ হলেও অবশ্য কর্তব্য।

উদাহরণ: রোগীর নাম ন.., বয়স ২০ বৎসর। ২০শে নভেম্বর ১৯৫৫ সালে সে ছুরিকাহত হয়, চোট লাগে বুকের বাঁ দিকে। প্রচুর রক্তপাতের পর জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ভীষণ রক্তাল্পতা, সুতোর মতো নাড়ীর গতি, হৃৎপিণ্ডের স্ফীতি ও আঘাতের

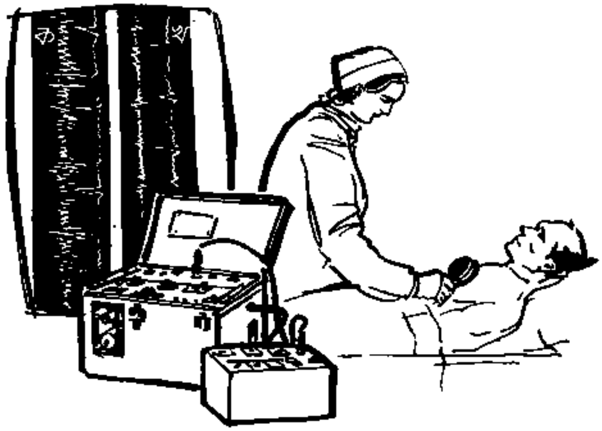

চিত্রে দেখানো আছে এক বিশেষ যন্ত্র ফোনকার্ডিওগ্রাফ। এর সাহায্যে কাগজে হৃৎপিণ্ডের টোন ও মারমার (murmur) লিপিবদ্ধ করা হয়। (ক) অপারেশনের আগে (খ) অপারেশনের পর।

অবস্থিতি থেকেই ধরা পড়ে যে আঘাত লেগেছে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিক্লে। তাড়াতাড়ি রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে দেড় লিটার রক্ত ভেনে ও আধ লিটার রক্ত আর্টারিতে পরিসঞ্চালন করা হয়। তারপর রোগীকে অজ্ঞান করে বুক কেটে পেরিকার্ডিয়াম ছেদ করে দেখা গেল যে আঘাত লেগেছে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিক্লে। ক্ষত স্থানটি হাঁ করে আছে ও তার ভিতর দিয়ে প্রবল স্রোতের মতো বেরুচ্ছে লাল রক্ত। মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে সার্জেন আঙ্গুল দিয়ে ক্ষত স্থান চেপে ধরলেন ও তারপর সিল্ক সুতোর সাহায্যে কয়েকটি ফোঁড় দিয়ে ক্ষত স্থান সেলাই করে ফেললেন। রক্তপাত বন্ধ হল। রোগীর অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠল। অস্ত্রোপচার জনিত ক্ষত সেলাই করে অপারেশন শেষ করা হল। তিন সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে রোগী বাড়ী ফিরল হাসপাতাল থেকে।

আমাদের হাসপাতালে ও আরও অন্যান্য বিভিন্ন হাসপাতালে দেশী ও বিদেশী শত শত সার্জেনের করা অনুরূপ কত কেসের যে বর্ণনা দেওয়া যেত তার হিসাব নেই। হৃৎপিণ্ডের আঘাতে অপারেশন শুধু যে শহরের হাসপাতালেই হয় তা নয়। গ্রামের হাসপাতালেও আজকাল এই অপারেশন চলছে। দক্ষ সার্জেনরা এইভাবে কত লোকের যে প্রাণ বাঁচিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

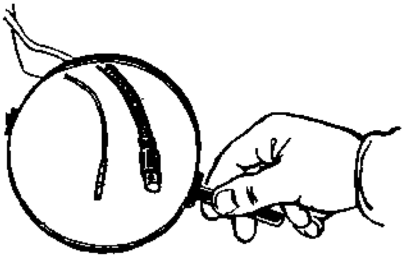

এই সব সরু সরু প্লাস্টিকের টিউব যাদের অগ্রভাগে সেন্সিটিভ ইলেকট্রোড থাকে তা হাতের ভেনের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গহ্বরে প্রবেশ করানো হয়। এই উপায়ে হৃৎপিণ্ডে কী অসুখ হয়েছে তা নির্ণয় করার অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় আমাকে অনেক বার এই রকম অপারেশন করতে হয়েছে। উদাহরণ: ১৯৪৩ সাল, এপ্রিল মাস, মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে এল একজন আহত সৈন্যকে ফিল্ড হাসপাতালে। তার নাম ক.., বয়স ২৫ বৎসর। মাইনের টুকরোর আঘাত লেগে তার পেরিকার্ডিয়াম ছিঁড়ে গিয়ে তাতে পুঁজ জন্মায় আর ওদিকে টুকরোটি কিন্তু গিয়ে লেগে থাকে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর গায়ে। বুকের বাঁ দিকের দুই পাঁজরার হাড়ের মাঝখান দিয়ে চওড়া করে কেটে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গেলাম যাতে উপর থেকে হৃৎপিণ্ড ভালো করে দেখা যায়। তারপর পেরিকার্ডিয়াম কেটে সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে অনেক পুঁজ শুষে বের করে নেওয়া হল। রেডিও-প্যালপেশন যন্ত্রের সাহায্যে স্প্লিণ্টারটি কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে তাকেও তুলে আনা হল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে রেডিও-প্যালপেশন যন্ত্র, মাইন খোঁজা যন্ত্রের মতই এক বিশেষ যন্ত্র, যার সাহায্যে মানুষের দেহে ঢুকে পড়া ধাতব স্প্লিণ্টার কোথায় লেগে আছে তা খুঁজে বের করা যায়। মাইনের টুকরো তুলে নিয়ে আসবার পর ড্রেনেজ ও এণ্টিসেপ্টিক ব্যবহার করে ইনফেকশন দূর করা সম্ভব হয়। রোগী সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে বিদায় নেয়। ১৯৫৩ সালে — অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের ১০ বছর পর সে আবার আমাকে দেখাতে এসেছিল হাসপাতালে। দেখে ও পরীক্ষা করে আমরা তার সে রকম কোন দোষ পাইনি। হৃৎপিণ্ড তার চমৎকার কাজ করছে।

হৃৎপিণ্ড থেকে ফরেন বডি বার করে নেবার আর যে সমস্ত নতুন উপায় রয়েছে তার মধ্যে অপারেশনের সময় শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা উল্লেখযোগ্য। প্রথমে হৃৎপিণ্ডের গায়ের

খানিকটা অংশ আবরণ মুক্ত করে তারপর সেখানে, সেই ক্ষত স্থানে চুম্বক স্থাপন করে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী বা হৃৎপিণ্ডের গর্ত থেকে ফরেন বডিটি আকর্ষণ করে নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মির সাহায্য নিলে এই অপারেশন করতে অনেক সুবিধে হয়।

* * *

হৃৎপিণ্ডের অপারেশনগুলির মধ্যে জন্মগত হৃদরোগের অপারেশনই সবচেয়ে শক্ত। শিশু হাসপাতালে বা অনেক সময় পথ চলতেও এমন অনেক শিশু চোখে পড়ে যাদের দেখলে ভয় হয়। এরা দেখতে একেবারে 'নীল'। চামড়া, ঠোঁট ও জিব কালচে নীল রঙের। ওরা দৌড়তে ত পারেই না, এমনকি হাঁটলেও ওদের কষ্ট হয়। এদের শরীরের সেরকম ভালো বৃদ্ধি নেই এবং প্রায়ই দশ বছর বয়সের আগেই এদের মৃত্যু হয়। আবার এমনও অনেক শিশু দেখা যায় যারা নীল নয়, ফ্যাকাশে ভীষণ রোগা ও দুর্বল। নিশ্বাসের কষ্টের জন্য এরা একেবারে পঙ্গু। এইসব শিশুরোগীদের সকলেরই রোগটা হল জন্মগত হৃদরোগ — কারো বা মাতৃগর্ভে বড় হবার সময় পাল্মনারি আর্টারি সরু হয়ে গেছে বা হৃৎপিণ্ডে এমন সব ব্যতিক্রম জন্মেছে যাতে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে কম রক্ত পৌঁছয় ও শরীরে সৃষ্টি হয় অক্সিজেনের অভাব। এই কারণেই এ শিশুদের গায়ের রঙ নীল।

কারোবা বোটাল'স ডাক্ট (**Botal's duct**) বুজে যায়নি। বোটাল'স ডাক্ট হল ভ্রূণ অবস্থায় এওর্টা ও পাল্মনারি আর্টারির যোগাযোগের পথ। ভ্রূণ অবস্থায় এ কেনাল যথেষ্ট প্রয়োজনীয় কিন্তু জন্মাবার পর এর আর কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। জন্মগত এই যে ডিফেক্ট বা হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা এতেও খুব বেশী পরিমাণে ব্যাহত হয় রক্তপ্রবাহ। কারো কারো বা দেখা যায় জন্ম থেকেই এওর্টা সরু হয়ে রয়েছে বা অরিক্ল থেকে অরিক্লে কিংবা ভেণ্ট্রিক্ল থেকে ভেণ্ট্রিক্লে যোগাযোগ রয়েছে বা আরও কত নানা রকমের ডিফেক্ট।

এই রকম সমস্ত ডিফেক্টই যে আমরা সারাতে পারি তা নয়, তবে অপারেশনের পরে এদের অনেকে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে বা অনেক পরিমাণে তাদের কষ্টের লাঘব হয়।

আজ বিভিন্ন দেশে জন্মগত হৃদরোগে অস্ত্রচিকিৎসকদের অনেক হাজার হাজার অপারেশনের অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে যার ফলে রক্ষা পেয়েছে আমাদের সকলের অতি প্রিয় হাজার হাজার শিশুর জীবন।

দৃষ্টান্ত, শিশু ভালিয়া ত...। জন্মাবার পর থেকেই সে রুগ্না। ছয় বছর বয়স হয়ে গেলেও শরীরের যেন তার কোন বৃদ্ধি নেই। মেয়েটি যেমন ছোট তেমনি রোগা। মাঝে মাঝেই তার কাশি বা নিউমোনিয়া হত। নিশ্বাসের কষ্টের জন্য সে সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলায় যোগ দিতে পারত না, সবসময় বুড়ীদের মতো গম্ভীর মুখ করে বসে থাকত। ১৯৫৩ সালের শেষে মেয়েটির মাবাপ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে

ভালিয়ার বোটাল'স ডাক্ট খোলা রয়েছে এবং ওর রক্তের ৬০% অংশ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এওর্টা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে সোজা ফুসফুসে চলে যাচ্ছে। এ রোগে তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে শিশুরা সাধারণত বেশী দিন বাঁচে না। যে অপারেশন আমাকে করতে হল সে অপারেশন অবশ্য খুবই শক্ত, কিন্তু তাহলেও অপারেশনটি ভালয় ভালয় শেষ হয়েছিল। ঠিক দু বছর পর ভালিয়াকে আবার যখন হাসপাতালে আমার কাছে নিয়ে আসে আমি ওকে দেখে চিনতেই পারিনি। যেমন হাসিখুশি তেমনি চঞ্চল, গালদুটি দেখতে টুকটুকে লাল। দুবছরে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়েছে, ওজনে ৮ সের বেড়েছে, ইস্কুলে চমৎকার পড়াশুনা করছে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল হার্টে আর কোন দোষ নেই।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি: নিকোলাই স., ১৯ বছর বয়স, সোনার মেডেল উপহার পেয়ে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ওর স্বপ্ন যে ও ডাক্তার হবে, সার্জেন হবে। বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল ওর হৃৎপিণ্ডের অসুখ — খোলা বোটাল'স ডাক্ট। ধীর শান্তভাবে যথেষ্ট সাহস নিয়ে ও অপারেশন থিয়েটারে এল। ওর অপারেশনটাও খুবই ভালো হয়েছিল। ২০ দিনের মধ্যেই নিকোলাই হাসপাতাল থেকে ছাড়ান পেয়ে বাড়ি গেল। দেড় মাস পরে মস্কোর লেনিন অর্ডার প্রাপ্ত ই. ম. সেচেনভের নামে ১ নং মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে কলিয়ার (নিকোলাইকে আদর করে ডাকা হয় কলিয়া) সাথে আমার দেখা। সেই ইনস্টিটিউটে ও ভর্তি হয়। আশা করা যায় যে ও খুব ভালো ডাক্তার হবে, কেননা ও যে নিজে পরখ করে দেখেছে সোভিয়েত সার্জারির শক্তি!

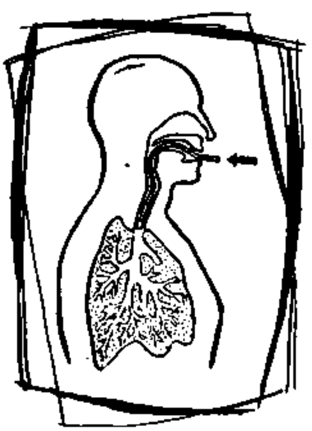

আধুনিক ইণ্ট্রাট্রেকিয়াল এনেস্থেসিয়ায় অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত ন্যারকটিক পদার্থ রোগীর শ্বাসনালীতে ঢোকান রবার টিউবের মধ্য দিয়ে সোজাসুজি ফুসফুসে গিয়ে পড়ে। এই জটিল এনেস্থেসিয়া যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় ন্যারকটিক পদার্থের ডোজ ও সেই গ্যাস মিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ কত।

গ্রস, বাকুলেভ, ওসিপভ প্রভৃতি অনেক সার্জেন বলেন যে, রুদ্ধ না হওয়া বোটাল'স ডাক্ট কেসে অপারেশন করে সাধারণত খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এই অপারেশন করে আমরাও খুব ভালো ফল পেয়েছি। কিন্তু মাবাপেরা যদি রোগীকে খুব বেশী দেরী করে অস্ত্রচিকিৎসকের হাতে দেন যখন আরও নানা রকমের জটিলতা দেখা দিয়েছে সে ক্ষেত্রে অপারেশনটি হয়ে দাঁড়ায় ঢের কঠিন।

জন্মগত হৃদরোগ যাতে শিশু নীল হয়ে যায়, তার অপারেশন ঢের শক্ত। এ অসুখে শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য থাকে ঢের খারাপ, কেননা অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী ও শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়

আরও অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছয় অনেক কম। এক্ষেত্রে ফুসফুস তার নিজের মূল কাজ — সমস্ত অঙ্গে ও সমস্ত টিস্যুতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে দিতে অক্ষম। কাজেই বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সব 'নীল' শিশুদের উপর অপারেশন করতে হয়।

সাধারণত হৃৎপিণ্ডের সমস্ত অপারেশনেই আমরা ইণ্ট্রাট্রেকিয়াল এনেস্থেসিয়া ব্যবহার করে থাকি। এতে জটিল এনেস্থেসিয়া যন্ত্রের সাথে যুক্ত এক বিশেষ ধরনের রবার টিউব শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এনেস্থেসিয়া দেওয়া হয়। অক্সিজেনের সাথে মিশ্রিত ইথার এই টিউবের মধ্য দিয়ে এসে ফুসফুসে পড়ে। অপারেশন চলাকালে প্রয়োজন হলে এই যন্ত্রের সাহায্যে বেশী করে অক্সিজেন দেওয়া চলে বা তালে তালে ফুসফুসকে ফুলিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য পরিচালনা করা চলে। কিন্তু এত করেও অনেক সময় টিস্যুর ভীষণ অক্সিজেন অভাব ও তার পরিণতি রোধ করা সম্ভব হয় না।

এ সব কেসের জন্য সার্জেনের হাতে এসেছে এক নতুন শক্তিশালী উপায় — হাইপোথার্মি। হাইপোথার্মি — এই শব্দটির মানে হল কৃত্রিম উপায়ে দেহ ঠাণ্ডা করা। এই উপায়টি বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু অস্ত্রচিকিৎসার হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক গবেষণার পর ফিজিওলজিস্টরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে, এনেস্থেসিয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ যদি ৬° থেকে ৮° ডিগ্রী কমিয়ে আনা যায় তাহলে জীবন্ত টিস্যুর অক্সিজেনের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। এতে করে মস্তিষ্কের মতো অক্সিজেনলোভী অঙ্গ যা নাকি আর্টারির রক্তের সমস্ত অক্সিজেনের ৬ ভাগের এক ভাগ নিজে ব্যবহার করে থাকে তার অক্সিজেনের চাহিদা অর্ধেক হয়ে যায়। অন্যান্য অঙ্গের বেলায় ও তাই — ঢের কমে যায় অক্সিজেন চাহিদা। এছাড়াও খুবই উল্লেখযোগ্য যে হাইপোথার্মির অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের উপর অপারেশন করলে রোগী সে অপারেশন ঢের সহজে সহ্য করতে সক্ষম হয় ও অপারেশনের পরবর্তী জটিলতা অনেক কম হতে দেখা যায়।

ইণ্টার-অরিকুলার সেপ্টামের (interauricular septum) ডিফেক্ট অপারেশনের সময় হাইপোথার্মি সার্জেনকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সেপ্টামের ঐ গর্ত বুজিয়ে দেবার জন্য হৃৎপিণ্ডে রক্ত আসা বন্ধ করে, তাকে রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে পৃথক করে ডাইনের রক্তশূন্য অরিক্ল কেটে ইণ্টার-অরিকুলার সেপ্টামের সেই গর্ত সেলাই করে দিতে হয়। হাইপোথার্মির অবস্থায় ৬ থেকে ৮ মিনিটের জন্য শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ করলে তার জন্য মস্তিষ্কের যে ভীষণ অক্সিজেন অভাব সৃষ্টি হয় শরীর তা অপেক্ষাকৃত সহজেই সহ্য করে নেয়। আধুনিক সার্জারির এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল হাইপোথার্মিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গর্ত কেটে তার ভিতর অপারেশন করা। এই রকম অপারেশন প্রথম করা হয় প্রফেসর প. আ. কুপ্রিয়ানভ ও প্রফেসর ভিশ্নেভস্কির পরিচালিত হাসপাতালে এবং আমাদের ক্লিনিকে।

উদাহরণ, নাতাশা ই., ৬ বছর বয়স। নানা পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে হৃৎপিণ্ডের উপর

অপারেশনের সাফল্যের কথা পড়ে তার মাবাপ তাকে মস্কো নিয়ে আসে। এ ঘটনা ঘটে ১৯৫৬ সালের মার্চে। আমি যখন তাকে প্রশ্ন করি, 'নাতাশা তোর কি কষ্ট হচ্ছে?' মেয়েটি কোন জবাব দিতে পারেনি। সে শুধু উত্তরে তার জায়গায় জায়গায় নীল হয়ে যাওয়া কালো চোখ দুটি বন্ধ করে। ও নিজে নিজে হাঁটতে পারত না, ওর বাবা ওকে কোলে করে নিয়ে আসে আমার কাছে। সমস্ত গায়ের চামড়া নীল এবং একটু নড়াচড়া করলেই সে নীলাভা যেন আরও বেড়ে যেত।

এঞ্জিওকার্ডিওগ্রাফি করে দেখা গেল যে ওর পাল্মুনারি আর্টারি খুবই সরু ও দুই ভেণ্ট্রিক্লের মাঝে যে সেপ্টাম তাতে ফুটো রয়েছে।

হৃৎপিণ্ডের এই অসুখে শিশুরা বেশী দিন বাঁচে না। এই রকম ডিফেক্টে, অর্থাৎ অক্সিজেনের অভাবে টিসু ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বেশী দিন টিকতে পারে না। অক্সিজেন অভাবের কারণ হল এই যে, ডান ভেণ্ট্রিক্লের যেখান থেকে পাল্মুনারি আর্টারি বেরিয়েছে সে জায়গাটা সরু হয়ে গেছে।

আমরা ঠিক করলাম যে এ কেসে শুধু পাল্মুনারি আর্টারির সরু হয়ে যাওয়া অংশ ডাইলেট করার অপারেশন করব। কেমন করে তা করা হল সেই কথাই বলছি। বুকের সামনের দিকটা পাতালেভাবে কেটে স্টার্নামকে (sternum) দুভাগ করে বুকের ভেতরটা খোলা হল, দেখা গেল হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড স্ফীত ও থলথলে। এই দেখে আমি ত রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করলাম যে, যেখানে পাল্মুনারি আর্টারিটা সরু হয়ে গেছে সে জায়গাটা কাঁপছে। এর সামান্য নীচে ডান ভেণ্ট্রিক্লের গায়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে কয়েকটা সিল্কের সেলাই আগে পড়িয়ে ছুরি দিয়ে সেখানটা কেটে ভেণ্ট্রিক্লের গায়ে ফুটো করা হল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমি পাল্মুনারি ভাল্‌ভের এক অংশ কেটে বের করে নিয়ে এলাম। তারপর পাল্মুনারি আর্টারির ছিদ্রটি এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ডাইলেট করে যন্ত্রটি বের করে ভেণ্ট্রিক্লের গায়ের ক্ষত সেই পড়ান সিল্ক সেলাইয়ের সাহায্যে বন্ধ করা হল।

রক্তপ্রবাহের কত উন্নতি হল তা পরক্ষণেই দেখা গেল। কাছেই যে সব যন্ত্রপাতি ছিল তার সাহায্যে বোঝা গেল যে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়েছে ও হৃৎপিণ্ডের কাজের উন্নতি হয়েছে।

বলাই বাহুল্য যে এইরকম শক্ত অপারেশন সবসময় এত সহজে করাও যায় না, বা অপারেশনের পরবর্তী কাল এত মোলায়েমভাবে চলে না। নাতাশার কেসে অপারেশনের পরবর্তীকাল চমৎকার কেটে গেল।

অপারেশনের পর নাতাশার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হল — কী হাসিখুশি, ওর ভেতর যেন নতুন জীবনী শক্তি ফিরে এল। হাসপাতালের সকলেরই ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ও আর

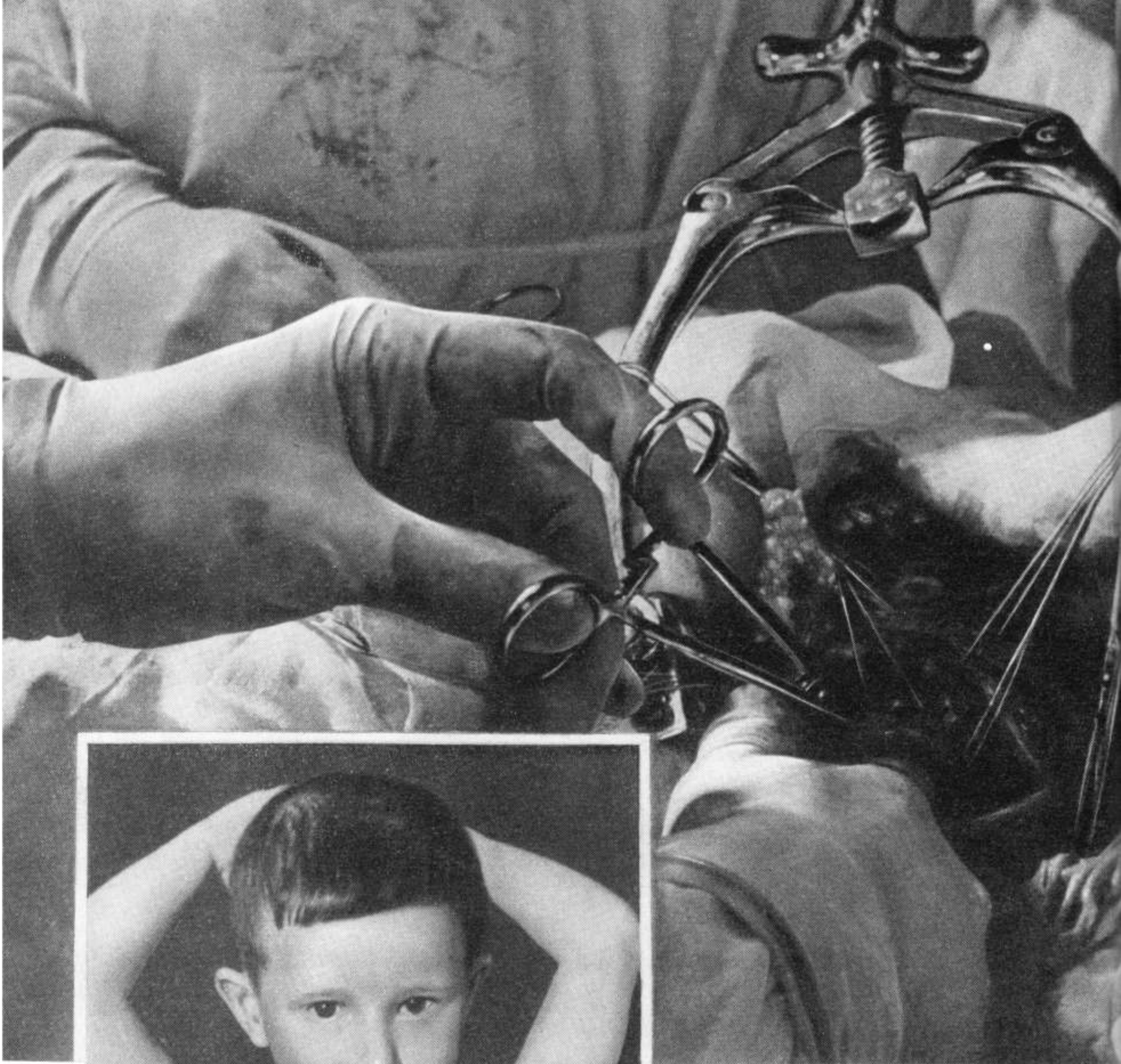

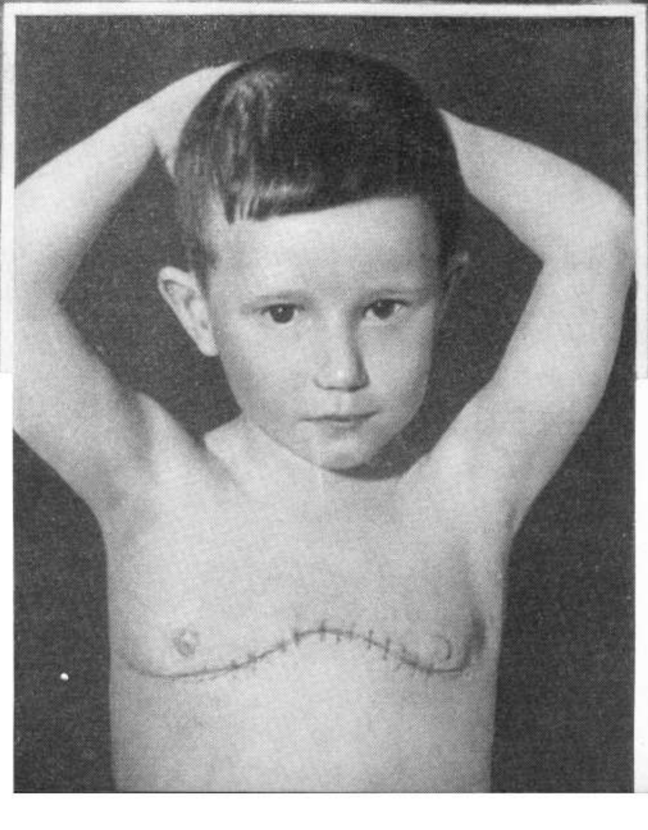

আর সামান্য কিছু দিন পার হলে পর সেরিওজা, যার হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন করেন প্রফেসর ব. ভ. পেত্রভস্কি, তার সমবয়স্কদের মতনই যেমন চঞ্চল তেমনি হাসিখুশি হয়ে উঠবে।

হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন চলছে। সার্জেনের আঙ্গুল ঢোকান রয়েছে হৃৎপিণ্ডের ভিতর। এইভাবে সার্জেন খুঁজে বের করেন হৃৎপিণ্ডের সেই জায়গা যা 'সারাই' করতে হবে।

হৃৎপিণ্ডের কাজ এখন বন্ধ। তাকে রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এক জটিল যন্ত্র AIK-1 (ডান দিকের নীচের চিত্র)।

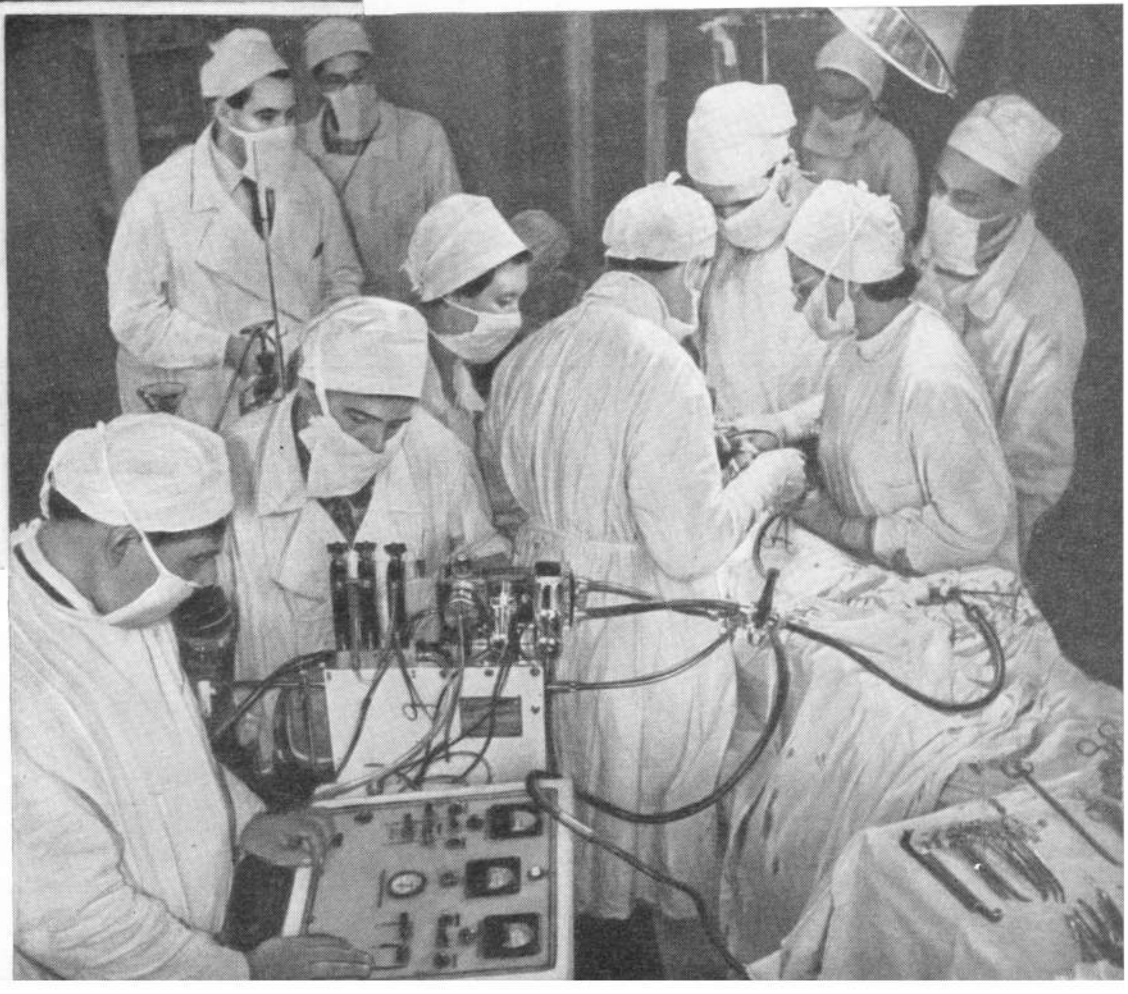

কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না সবসময়ই বাইরে খেলাধুলা করতে চাইত। এত মাস ধরে শুয়ে থাকার পর এটাই অবশ্য ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

অপারেশনের ৬ মাস পরে ওকে আমি আবার দেখি। সমবয়সী যে কোন সুস্থ মেয়ের চেয়ে ওর কোন তফাৎ দেখিনি, ও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

অর্জিত হৃদরোগ যেমন বড়দের মধ্যে তেমনি শিশুদের মধ্যেও ঘনঘন দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ, তানিয়া ভ.., ১৪ বছর বয়স, কিন্তু দেখলে মনে হয় ও যেন ৭ বছরের মেয়ে। লম্বায় ভীষণ খাট, রোগা, কিন্তু জল জমে যাওয়ার জন্য মস্তবড় পেট। টিবি হবার পর ওর পেরিকার্ডিয়াম পাথরের মতো শক্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরে (adhesive pericarditis)।

চাপের ফলে হৃৎপিণ্ডের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয় ও তারই জন্য আবার যকৃতের কাজ ব্যাহত হয়ে পেটে জল জমে। এই রকম রোগীরা আগে মরে যেত তাদের বাঁচাবার কোন উপায়ই জানা ছিল না। এখন আমরা পরিবর্তিত পেরিকার্ডিয়ামকে কেটে ফেলে হৃৎপিণ্ডকে চাপের হাত থেকে মুক্ত করি। আমাদের দেশে এইরকম অপারেশন প্রথম করেন আ. বাকুলেভ এবং ইউ. জানেলিদজে।

আমাদের বাচ্চা রোগিনীর হৃৎপিণ্ডকে আমরা আঁকড়ে ধরা পেরিকার্ডিয়াম থেকে মুক্ত করি। অপারেশনের ১ বছর পর মেয়েটির এত পরিবর্তন হয় যে দেখে চিনতেই পারা যায় না। ১৫ বছরের মেয়ে, গাল লাল টুকটুকে, এক বছরে লম্বায় ২২ সেণ্টিমিটার বেড়েছে ও ওজনে বেড়েছে ১০ সের।

* * *

অর্জিত হৃদরোগের মধ্যে আমরা অপারেশন করি মাইট্রাল ভাল্‌ভের মাইট্রাল স্টেনোসিস ও মাইট্রাল ইনসাফিসিয়েন্সি কেসে, এবং এওর্টিক স্টেনোসিস, স্টেনোকার্ডিয়া ও হৃৎপিণ্ডের এনিউরিজমে (aneurism)। রিউম্যাটিজমের ফলেই মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়। এতে মাইট্রাল ভাল্‌ভ ও মাইট্রাল কেনাল, যা হৃৎপিণ্ডের বাঁ অরিকুকে বাঁয়ের ভেণ্ট্রিক্রের সাথে যুক্ত করে, তার ফাইব্রোসিস হয়। এসব কেসে অপারেশন করে সরু হয়ে যাওয়া কেনালটিকে ডাইলেট করে দেওয়া হয় এবং এতেই, রক্তপ্রবাহের যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয় ও রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার বিভিন্ন মেডিক্যাল পত্রিকায় অনুরূপ অপারেশন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত হাজার খানেক লেখা বেরিয়েছে। পাকস্থলীর অপারেশনের মতন সাধারণ অপারেশনের তুলনায় এই অপারেশনের ফলাফল কোন অংশে খারাপ নয়। আমাদের নিজেদের ক্লিনিকে আজ পর্যন্ত এইরকম ৩০০র বেশী অপারেশন হয়েছে।

এই অপারেশন সময়মত করলে এতে করে মানুষের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায়। এইরকম যে সমস্ত রুগীর উপর আমরা অপারেশন করেছি, এখন তারা সব আমাদের লেখে কেমন তারা বরফের উপর স্কি বা স্কেটিং করছে, অথচ অপারেশনের আগে এইসব রোগীদের মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে।

কমবয়সী লোকেরা খুব সহজেই মাইট্রাল রোগের অপারেশন সহ্য করে নেয়। এ সব কেসে আসল কথা হল রোগীর মনের জোর ও ভালো হবার আকাঙ্ক্ষা।

উদাহরণ, এক দিন আমার কাছে দেখাতে এল ১৫ বছরের একটি মেয়ে কাতিয়া ই...। মেয়েটি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, রক্তশূন্য রোগা ও গম্ভীর। মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করল ওর হৃৎপিণ্ডে যে অসুখ হয়েছে তাতে অপারেশন করে ভালো হয়ে উঠবার আশা আছে কি না। পরীক্ষা করে দেখা গেল হৃৎপিণ্ডে ওর খারাপ অসুখ হয়েছে — মাইট্রাল কেনাল সরু হয়ে গেছে। আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ভালো হবার আশা আছে।' কাতিয়া তখন আমাকে বলল যে, ওর নিজের অপারেশন করাতে খুবই ইচ্ছা কিন্তু ওর মাবাপের মোটেই ইচ্ছে নেই তবে ও নিশ্চয়ই তাদের মত করাবে। শীগগিরই কাতিয়ার বাবা ও মা আমার কাছে এসে তাদের অনুমতি দিল। সাহসের সঙ্গে অপারেশন সহ্য করল মেয়েটি, চমৎকার ফল হল অপারেশনের এবং ও একেবারে সেরে উঠল।

মাইট্রাল কমিস্সিউরটমি অপারেশনটা ঢের শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, যদি মাইট্রাল স্টেনোসিসের সঙ্গে বাঁয়ের অরিক্লে থ্রম্বাস থাকে (থ্রম্বাস হল জমে যাওয়া রক্ত)। তাহলে অপারেশনের সময় আমাদের আগে থ্রম্বাস বের করে দিয়ে তারপর মাইট্রাল কেনাল ডাইলেট করতে হয়।

হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে চলতি রোগ করোনারি স্ক্লেরোসিস (angina pectoris) সম্বন্ধে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছুই বলিনি। বহু লোকের এই রোগ হয়। বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ন ন. ন. আনিচ্‌কভ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, হৃৎপিণ্ডের রক্তের শিরার দেওয়ালে কোলেস্টারিন জমে গিয়েই এই রোগের সৃষ্টি হয়। এইসব আর্টারি পরে ক্রমশ সরু হয়ে যেতে থাকে এবং তারই ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর পুষ্টি কমে যায় সৃষ্টি হয় ব্যথা, ইনফার্কশন বা কার্ডিয়াক এনিউরিজম।

খাবার দাবারের বাছ বিচার না করা, নার্ভ ও সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর এবং পরিশ্রমের ও বিশ্রামের অনিয়মতা এই রোগ সৃষ্টিতে কতখানি সহায়তা করে তা আমরা জানতে পারি সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের থেরাপিস্টদের ইদানীং কালের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের বক্তৃতাদি থেকে।

সার্জেনদের এই রোগের সাথে সম্বন্ধ দেখা দেয় তখন যখন করোনারি রোগ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ও হৃৎপিণ্ডের রক্তের শিরায় সাংঘাতিক স্প্যাজমের জন্য হৃৎপিণ্ডে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।

এই সমস্ত কেসে সোভিয়েত অস্ত্রচিকিৎসক ইউ. জার্নোলিদজে ও ভ. কাজানস্কি কর্তৃক প্রচলিত সাবস্টার্নাল নোভোকেইন ব্লকাড (substernal novocaine blockade) করে চিকিৎসা করা হয়। এর ফলে ব্যথা চলে যায় ও রোগীর সাধারণ অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু মাইওকার্ডিয়ামের ক্রনিক অপুষ্টিতে আরও রেডিক্যাল বা বনিয়াদি সার্জিক্যাল চিকিৎসা হল ইণ্টারন্যাল ম্যামারি আর্টারিগুলি সেলাই করে দেওয়া। নোভোকেইনের সাহায্যে বুকের চামড়া একটুখানি কেটে এই অপারেশনটি করা হয়। এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত এই অপারেশন অতি সহজে সহ্য করে নেয়। কোন কোন কেসে করোনারি স্ক্লেরোসিসে মাইওকার্ডিয়ামে ইনফার্কশন দেখা দেয় (হৃৎপিণ্ডের দেওয়ালের খানিকটা অংশ জীবনী শক্তি হারায়), এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এনিউরিজম বা হৃৎপিণ্ডের দেওয়ালের পেশীতে থলের মতো বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। এতে শুধু যে রক্ত সঞ্চালন সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয় তাই নয়, হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়। এই সমস্ত কেসে আমরা সরু ও দুর্বল হয়ে যাওয়া বাম ভেণ্ট্রিক্লের দেওয়ালে ডায়াফ্রাম (diaphragm) থেকে ছিলা তুলে সেলাই করে দিয়ে দেওয়ালটিকে মজবুত করি ও তেমনি করেই পুনর্বার এনিউরিজমের থলে সৃষ্টি হওয়া নিবারণ করি।

আমি নিজেও হৃৎপিণ্ডের এনিউরিজমের কয়েকটি কেসে এই নতুন অপারেশনটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছি।

পশুদের মধ্যেও বুকের ভিতরকার বিভিন্ন অঙ্গের ডিফেক্ট ডায়াফ্রামের ছিলা দিয়ে সারাই করার এক্সপেরিমেণ্ট করে আমরা সফল কাম হয়েছি। ডায়াফ্রাম হল বুক ও পেটের মাঝখানের পর্দা। এই মোটা পর্দাটির মাঝখানে থাকে মাংসপেশী ও তার দুই দিকে দুই সরু এপিথেলিয়ামের আবরণী। ডায়াফ্রাম যেমন রক্তের শিরা তেমনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভে ভরপুর। একদিকে যেমন শক্ত অন্যদিকে তেমনি ইলাস্টিক হওয়ার দরুন ডায়াফ্রাম থেকে মাপ মত ছিলা কেটে নেওয়া যায়। ছিলা কেটে নেওয়ার ফলে বুক ও পেটের মাঝখানে যে ফুটো তৈরী হয় তাকে সাধারণ ফোঁড় দিয়েই অতি সহজে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পন্ন বিভাগ, হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রচিকিৎসার কিছু উদাহরণ আমরা দিলাম। যে সমস্ত সাফল্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাতে এই ভুল ধারণা হতে পারে যে, ডাক্তারেরা এখন ম্যাজিকের মতো যে কোন হৃৎপিণ্ডের রোগ সারাতে পারে।

অস্ত্রচিকিৎসকেরা এখনও পর্যন্ত জরাজীর্ণ হৃৎপিণ্ডের জায়গায় নতুন শক্ত ও সুস্থ হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দিতে পারেনি বা অস্ত্রোপচার করে সমস্ত হৃদরোগ এখনও সারান যায় না। এখনও পর্যন্ত তিন বছরের ছোট বা ৫০ বছরের বড় রোগীদের উপর অপারেশন করা খুবই বিপজ্জনক। অন্যান্য যে-কোন অসুখের মতই এক্ষেত্রেও অপারেশনের আগে আমাদের

ভেবে দেখে নিতে হয় যে ঐ অপারেশন সহ্য করার মত ক্ষমতা রোগীর আছে কিনা। যদি মনে হয় যে সে ক্ষমতা তার নেই তাহলে অপারেশন না করাই ভাল, কেননা এতে খারাপ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশী।

উপরে যা বলা হল তা হল হৃৎপিন্ডের অস্ত্রচিকিৎসার বর্তমান অবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে এর থেকে আরও কী কিছু আশা করা যায়?

আজকে যা বিজ্ঞানীদের পক্ষে অতি সাহসী স্বপ্ন বা যাকে বলে ফ্যাণ্টাসি, অনেক ক্ষেত্রে পরে তা বাস্তবে পরিণত হতে দেখা যায়। যাতে সেই সব স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় তার জন্য আমরা পশুদের উপর এক্সপেরিমেণ্ট করি।

কয়েক বছর আগেও হাইপোথার্মি ছিল স্বপ্ন বা ফ্যাণ্টাসি, কিন্তু এখন তা বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনি আর একটি উদাহরণ হল রক্ত পরিসঞ্চালন। গত শতাব্দীতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে রক্ত পরিসঞ্চালন ছিল স্বপ্ন, আর আজ কি ব্যাপকভাবেই না রক্ত পরিসঞ্চালন-ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভবিষ্যতে হৃৎপিন্ডের অস্ত্রচিকিৎসা, হৃৎপিন্ডের ভিতরকার নানা রকমের জটিল অসুখের চিকিৎসাতেও নিশ্চয়ই প্রযুক্ত হবে। কিন্তু সে পথে এগোতে হলে, সাময়িকভাবে রোগীর হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে রক্তপ্রবাহের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এমন কোন যন্ত্র বা কোন ডোনারের সুস্থ হৃৎপিন্ডের সাহায্য খুবই দরকার।

এই লক্ষ্যের দিকে এরই মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হয়ে গেছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানী স. স. ব্রুখোনেঙ্কো তিরিশের বছরগুলিতেই এক কৃত্রিম হৃৎপিন্ড (অটোজেক্টর) তৈরী করেন। আমার খুব ভাল করে মনে আছে ১৯৩৫ সালের সেই দিনটির কথা যেদিন লেনিনগ্রাদে ফিজিওলজিস্টদের পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে স. স. ব্রুখোনেঙ্কোর কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক কুকুরের মাথা সকলকে দেখানো হয়। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও মাথাটি বারে বারে চোখ খুলছিল ও নাকে নুন লাগিয়ে দিলে জিব দিয়ে তা চেটে নিচ্ছিল। এই এক্সপেরিমেণ্টটি সারা জগতের ফিজিওলজিস্টদের চমক লাগিয়ে দেয়। কৃত্রিম রক্তপ্রবাহের যন্ত্র ব্যবহার করে এক্সপেরিমেণ্টে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কুকুরের হৃৎপিন্ডকে রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে পৃথক করে সেই রক্তশূন্য হৃৎপিন্ডের উপর জটিল অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে।

এই যন্ত্রের নব্যতম মডেল যা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে, তার সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য মানুষের হৃৎপিন্ডকে তার কাজ থেকে রেহাই দিয়ে ও তার সঙ্কোচনের কাজ বন্ধ করে রেখে, হৃৎপিন্ডের গর্তগুলির ভিতর নানা রকমের জটিল অপারেশন সম্পাদন করা যায়। সেই সব যন্ত্রের মধ্যে যাতে প্রবাহমান রক্ত জমে না যায় তার

জন্য রোগীকে অপারেশনের আগে রক্ত জমে যাওয়া প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন করা হয় (হেপারিন সলিউশন)।

কৃত্রিম রক্তপ্রবাহের যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ করে রেখে তার উপর অপারেশন করা খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু তাসত্ত্বেও এই অপারেশনগুলো এখন হার্ট সার্জারীর অস্ত্রসজ্জার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের ভিতর অপারেশনের সময় খানিকক্ষণের জন্য রুগ্ন হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ রাখার আর এক উপায় দেখান আমেরিকান সার্জেন লিল্লেহেই। তিনি রুগ্ন শিশুর আর্টারি ও ভেন তাঁর বাবার আর্টারি ও ভেনের সাথে যুক্ত করেন। এমনি করে অপারেশনের সময় বাবার বড় হৃৎপিণ্ড একা একসঙ্গে দুই হৃৎপিণ্ডের কাজ চালিয়ে যায়; এই উপায়ের সাহায্যে ১০—২০ মিনিটের জন্য বন্ধ করা ছেলের হৃৎপিণ্ডের ভিতর অনায়াসে অপারেশন করা সম্ভব হয়। আরও এক উপায়ের অনুরূপ কৃত্রিম রক্ত-সংবহন সৃষ্টি করা যায়। সে হচ্ছে উচ্চ চাপে অক্সিজেন স্যাচুরেটেড রক্ত ক্রমাগত এওর্টার মধ্য দিয়ে পরিসঞ্চালন করে বাড়তি রক্ত ভেন থেকে বের করে নিয়ে তাই সংরক্ষণ করা। (১৯৫২ সালে আমিই প্রথম এই উপায়টি অবলম্বনের সুপারিশ করি।)

অদূর ভবিষ্যতে যখন কাজ বন্ধ করা ও রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন করা এক দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তখন জিনিষটা দাঁড়াবে অনেকটা এই রকম: মনে করুন এক শক্ত রুগী, তার হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। সার্জেন রোগীর হৃৎপিণ্ডে রক্ত বওয়া বন্ধ করে কৃত্রিম উপায়ে এক যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত-সংবহন চালাতে লাগলেন। 'শুকনো' রক্তবিহীন হৃৎপিণ্ডের ভিতর অপারেশন চলল। সার্জেন মানব দেহের এই সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গটি কেটে তার ভিতর 'মেরামতের' কাজ করে চললেন। সার্জেনের হেপাজতে রয়েছে নানা সংরক্ষিত টিসু ও প্লাস্টিকের বস্তু, যার সাহায্যে তিনি অনায়াসে বসিয়ে দিচ্ছেন কৃত্রিম ভাল্‌ভ: সেলাই করে দিচ্ছেন অদরকারী ফুটো ও জায়গা মত সরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছেন সরে যাওয়া রক্তের শিরা — সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে রোগীর হৃৎপিণ্ড।

পশুর হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ বদলে দেওয়ার যে এক্সপেরিমেণ্ট চলছে তা এখনও পুরোপুরি সফল হয়নি। কুকুরের বুকে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড বসিয়ে আসলে হৃৎপিণ্ডের বদলে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা হৃৎপিণ্ড দিয়ে কাজ চালাবার যে চমৎকার এক্সপেরিমেণ্টগুলি ভ. প. দেমিখভ দেখিয়েছেন তাতে সাময়িকভাবে কয়েক দিনের জন্য সেই বসান হৃৎপিণ্ড দিয়ে কাজ চালান যায়। কিন্তু তারপর তার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাহলেও এই রকম এক্সপেরিমেণ্ট হৃৎপিণ্ডের প্যাথলজি সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু নতুন জ্ঞান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। এসব এক্সপেরিমেণ্ট ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রচিকিৎসায় নতুন পথের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে।

পশুদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে হৃৎপিণ্ডের রোগ সৃষ্টি করার এক্সপেরিমেন্টগুলি আমাদের অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়েছে। এই সব কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের অসুখ নতুন নতুন সার্জিক্যাল উপায়ে চিকিৎসা করে হৃৎপিণ্ডের সার্জারীকে বর্তমানে আরও অনেক উন্নত করা সম্ভব।

ছোট এক প্রবন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রের জটিলতম বিভাগ — হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রচিকিৎসার সমস্ত তথ্য ও সমস্ত সমস্যা পুরোপুরি বিচার করা অসম্ভব। আমরা এখানে শুধু দেখাতে চেষ্টা করেছি কেমন করে অস্ত্রচিকিৎসকেরা কঠিন হৃদরোগে ভুগছে এমন রোগীদের জীবন বাঁচান ও তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করে চলেছে।

আমরা ভুলিনি যে আমাদের মূল কর্তব্য হল এই সমস্ত রোগ যাতে না হতে পারে তার চেষ্টা করা। সেই রোগ প্রতিরোধের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সব রোগের চিকিৎসা ও অপারেশনের উপায়ও নির্ধারণ করেছি। কোন সন্দেহ নাই যে এতে করে সোভিয়েত সার্জেনেরা সময়মত হৃদরোগের ডাইয়াগ্নোসিস ও তার চিকিৎসা করে এই কষ্টকর ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে উত্তরোত্তর বেশী সংখ্যায় হৃদরোগগ্রস্ত সোভিয়েত বাসীদের কমিউনিস্ট সমাজ গঠনকারীদের মোর্চায় ফিরিয়ে দিতে পারবে।

এ. ই. কান্দেল
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্যান্ডিডেট

মস্তিষ্কের অস্ত্রচিকিৎসা

অস্ত্রচিকিৎসার এখন অতি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে ও তাতে করে এমন সব চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে ২০—৩০ বছর আগে যা কল্পনাও করা যেত না। শরীরের এমন সব অঙ্গের উপর আজকাল অস্ত্রচিকিৎসা চলছে যার উপর আগে কখন হাত দেওয়াই চলত না। আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসার মানচিত্রে সাদা দাগ এখন আর কোথাও নেই বললেই চলে, মানুষের শরীরে এখন আর এমন জায়গা নেই যার উপর ইদানীং কালে অস্ত্রচিকিৎসকের পক্ষে ছুরি চালান সম্ভব নয়। এর অর্থ হল এই যে, আজ ক্রমশই বেশী বেশী রোগ, চিকিৎসা করা যায় না, এইরকম রোগের তালিকা থেকে সেইসব রোগের তালিকায় গিয়ে হাজির হচ্ছে যার সফল অস্ত্রচিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

আজ বহুদিন হল, — কয়েক দশ বছর হবে, — যখন অস্ত্রচিকিৎসা বিজ্ঞান কতগুলি বিশেষ বিশেষ অংশে ভাগ হয়ে যায় — প্রসূতি ও স্ত্রী রোগের অস্ত্রচিকিৎসা, নাক, কান ও গলার রোগের অস্ত্রচিকিৎসা, চোখের রোগের অস্ত্রচিকিৎসা ইত্যাদি। তারপর অস্ত্রচিকিৎসার স্বতন্ত্র শাখার মতো গড়ে ওঠে হাত ও পায়ের অস্ত্রচিকিৎসা (অর্থোপেডি), চোট আঘাত বা থেঁৎলে যাওয়ার চিকিৎসা (ট্রমাটোলজি), এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডের অস্ত্রচিকিৎসা (সার্জিক্যাল এন্ডোক্রিনলজি), মুখ ও চোয়ালের অস্ত্রচিকিৎসা, প্লাস্টিক ও রেস্টোরেটিভ সার্জারী এবং এইরকম আরও কত কি।

কয়েক বছর হল খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করছে শরীরের এক অতি মূল্যবান অংশের অস্ত্রচিকিৎসা, সে হল হৃৎপিন্ড ও তার বড় বড় রক্তের শিরা, ফুসফুস, ইসোফেগাস, মেডিয়াস্টিনাম প্রভৃতি বুকের ভিতরকার অঙ্গগুলির অস্ত্রচিকিৎসা। একে বলে বুক বা থোরাসিক (thoracic) সার্জারী।

'সার্জারী' এই শব্দটি আজ সকলেই বোঝে, কিন্তু 'নিউরোসার্জারী' বলতে কী বোঝায়? নাম থেকেই অবশ্য এর অর্থটা পরিষ্কার হয়ে আসে — এ হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান নার্ভাস সিস্টেমের রোগে অস্ত্রচিকিৎসার সমস্যা সম্বন্ধে বিচার করে। বিচার করে মস্তিষ্ক, স্পাইন্যাল কর্ড, ভেজিটেটিভ ও পেরিফেরাল নার্ভের অস্ত্রচিকিৎসার খুঁটিনাটি।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাধারণত বলা হয় যে নিউরোসার্জারী নতুন বিজ্ঞান, মাত্র ৪০—৫০ বছর হল সাধারণ সার্জারী থেকে আলাদা হয়ে বিশেষ নাম গ্রহণ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক স্বাধীন বিভাগে পরিণত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর সুরুতে সার্জেনদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন দিকপাল মাঝে মাঝে মস্তিষ্কে হাত দিতে সাহস করেন।

কিন্তু বহু প্রাচীন কালেও এমন কতগুলি অপারেশন করা হত যাকে এখন নিউরোসার্জারীর গন্ডির মধ্যে ফেলা যায়। প্রায় ২,০০০ বছর আগে হিপক্রাটিসের লেখা, 'মাথার আঘাত' নামে এক রচনায় মাথার খুলি ট্রিফাইন করার বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৯ সালে প্রাচীন স্লাভ শহর 'বেলায়া ভেজায়' প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ১০—১১ শতাব্দীতে কিয়েভের রুশের যুগে নাম না জানা চিকিৎসকেরাও মাথার খুলি ট্রিফাইন করতে সাহস করত। অবশ্য মাথার আঘাতে অস্ত্রচিকিৎসার এই সব প্রথম প্রচেষ্টার তুলনায় আজকের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নিউরোসার্জারীর তফাৎটা ঠিক ততখানি যতখানি তফাৎ সেই প্রথম বেলুন আর জেট বিমানের মধ্যে।

নিউরোসার্জারী কবে থেকে সুরু হয়েছে তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়ায় প্রথম ফৌজী হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতির মধ্যে মাথার খুলি ট্রিফাইন করার যন্ত্রপাতিও ছিল।

প্রায় দুশো বছর আগেও রুশী অস্ত্রচিকিৎসকদের এতখানি জ্ঞান ছিল যে তাঁরা সাংঘাতিক মস্তিষ্কের আঘাতও এক এক সময় সারিয়ে ফেলতে পারতেন। নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি — তার সাক্ষ্য দেবে।

১৭৭৪ সালে মহান রুশী সেনাপতি ম. ই. কুতুজভ, তখন যুবক অফিসার, আলুশ্‌তার যুদ্ধে তিনি মস্তকে গুলি বিদ্ধ হন। গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে চলে যায়। তার ১৪ বছর পর ১৭৮৮ সালে ওচাকভের দুর্গ অবরোধ কালে কুতুজভ দ্বিতীয় বার মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান। তার চিকিৎসা করেন তখনকার স্বনামধন্য অস্ত্রচিকিৎসক, মস্কো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ন. ই. পিরগভের শিক্ষক ইয়ে. ও. মুখিন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান যদিও তখন সেরকম উন্নত ছিল না, তাহলেও ইয়ে. ও. মুখিন শুধু যে ম. ই. কুতুজভের প্রাণ রক্ষা করতেই সমর্থ হন তাই নয়, তাঁর স্বাস্থ্য ও সামরিক প্রতিভাও যে রক্ষা পায় তার প্রমাণ আমরা পাই ১৮১২ সালের মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ থেকে, যে সময় তাঁর প্রতিভা এত পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক নিউরোসার্জারীর বনিয়াদ পেতেছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ক্লিনিসিস্ট, রুশী অস্ত্রচিকিৎসার পিতা ন. ই. পিরগভ। 'যুদ্ধ ময়দানে সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসার

মূলকথা' এই নামে তিনি যে বিখ্যাত বই লেখেন তাতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন রকমের চোট ও তার চিকিৎসার উপায় লিপিবদ্ধ করা আছে। আঘাতের ফলে মস্তিষ্কে যে স্ফীতি হয় তার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত বিশ্লেষণ দেন ন. ই. পিরগভ অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁর নিজস্ব বিরাট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। যদিও তারপর চিকিৎসা বিজ্ঞান ঢের উন্নতিলাভ করেছে, কিন্তু তাহলেও তাঁর সেই তত্ত্ব আজও পর্যন্ত তাৎপর্য হারায়নি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও ক্লিনিসিস্ট, আকাদেমিশিয়ন ভ. ম. বেখতেরেভই ১৮৯৮ সালে সামরিক চিকিৎসা আকাদমীর নার্ভ ক্লিনিকে সর্বপ্রথম নিউরোসার্জারীর আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই বিভাগটি তখন বেশী দিন টিকতে পারেনি। অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার যখন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সীমাহীন সুবিধা দান করেন কেবল মাত্র তখনই মস্কোতে ন. ন. বুর্দেঙ্কো ও লেনিনগ্রাদে আ. ল. পলেনভের নেতৃত্বে সেই শক্ত বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ সৃষ্টি হয়, যাকে ভিত্তি করে সোভিয়েত নিউরোসার্জারীর ইমারৎ গড়ে উঠেছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিউরোসার্জারী গড়ে তোলা ও প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব নিকোলাই নিলভিচ বুর্দেঙ্কোরই প্রাপ্য। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃত নেতা। তিনি একদিকে যেমন সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক ও ক্লিনিসিস্ট ছিলেন, অন্য দিকে ছিলেন তেমনি সুদক্ষ এক্সপেরিমেণ্টকারক ও ফিজিওলজিস্ট।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় সোভিয়েত নিউরোসার্জেনদের কঠোর পরীক্ষা গেছে। মাথায় ও শিরদাঁড়ায় চোট লাগা হাজার হাজার কেস, হাজার হাজার জটিলতম অপারেশন… সেই সব অবিস্মরণীয় দিনের কথা স্মরণ করে আমরা আজ গর্বের সাথে বলতে পারি যে সোভিয়েত নিউরোসার্জারী যুদ্ধের কঠোর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, সঞ্চয় করেছে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। কত হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্য ও জীবন যে নিউরোসার্জেনরা ফিরিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নিউরোসার্জারীর জন্মের জন্য প্রয়োজন হয় বহু বছরের কত কঠোর সৃষ্টিশীল পরিশ্রম, কত সূক্ষ্ম ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন। এর জন্য প্রয়োজন হয় সামগ্রিকভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরাট উন্নতি যাতে উন্নত নিউরোপ্যাথলজি, সাধারণ সার্জারী, ফিজিওলজি, রেডিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক টেকনিকের সাফল্যের ভিত্তিতে জন্ম নিয়ে নিউরোসার্জারী দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিভাগটির জটিলতার বিশেষ কারণ হল এই যে, এই বিজ্ঞান মূলত মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাধারার অঙ্গ -- মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করে থাকে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে মানুষ আজ কত জটিল যন্ত্র উদ্ভব করতে পেরেছে — জেট বিমান ও ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপ, অতিকায় টার্বাইন ও হিসাব বিশ্লেষণ

যন্ত্র। কিন্তু সে যন্ত্র যতই জটিল ও উন্নত হোক না কেন, মানুষের শ্রমে তৈরী যে কোন মেশিন পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও সংগঠিত বস্তু — মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ঢের কম জটিল।

স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেম হল 'এক বর্ণনাতীত জটিল ও কল্পনাতীত সূক্ষ্ম যন্ত্র যার মাধ্যমে অসংখ্য বন্ধনে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশ পরস্পর পরস্পরের সাথে একই দেহে ও এক সিস্টেমে যুক্ত। দেহের এই জটিলতম যন্ত্রটির উপর প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে দেহের বাইরের অসংখ্য প্রভাব।' মহান রুশী ফিজিওলজিস্ট ই. প. পাভলভ মস্তিষ্ককে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন।

মস্তিষ্কের গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আধুনিক নিউরোসার্জারীর সাফল্যের বিবরণ দেওয়ার আগে মানবজাতির মস্তিষ্কের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে কিছু মূল তথ্যের কথা বলা দরকার। মস্তিষ্কের কাজ বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার প্রবন্ধ ও বই বেরিয়েছে। কিন্তু তা হলেও, অর্থাৎ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মস্তিষ্কের সমস্ত জটিল নিয়মাবলী ও দেহের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্ত খুঁটিনাটি পুরোপুরিভাবে জানতে এখনও বহু বছর লাগবে। আকাদেমিশিয়ন ই. প. পাভলভ বলেন, 'মস্তিষ্ক হল এক মস্ত বড় বিষয়বস্তু, এর এনাটমি ও ফিজিওলজি জানতে অনুসন্ধানকারীদের এক পুরুষে কুলোবে না, বহুযুগ লেগে যাবে...'

মস্তিষ্ক হচ্ছে এক গোলাকৃতি বস্তু, তার রং ধূসর হলদে, এবং এই বস্তুটি এমনিতে নরম হলেও ইলাস্টিক। মস্তিষ্ক নরম এই কারণে যে তার মধ্যে জলের পরিমাণ খুব বেশী। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে মস্তিষ্কের মধ্যেও রক্তের মতই জলের পরিমাণ প্রায় ৮০%। কিন্তু যেহেতু শুধু যে স্নায়ু কোষ দ্বারাই মস্তিষ্ক তৈরী হয় তা নয়, তার কাঠামো হিসাবে আরও এক রকমের বিশেষ প্রকৃতির শক্ত টিসু তাতে থাকে, যাকে বলা হয় নিউরোগ্লিয়াল টিসু, সেই কারণে মস্তিষ্ক বিশেষ আকৃতিসম্পন্ন ও তার ইলাস্টিসিটিও খুবই বেশী।

মানুষের মস্তিষ্কের ওজন সংক্রান্ত প্রশ্নের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সে সম্বন্ধে একটু বিষদভাবেই বলা দরকার। প্রাপ্ত বয়সে মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ১,১০০ গ্রাম থেকে ২,০০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ওজন গড়ে ১,৩৭৫ গ্রাম ও মেয়েদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ওজন গড়ে ১,২৫০ গ্রাম।

গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই রকম একটা ধারণা ছিল যে মানুষের মস্তিষ্কের ওজন অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে বেশী এবং এই কারণেই মানুষের বুদ্ধি

সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে এ ধারণা ভুল। পরে দেখা যায় যে কোন কোন অতিকায় জন্তুর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ওজনে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাতীর মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় ৫ কিলোগ্রাম আর তিমি মাছের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ৩ কিলোগ্রাম।

তারপর থেকে খাঁটি ওজনের দিকে নজর না দিয়ে নজর দেওয়া হয় মানুষের মস্তিষ্কের তুলনামূলক ওজনের দিকে। অর্থাৎ নজর দেওয়া হয় তার দিকে যে সমস্ত শরীরের ওজনের তুলনায় মস্তিষ্কের ওজন কত। কিন্তু তারপর দেখা গেল যে তুলনামূলক ওজন হিসাব করলেও মানুষের মস্তিষ্ক প্রাণিজগতে প্রথম স্থান অধিকার করে না। কোন কোন নিম্নতর জাতের বানর বা গান করতে পারে এমন ছোট ছোট পাখীর মস্তিষ্কের তুলনামূলক ওজন মানুষের চেয়ে বেশী।

গত শতাব্দীর অনেক বিজ্ঞানী আবার মানুষের মস্তিষ্কের ওজনের উপর বড় বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা বলতেন যে মানুষের মস্তিষ্কের ওজন যত বেশী সে মানুষের বুদ্ধিও তত বেশী। কিন্তু অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে এ ধারণাও ভুল। অনেক মনীষীর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মস্তিষ্কের ওজনের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য। কোন ক্ষেত্রে ওজন খুব বেশী, আবার কোন ক্ষেত্রে এমনকি স্বাভাবিক ওজন যা হওয়া উচিত তার চেয়েও কম। আজ পর্যন্ত যত মস্তিষ্ক ওজন করে দেখা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ওজনের ছিল এক বুদ্ধিহীন এপিলেপ্টিকের মস্তিষ্ক (২,৮৫০ গ্রাম)।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আজ এই জিনিষটা নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, মানুষের মানসিক উন্নতি ও বুদ্ধিশক্তি তার মস্তিষ্কের ওজনের উপর নির্ভর করে না। মনে হয় যে মস্তিষ্কের ঐ সব গুণাবলী নির্ভর করে তার টিস্যুর সূক্ষ্ম গঠনের উৎকর্ষের উপর, — বিজ্ঞানী মর্ফোলজিস্টরা যাকে 'মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম আর্কিটেকচার' নামে অভিহিত করে থাকেন।

মস্তিষ্কের গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় আবার ফিরে আসা যাক।

মস্তিষ্কের কতগুলি মূল অংশ আছে যা আকৃতি ও পরিমাপে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইরকম মূল অংশ তিনটি। এক নম্বর হল মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ, দুই দিকের দুই বড় গোলার্ধ, যাকে একত্রে বলা হয় 'বৃহত্তর মস্তিষ্ক' (greater brain)। এই দুই গোলার্ধ একে অন্য থেকে এক গভীর সরু ফাঁক দিয়ে বিভক্ত। বৃহত্তর মস্তিষ্কের নীচে মস্তিষ্কের পিছনের অংশে দেখা যায় আরও দুটি গোলার্ধ। প্রথম গোলার্ধ দুটির তুলনায় তারা ঢের ছোট। মাপে মুর্গীর ডিমের মতো। এর নাম 'ক্ষুদ্রতর মস্তিষ্ক' (lesser brain) বা সেরিবেলাম (cerebellum)। শেষ বা তৃতীয় মূল অংশটি হল বৃহত্তর গোলার্ধ ও সেরিবেলাম উভয়ের নীচে অবস্থিত মস্তিষ্কের নীচেকার লম্বাটে অংশ যাকে বলা হয় মস্তিষ্কের মেডালা (medulla)। মেডালার পেছনের অংশ মাথার খুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি স্পাইন্যাল কর্ড বা মেরুদণ্ডের

মস্তিষ্কে পর্যবসিত হয়। স্পাইন্যাল কর্ড মেরুদন্ডী কেনালে অবস্থিত ও লম্বায় প্রায় গোটা কেনালটারই সমান।

মস্তিষ্ককে ওপর ওপর দেখলেই মস্তিষ্কের এই তিনটি মূল অংশকে পরিষ্কার ধরতে পারা যায়। কিন্তু মনোযোগ সহকারে দেখলে মস্তিষ্কের আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ চোখে পড়ে ও বিশেষ করে চোখে পড়ে গোটা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য তার জটিল আকৃতি: তার কনভলিউশন বা ঢেউ খেলান ভাব, মাঝে মাঝে ফাঁক, কোন কোন জায়গা উঁচু হয়ে রয়েছে, কোন জায়গা ঢালু, কোন জায়গায় বা ছিদ্র। মস্তিষ্কের নীচের অংশ, যাকে তার ভিত বলে অভিহিত করা হয়, সেখান থেকে বেরোয় মোটা শাদা সুতোর মতো বারো জোড়া স্নায়ু।

মস্তিষ্কের এই রকম প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম অংশ বেশ ভাল করে অধ্যয়ন করা হয়েছে ও তাদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নামের বেশীর ভাগ নাম রেখেছিলেন পুরাকালের বা মধ্য যুগের বিজ্ঞানীরা। মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ এখনও ঐসব বিজ্ঞানীদের নাম বহন করে আসছে, যেমন ভরলিয়েভের পুল, সিলভিয়েভের জলের পাইপ, রোলান্ডভের সেপ্টাম (septum), গালেনের ভেন প্রভৃতি।

মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলির নামকরণ করতে গিয়ে আগেকার এনাটমিস্টরা তাঁদের কল্পনা প্রবণতা ও উদ্ভাবনী শক্তির অনেক পরিচয় দিয়েছেন। যদি ল্যাটিন ভাষার এই সব নাম অনুবাদ করা যায়, তাহলে এদের মধ্যে পাওয়া যাবে এই রকম সব শব্দ: 'টিপি', 'জলপাই', 'থাম', 'পাল', 'সুতোর ফাঁস', 'আবরণী', 'গাঁঠ', 'বর্ষাতী', 'বেড়া', 'চোঙ', 'ঠোঁট', 'কেঁচো', 'ঝালি', 'বল্টু', 'তালার কব্জা' প্রভৃতি। এছাড়াও 'সিন্ধুঘোটক', 'ডেভিডের বীণা', 'পালকের কলম,' 'ফ্যাকাসে গোলক', 'জীবন তরু', 'কুক্কুটের পদের কঠিন উদগত অংশ', এইরকম সব আরও বিচিত্র কত কি শব্দ।

গত কয়েক দশ বছরে বিজ্ঞানী মর্ফলজিস্টদের কয়েকটি পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন বা ই. প. পাভলভের ভাষায় — ব্রেনের কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপিক গঠন সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করা গেছে।

নিউরোসার্জারীর অগ্রগতির পক্ষে এই সব জিনিষ স্বভাবতই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মস্তিষ্কের উপর অপারেশন করতে হলে আজ পর্যন্ত মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যাকিছু জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছে তার সবকিছু গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। বিশেষ করে জ্ঞান অর্জন করা দরকার বৃহত্তর গোলার্ধদ্বয়ের কর্টেক্সের গঠন সম্বন্ধে। কর্টেক্সই হল মস্তিষ্কের সবচেয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য অংশ। এখানে কথা চলছে অবশ্য মস্তিষ্ক পদার্থের সেই ধূসর রঙের অগভীর স্তরটি সম্বন্ধে যা মস্তিষ্কের বৃহত্তর গোলার্ধ দুটির সমস্ত উপরিভাগ আবৃত করে রাখে। পাতলা পাতলা অথচ গভীর কতগুলি ভাঁজ (septum) মস্তিষ্কের

কর্টেক্সকে নানা মাপের ও নানান আকৃতির কতগুলি ভাগে বিভক্ত করে। এদের বলে জাইরাস (gyrus)। জাইরাসগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব নাম আছে।

বিভিন্ন প্রাণীর মস্তিষ্ক তুলনা করলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, বিবর্তনের দিক থেকে যে প্রাণীর স্থান যত উঁচুতে প্রধানত সেই প্রাণীর বৃহত্তর গোলার্ধ দুটি ও তার আবরণী, কর্টেক্স, তত বেশী বিস্তৃত ও জটিলাকৃতি। মস্তিষ্ক কর্টেক্সের পরিমাপ ও মস্তিষ্কের ঢেউ খেলান জাইরাসের সংখ্যা মানুষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী।

মস্তিষ্ক কর্টেক্স তিনটি বিভিন্ন রকমের আবরণী দিয়ে ঢাকা (রক্তের শিরা বহুল আবরণী, মাকড়সার জালের মতো আবরণী ও শক্ত আবরণী) অবস্থায় মাথার খুলির সেই শক্ত অনমনীয় হাড়গুলির গায়ে একেবারে লেগে থাকে। বিবর্তনের ফলে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের সার্ফেসের পরিমাপ এত বেড়েছে যে মাথার খুলির ভিতরকার সার্ফেসের আয়তনের তুলনায় তা ঢের বেশী ও তাতে সোজাসুজিভাবে তা ধরা সম্ভব নয়। এই কারণেই কর্টেক্স ঢেউখেলান ও তাতে তৈরী হয় বহু সংখ্যক জাইরাস বা কনভলিউশন (convolution)।

মানুষের মস্তিষ্ক কর্টেক্স আজ বিবর্তনের সর্বোচ্চ স্তরে পেঁাছেছে। মস্তিষ্কের উপরি ভাগে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের মাত্র এক তৃতীয়াংশ আমরা উপর থেকে দেখতে পাই, বাকি দুই তৃতীয়াংশ লুকিয়ে থাকে তার গভীর ভাঁজগুলির মধ্যে, জাইরাসের ফাঁকে।

মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম গঠন পরীক্ষা করলে তার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য যা চোখে না পড়ে পারে না সে হল কর্টেক্সের অসংখ্য রকমারি কোষ।

মানুষের মস্তিষ্ক কর্টেক্সে প্রায় ১,৪০০ কোটি নার্ভ কোষ থাকে! কর্টেক্সের মাত্র এক কিউবিক মিলিমিটার পদার্থে পাওয়া যায় প্রায় ৩০ হাজার ঐ রকম কোষ। এই সব কোটি কোটি নার্ভ কোষ যেমন পরস্পরের সাথে তেমনি দেহের অন্যান্য সমস্ত টিসু ও অঙ্গের সাথে অসংখ্য নার্ভ ফাইবার (fibre) দিয়ে যুক্ত। যদি কল্পনা করা যায় যে ঐ সব কোষের প্রত্যেকটি নিজস্ব শাখা প্রশাখা যুক্ত লেজুড়ের সাহায্যে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের যে-কোন কোষের সাথে কাজের সম্বন্ধ স্থাপন করে (এ কল্পনাটি খুব সম্ভব সত্যি) তাহলে পর তাদের সেই সব যোগাযোগের পথগুলির সংখ্যা একত্রে এক কল্পনাতীত পরিসংখ্যা ধারণ করে। এর থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের মস্তিষ্ক সত্যিই কী বিরাট ও অসীম শক্তিসম্পন্ন।

মস্তিষ্ককে ক ভাগে ভাগ করা যায়? — এ রকম প্রশ্ন করলে সত্যিই তা খানিকটা অদ্ভুত শোনায়। বলা বাহুল্য যে প্রশ্নটা এখানে তোলা হচ্ছে মরা মানুষের মস্তিষ্ক অনুসন্ধান প্রসঙ্গে। মস্কোর ব্রেন ইনস্টিটিউটে মাইক্রোস্কোপের তলায় কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের গঠন পরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি মস্তিষ্ককে ৩০ হাজার ফালিতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ফালি দেখতে সিগারেট জড়ানোর কাগজের চেয়ে ঢের পাতলা। এই রকম ফালি কাটতে হলে এক রকম বিশেষ যন্ত্রের দরকার হয় যাকে বলে মাইক্রোটোম। বিজ্ঞানীরা এই রকম পাতলা পাতলা প্রত্যেকটি

ফালি বা সেকসনকে মাইক্রোস্কোপের তলায় রেখে ভাল করে পরীক্ষা করেন, বিশ্লেষণ করেন, নার্ভ কোষ, নার্ভ ফাইবার ও ক্যাপিলারির জটিলতম পারস্পরিক ওতপ্রোত সম্বন্ধ।

বিজ্ঞানীরা কাল্পনিকভাবে মস্তিষ্ক কর্টেক্সকে ২০০টি আলাদা আলাদা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভাগ করে থাকেন। এর প্রত্যেকটির নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। নার্ভ কোষের সংখ্যা, আকৃতি ও অবস্থিতির দিক থেকে এই সব ক্ষেত্র পরস্পর পরস্পরের থেকে বিভিন্ন। বৃথাই ই. প. প্যাভলভ মস্তিষ্ককে 'গ্রাণ্ড মোজেইক' নামে অভিহিত করেননি। পাভলভ প্রমাণ করেছেন যে, মস্তিষ্ক কর্টেক্স থেকেই কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স (conditional reflex) তৈরী হয় যা দেহকে সতত পরিবর্তনশীল বাইরের অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। পাভলভের মতে মস্তিষ্ক কর্টেক্স হল 'এনালাইজারের সমষ্টী' যা দেহের ভিতরকার ও বাইরের জগতের সমস্ত স্টিমুলাসকে গ্রহণ করে তার 'উন্নততর এনালিসিস ও সিন্থেসিস' করে থাকে।

মস্তিষ্ক কর্টেক্সের সব অংশের কাজই যে এক রকম তা নয়।

নিউরোসার্জারীর পক্ষে এ তথ্য খুবই মূল্যবান। কর্টেক্সের আলাদা আলাদা অংশ — দৃষ্টি, শ্রুতি, অনুভূতি বা দেহের চলন শক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের কাজে সোজাসুজি নিযুক্ত।

দেহের নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সোজাসুজি যুক্ত ও সেই কারণে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলির অবস্থিতি নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই সমস্ত অংশকে ই. প. পাভলভ এনালাইজারের 'নিউক্লিয়াস' নামে অভিহিত করেছেন। মস্তিষ্ক কর্টেক্সের এই রকম এনালাইজারের নিউক্লিয়াস যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তা হলে পর, হয় দৃষ্টিশক্তি না হয় চামড়ার অনুভূতি, না হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলন শক্তি প্রভৃতি দেহের কোন না কোন ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হবেই হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠা খুবই ন্যায়সঙ্গত যে মস্তিষ্কের দুটি বৃহত্তর গোলার্ধের মধ্যে কাজের কোন পার্থক্য আছে কিনা। বাইরে থেকে ডান ও বাম গোলার্ধ শরীরের ডান ও বাঁ হাতের মতো দেখতে একই রকম। কিন্তু তাহলেও মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধকে 'ডমিনেণ্টিং' বা বেশী মূল্যবান, বেশী প্রয়োজনীয় বলে নির্ধারিত করা হয়।

ডানের উপর বাম গোলার্ধের 'শ্রেষ্ঠত্ব' কোথায়? প্রথমত, বাম গোলার্ধেই থাকে কথা বলার কেন্দ্র। যদি বাম ফ্রণ্টাল লোবের (frontal lobe) কর্টেক্সের পেছনের অংশ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোগীর বাক্ শক্তি লোপ পায় অর্থাৎ তার শব্দ বা বাক্যাংশ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। যদি বাম টেম্পোরাল লোবের (temporal lobe) কর্টেক্স নষ্ট হয় তাহলে তার শব্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ পায়, অর্থাৎ যে সমস্ত কথা বা বাক্যাংশ সে শোনে তা বুঝবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বক্ শক্তি, যাকে ই. প. পাভলভ 'দ্বিতীয় সিগন্যাল

সিস্টেম' নামে অভিহিত করেছেন, যে শক্তি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই তা বাম গোলার্ধের কর্টেক্সের সংগঠনের উপরই সোজাসুজি নির্ভরশীল।

এই গোলার্ধে বাক্ শক্তি কেন্দ্রের অনতিদূরে থাকে আরও কয়েকটি উচ্চ কর্টেক্স ক্রিয়ার কেন্দ্র। তার উপর নির্ভর করে মানুষের লেখা, পড়া বা হিসাব করার ক্ষমতা। বাক্ শক্তির মতই ঐ সব শক্তি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই।

বাম গোলার্ধ মানুষের ডান অঙ্গের চলন শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকের সবচেয়ে সচল অঙ্গ, ডান হাতের পরিচালক হল বাম গোলার্ধ। যে সব লোকের বাম অঙ্গে জোর বেশী তাদের বাক্ শক্তি ও আরও অন্যান্য উন্নত উচ্চ ক্রিয়ার কেন্দ্র কিন্তু বাম গোলার্ধের পরিবর্তে ডান গোলার্ধে অবস্থান করে।

অন্যান্য অনেক মূল্যবান কাজের কেন্দ্র বা এনালাইজার নিউক্লিয়াস উভয় বৃহত্তর গোলার্ধের কর্টেক্সে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। আমরা আগেই বলেছি উভয় গোলার্ধের ফ্রন্টাল লোবের পিছনে থাকে চলন শক্তি কেন্দ্র বা চলন শক্তির এনালাইজার নিউক্লিয়াস। প্যারাইট্যাল লোবের (paraital lobe) সামনের দিকে থাকে অনুভূতি কেন্দ্র — বেদনা, উত্তাপ, স্পর্শ প্রভৃতি আরও অনেক জটিল প্রকৃতির বাইরের স্টিমুলাস অনুভবের কেন্দ্র।

কর্টেক্সের অক্সিপিটাল (occipital) অংশে থাকে দৃষ্টিশক্তির এনালাইজার নিউক্লিয়াস। এই অংশের মস্তিষ্ক কর্টেক্স বাইরের জগতের ছবি গ্রহণ করে থাকে। টেম্পোরাল লোবে থাকে শ্রুতির কেন্দ্র। ঘ্রাণের কেন্দ্র অবস্থিত গোলার্ধ দুটির ভিতরের সার্ফেসে। ব্রেন স্টেম (brain stem) ও সাবকর্টিক্যাল (subcortical) অঞ্চলে থাকে হৃৎপিণ্ড, রক্তের শিরা, শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীরের উত্তাপ ও দেহের মেটাবলিজম প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র যা বিবর্তনের দিক থেকে সবচেয়ে পুরন এবং মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

'সেরিবেলাম' আমাদের চলনের সূক্ষ্ম ও জটিল কাজগুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেরিবেলামের গোলার্ধ দুটি নিয়ন্ত্রণ করে চলনের ভেতরকার কোঅর্ডিনেশন বা সমন্বয়ের কাজটি আর তার মাঝের অংশটির [যাকে বলা হয় সেরিবেলাম ভার্মিকুলারিস (cerebellum vermicularis)] কাজ হল মানুষের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা।

মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট অংশ কোন কাজ করে থাকে, যার সম্বন্ধে এখানে খুবই সংক্ষেপে বলা হল, তা বিষদভাবে জানা নিউরোসার্জেনের পক্ষে ভীষণ দরকার। অপারেশনের সময় যদি কখন মস্তিষ্কের টিসু কাটতে হয় তাহলে পর মস্তিষ্ক কর্টেক্সের যে কোন জায়গাতে আন্দাজে ছুরি চালান চলে না। কাটবার সময় সার্জেন সর্বদা চেষ্টা করেন সেই সমস্ত কেন্দ্র বাঁচাতে যারা দেহের মূল্যবান ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ন. ন. বুর্দেঙ্কোর ইনস্টিটিউট

গোর্কি স্ট্রিটে সবসময়ই লোকের ভীড়, কোলাহলও সেখানে কম নয়; তার সাথে এসে মিশেছে একটা নির্জন শান্ত রাস্তা — পুরন দিনের নাম তার — 'ত্ভেরস্কায়া-ইয়ামস্কায়া'। শেষোক্ত রাস্তাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মস্ত লম্বা দালান, সামনে সাইনবোর্ড টাঙ্গান; তাতে সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আকাদেমিশিয়ন ন. ন. বুর্দেঙ্কোর নিউরোসার্জারী ইনস্টিটিউট'; সোনালী অক্ষরের পাশে আঁকা 'শ্রমের লাল ঝাণ্ডা' অর্ডারের পতাকা। ইনস্টিটিউটের যখন ২০ বছর পূর্ণ হয় তখন সোভিয়েত স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ঐ ইনস্টিটিউটকে এই অর্ডারে ভূষিত করা হয়।

বাগানের রেলিঙের ঠিক পাশেই রয়েছে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর বুর্দেঙ্কোর এক ধূসর গ্রানাইটের মূর্তি।

১৯২৯ সালে ন. ন. বুর্দেঙ্কো ও বিখ্যাত নিউরোপ্যাথলজিস্ট ভ. ভ. কারমের এখানে নিউরোসার্জারীর একটি ছোট বিভাগ খোলেন। ১৯৩৪ সালে তা বড় হয়ে ইনস্টিটিউটে পরিণত হয় এবং আজ তা পৃথিবীখ্যাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব বৃহৎ নিউরোসার্জারীর গবেষণাগার ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

মস্কোর এই নিউরোসার্জারীর ইনস্টিটিউটটি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর এক অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট ইনস্টিটিউট, সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গর্বের বস্তু। এই ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন বিখ্যাত সোভিয়েত নিউরোসার্জেন প্রফেসর ব. গ. ইয়েগোরভ, ল. আ. করেইশা, আ. আ. আরেন্দ ও আরও অনেকে। এতে আছে ৬টা চিকিৎসা বিভাগ ও বহু লেবরেটারি, এর যন্ত্রপাতি ও সাজসজ্জা খুবই ভাল এবং অতি আধুনিক। এই ইনস্টিটিউটে দৈনিক ৭—৮টি করে মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের জটিল অপারেশন হয়।

ইনস্টিটিউটে রয়েছে গবেষণা রত বৈজ্ঞানিকদের এক মস্ত বড় দল যারা নিউরোসার্জারীর নানা প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডে টিউমারের ডাইয়াগ্নোসিস ও তার চিকিৎসার উপায়; মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের আঘাত বা তার শিরা উপশিরার রোগের চিকিৎসা, অপারেশনের পরবর্তীকালীন জটিলতা নিবারণের উপায় নির্ধারণ, রেডিওএকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার, মানুষের মস্তিষ্ক উদ্ভূত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অধ্যয়ন প্রভৃতি নানা সমস্যা নিয়ে তাঁরা গবেষণা করছেন।

গত কয়েক বছরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে এবং ভারতবর্ষ, ইতালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড এবং আরও অন্যান্য দেশ থেকে বহু বিজ্ঞানী মস্কোর নিউরোসার্জারী ইনস্টিটিউটের কাজ দেখতে এসেছেন। সোভিয়েত নিউরোসার্জারীর সাফল্যকে বিদেশী বিজ্ঞানীরা উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন।

আপনাকে নিয়ে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগে, অপারেশন থিয়েটারে ও লেবরেটারিগুলিতে যদি একটা ছোটখাট এক্সকার্শন করে ফেলি তা হলে আপনার আধুনিক নিউরোসার্জারী সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা জন্মে যাবে। আপনি জানতে পারবেন তার সাফল্য ও অগ্রগতি, জানতে পারবেন সেই সব সমস্যা যা নিয়ে এখনও অনেক কাজ করে যেতে হবে।

নিউরোসার্জারীর ব্যবহারিক তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হলে প্রথমে জানা দরকার কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের কোন কোন রোগে অপারেশন করা হয়। এই রকম রোগের সংখ্যা অবশ্য প্রচুর, কিন্তু এখানে আমরা তার ভিতর থেকে মূল কয়েকটি অসুখের কথা নিয়ে বিচার করব।

মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের টিউমার — অসুখটি খুবই বিরল, কিন্তু তা হলেও একবার যদি ধরা পড়ে তাহলে নিউরোসার্জারীর উপায়ে তাকে অপারেশন না করে উপায় নেই। বরং যত তাড়াতাড়ি সে অপারেশন করা যায় ততই মঙ্গল।

মস্তিষ্কে নানা রকমের টিউমার হয়। অপারেশন করে তাতে কী ফল হবে তা প্রধানত নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর। প্রথমত, মস্তিষ্কের কোন অংশে টিউমার হয়েছে; দ্বিতীয়ত, সে টিউমারের প্রকৃতি কী — অর্থাৎ সেটা নিরীহ টিউমার না ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার।

মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের প্রায় সমস্ত নিরীহ টিউমার, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, অপারেশন করে তাকে বাদ দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত মস্তিষ্কের সমস্ত রকমের টিউমার সম্পূর্ণভাবে কেটে বের করে নিয়ে আসার উপায় বের করা যায়নি। তাসত্ত্বেও অনেক সময় দেখা যায় যে টিউমারের একটা অংশ কেটে বাদ দেওয়ার পর রোগীর যেমন অবস্থার সমূহ উন্নতি হয় তেমনি আয়ুও অনেক বেড়ে যায়।

নিউরোসার্জারীর আর এক মূল্যবান বিভাগ হল মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ড ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুর আঘাত চিকিৎসা। এইরকম আঘাতের কেস বেশী পাওয়া যায় যুদ্ধের সময় কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া সাধারণ সময়ও তা যে না দেখা যায় তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের ইনফ্লামেণ্টারী রোগেও নিউরোসার্জারীর প্রয়োজন হয়।

কয়েক বছর হল নিউরোসার্জারীর আরও একটি বিভাগের জোর উন্নতি হয়েছে এবং অস্ত্রোপচার করে তাতে খুবই ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। সে হল নার্ভাস সিস্টেমের শিরা উপশিরার রোগের চিকিৎসা। বিশেষ করে মস্তিষ্কের শিরার এনিউরিজম বা উচ্চ রক্তের চাপ জনিত মস্তিষ্কে রক্তপাতের চিকিৎসা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিরার নানা রকম অসুখে ও ট্রফিক আল্সার কেসে ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের উপর অপারেশন করে অনেক সময় খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়।

নিউরোসার্জারীর সমস্যাগুলির মধ্যে বড় স্থান দখল করে আছে ট্রাইজেমিন্যাল নার্ভের (trigeminal nerve) নিউরালজিয়া বা ঐ জাতীয় অন্যান্য রোগ যা মানুষকে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়।

দুই একটা রোগের কথা যা এখানে বলা হল তাতে করে পুরোপুরি চিত্র না পাওয়া গেলেও একটা জিনিষ বোঝা যায় যে নিউরোসার্জারীর সামনে আজ উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রান্তর। মানুষের দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভের মহান সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিউরোসার্জারীর ভবিষ্যৎ উন্নতি খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ।

আধুনিক নিউরোসার্জারীর ক্ষেত্রে অস্ত্রচিকিৎসাই মূল তবে এটাই চিকিৎসার একমাত্র হাতিয়ার নয়। অপারেশনের ফল যাতে ভাল হয় তার জন্য রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা ও রেডিওথেরাপির মূল্যও কম নয়। (মস্তিষ্কের টিউমার রঞ্জনরশ্মি, রেডিয়াম ও রেডিওএকটিভ আইসোটোপ দিয়েও চিকিৎসা করা হয়), নানা রকমের ওষুধ, ভিটামিন, এণ্টিবায়োটিক, মালিশ, ফিজিওথেরাপি, চিকিৎসামূলক ব্যায়াম — এসবেরও যথেষ্ট মূল্য আছে নিউরোসার্জারীতে।

বিরল হলেও মস্তিষ্কে টিউবারকুলোমা নামে টিউবারকুলোসিসের এক রকম টিউমার হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বলা দরকার যে এই টিউমার বিশেষ করে হয় শিশুদের মধ্যে। আগে এই টিউমারে অবধারিত মৃত্যু হত। সার্জেনরা কয়েক বার এই রকম শিশুদের বাঁচাবার জন্য অপারেশনও করেছেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। যত অপারেশন হয়েছে তার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই টিউমার কেটে বের করে নেওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও অপারেশনের পর টিবি উদ্ভূত মেনিঞ্জাইটিস হয়ে তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার হওয়ার পর, আজ প্রায় ১৪—১৫ বছর হল তা ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চমকপ্রদ এণ্টিবায়োটিকটি যক্ষ্মা রোগের বীজাণু ধ্বংস করে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নিউরোসার্জেনরা আবার উপরোক্ত রোগে টিউমার কেটে বাদ দেওয়ার চিকিৎসা শুরু করেছে। এ সব কেসে আগে যেখানে শতকরা ১০০ জনের মৃত্যু হত এখন সেখানে শতকরা ৯০ জন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এণ্টিবায়োটিক সহযোগে নিউরোসার্জারী কত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এই উদাহরণটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অপারেশনের আগে যাতে একেবারে নির্ভুল ও সঠিক ডাইয়াগ্নোসিস হয় তা নিউরোসার্জারীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ডাইয়াগ্নোসিসের মূল্য অপারেশনের তুলনায় নেহাৎ কম নয়। অপারেশনের আগে অস্ত্রচিকিৎসকের কতগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।

মনে করুন নিউরোসার্জিক্যাল ক্লিনিকে এমন একজন রোগী ভর্তি হল যার কয়েক মাস ধরে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা চলছে, বমি হতে শুরু হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে ও হাত পায়ে মাঝে মাঝে খিঁচুনি ধরছে। এক্ষেত্রে নিউরোসার্জেনের তরফ থেকে কোন কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

আগে থেকে পরিষ্কার উত্তর পাওয়া দরকার? প্রথমত, এটা কি রোগীর মস্তিষ্কের টিউমার না অন্য জিনিষ? যেমন কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের শিরা উপশিরার রোগ যার উপসর্গ ঠিক ঐ একই রকম। শেষোক্ত রোগের ক্ষেত্রে অপারেশনের দরকার করে না ওষুধের দ্বারাই উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা চলে। কিন্তু যদি ঠিকই মস্তিষ্কের টিউমার হয়ে থাকে তাহলে অপারেশন করা শুধু যে অবশ্য প্রয়োজন তাই নয় সে অপারেশন যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। কিন্তু ছুরি ধরবার আগে সঠিকভাবে জানা দরকার মস্তিষ্কের কোন অংশে রয়েছে সেই টিউমার, তার পরিমাপ কী। সেই টিউমার নিরীহ না ম্যালিগন্যান্ট। মস্তিষ্কের অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রগুলির উপর তার কী প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে তা নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন। সার্জেনের আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া উচিত কোন পথ দিয়ে টিউমারের দিকে এগুলে সেই টিউমারকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দেওয়া সম্ভব অথচ মস্তিষ্কের উপর আঘাত লাগবে সবচেয়ে কম। অপারেশনে কী কী ভয় আছে ও জটিলতা দেখা দিলে কী ব্যবস্থা নেওয়া চলতে পারে — এইরকম সবই আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া দরকার।

ডাইয়াগ্নোসিস শব্দটি আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি নিউরোসার্জারীর ক্ষেত্রে শুধু সেই রকম ডাইয়াগ্নোসিস হলে কাজ চলে না তার উপর চাই আরও এক রকমের ডাইয়াগ্নোসিস যাকে বলে টপিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস। অর্থাৎ মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছে, বা এবসেস্ হয়েছে, না সিস্ট (cyst) হয়েছে, শুধু এই খবরগুলি জানলেই চলবে না, আরও জানতে হবে যে সেই সব প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন মস্তিষ্কের ঠিক কোন জায়গাতে হয়েছে, তার 'গভীরতা' কতখানি, মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্, মস্তিষ্ক আবরণী ও মস্তিষ্কের বড় বড় আর্টারি ও ভেনের সাথে তার পারস্পরিক স্থানগত সম্বন্ধটা কী। টপিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস করা খুবই শক্ত, এমনকি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও সবসময় সঠিক টপিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস করা সহজ নয়। বিশেষ করে টিউমার যদি আকারে খুব বড় হয় বা মস্তিষ্কের গভীরে জন্মায় তাহলে সেই সব স্থানীয় নিউরোলজিক্যাল উপসর্গ যা দিয়ে বোঝা যায় মস্তিষ্কের কোন অংশে আছে টিউমার তা ধরতে পারা খুবই কষ্টকর, বা এক এক সময় একেবারে অসম্ভব।

মস্তিষ্কের গঠন অসম্ভব জটিল। এর ভিতরকার প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে মস্তিষ্ক যেন কাজ করে ঠিক একটা গোটা যন্ত্রের মতো। এই কারণেই মস্তিষ্কের স্থানীয় উপসর্গ অনেক সময় মস্তিষ্কের রোগের সাধারণ উপসর্গ দিয়ে ঢাকা পড়ে যায়। মস্তিষ্কের সাধারণ উপসর্গ প্রধানত দেখা দেয় মাথার খুলির ভিতরকার চাপ বৃদ্ধির ফলে।

প্রকৃতি মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে জটিল অঙ্গ মস্তিষ্ককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাকে মাথার খুলির মধ্যে রেখে সবচেয়ে শক্ত হাড় দিয়ে চারদিক থেকে ঢেকে রেখেছে। মাথার খুলির মধ্যে খালি বা 'রিজার্ভ জায়গা' আছে, তবে তা খুবই কম। এর মধ্যে যখন টিউমার

জন্মে বড় হতে থাকে তখন স্বভাবতঃই তা মস্তিষ্কের নরম ইলাস্টিক টিস্যুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে দেখা দেয় কতগুলি এমন আনুষঙ্গিক উপসর্গ যা থেকে মনে হয় রোগটা যেন হয়েছে টিউমারের আসল জায়গা থেকে মস্তিষ্কের সবচেয়ে দূরবর্তী অংশে। অনেক ক্ষেত্রে এই সব আনুষঙ্গিক উপসর্গ স্থানীয় প্রাথমিক উপসর্গের সাথে এমন ভাবে মিশে যায় যে এদের তফাৎ করা দুরূহ।

সঠিক নিউরোসার্জিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস করার প্রধান উপায় হল রোগীকে সমস্ত উপায়ে পরীক্ষা করে দেখা। এর জন্য পরীক্ষায় ৮—১০ জন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের একত্রে যোগদান করা উচিত। নানা রকমের উপসর্গ — যেমন চলন ও স্পর্শ শক্তি ব্যাহত হওয়া, মাংসপেশী অবশ হয়ে যাওয়া, রিফ্লেক্স ও নড়াচড়ার সমতা (coordination of movement) ব্যাহত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ বিশ্লেষণ করে ও তুলনামূলকভাবে তা পরীক্ষা করে (মস্তিষ্কের কোন অংশে কোন ক্রিয়ার কেন্দ্র সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে) নিউরোসার্জেন নিউরোপ্যাথলজিস্টের সাথে একত্রে সঠিক নির্ণয় করেন মস্তিষ্কের কোন অংশ আক্রান্ত হয়েছে। রেডিওলজিস্ট পরীক্ষা করেন মাথার খুলি ও মেরুদণ্ডের এক্সরে ফটো; চোখের বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করেন দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টির পরিধি, পরীক্ষা করেন চোখের মণির (pupil) রিফ্লেক্স ও চোখের গভীরে অবস্থিত চোখের তলদেশ — যেখানে সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয় মস্তিষ্কের ভিতরকার সমস্ত পরিবর্তন। নাক, কান ও গলা সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট পরীক্ষা করেন ঘ্রাণ স্বাদ ও শ্রবণ শক্তি ও দেহের ভারসাম্য (balance) রক্ষার ক্ষমতা বা ভেস্টিবুল (অন্তঃকর্ণ) যন্ত্রের কাজ। লেবরেটারির ডাক্তার ও বায়োকেমিক পরীক্ষা করেন রক্তে ও সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডে কী আছে না আছে। ফিজিওলজিস্টরা পরীক্ষা করেন ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম যাতে ইলেকট্রনিক এম্পলিফায়ার সহ জটিল অসিলোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ইর‍্যাডিয়েশন লিপিবদ্ধ করা হয়। মনস্তত্ত্ববিদ ও মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করেন রোগীর মানসিক অবস্থা ও বাক্ শক্তি প্রভৃতি মানুষের উচ্চতর স্নায়ুর কার্যকলাপ। থেরাপিস্টরা বলে দেন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ প্রভৃতি দেহের ভিতরকার অঙ্গের অবস্থা কী।

এইভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একত্র পরীক্ষার ফলে নির্ভুল ও একেবারে সঠিক নিউরোসার্জিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস হওয়া খুবই সম্ভব। যখন ডাইয়াগ্নোসিস হয়ে গেল, তখন নিউরোসার্জেন তাঁর নিজের প্রধান কর্তব্য — অপারেশনে নির্ভয়ে এগুতে পারেন।

নিউরোসার্জিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিসের প্রধান প্রধান উপায়গুলি সম্বন্ধে আমরা এখানে একটু বিষদভাবে বলব।

রোগীর পরীক্ষা সর্বমুখী হওয়া চাই

চোখের ডাক্তার আয়না যুক্ত বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে চোখের মণির মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো ফেলেন চোখের গভীরে। এতে চোখের পশ্চাদ্ভাগ বা যাকে বলে চোখের গভীরে অবস্থিত তলদেশ চমৎকার দেখা যায়—দেখা যায় গোলাপী রঙের জালিজালি পর্দা, চোখের তলদেশের আর্টারি ও ভেনগুলি এবং অপ্টিক নার্ভের ডিস্ক। অপ্টিক ডিস্ক স্বাভাবিক অবস্থায় আয়তনে বেশী বড় নয়, ধারগুলি তার চমৎকার সমানভাবে খাঁজ কাটা এবং অপ্টিক নার্ভ যেখানে এসে চোখের বলের সাথে মিশেছে সেখানটা খানিকটা উঁচু।

ডাক্তার হয়ত চোখের তলদেশে ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন, দেখলেন যে অপ্টিক ডিস্ক ফুলে আছে, তার ধারগুলির সীমারেখা ঠিক ধরা যাচ্ছে না, চারপাশের অংশের সাথে তা যেন মিশে গেছে, আর্টারিগুলি যেন সরু সরু ও বেঁকে বেঁকে আছে অথচ ভেনগুলি স্ফীত। তিনি তখন সেই রোগীর রোগের ইতিহাসের পাতায় লেখেন অনুরূপ মন্তব্য — 'রক্ত চলাচল ব্যাঘাত জনিত অপ্টিক ডিস্কের ইডিমা বা স্ফীতি'।

এই বিপজ্জনক উপসর্গটির মানে হল এই যে রোগীর মাথার খুলির ভিতরকার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই রকম উপসর্গ সূচনা করে মস্তিষ্ক টিউমার বা এবসেস। নিউরোসার্জেনের কাছে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জনিত অপ্টিক ডিস্কের ইডিমা বিপদের সঙ্কেত। সে কেসে তাড়াতাড়ি অপারেশন করা দরকার কেননা অপ্টিক ডিস্ক স্ফীত হলে খুব তাড়াতাড়ি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় এবং রোগী অনেক সময় অন্ধ হয়ে যায়।

মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্লে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে এক্সরের সাহায্যে তার ফটো তোলা যায়। মস্তিষ্কে টিউমার হলে ভেণ্ট্রিক্ল চেপটা আকৃতি হয় ও যেখানে টিউমার হয়েছে তার বিপরীত দিকে সরে যায়।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: বিশেষ পরীক্ষা করে চোখের ডাক্তার হয়ত দেখলেন যে রোগীর দৃষ্টি পরিধির এক বিশেষ অংশে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে, বা রোগী হয়ত নিজেই লক্ষ্য করল যে সে তার বাঁয়ের বা ডাইনের জিনিষ দেখতে পায় না, অথবা বাঁ চোখের বাঁয়ের

অর্ধেকের জিনিষ ও ডান চোখের ডান অর্ধেকের জিনিষ সে দেখতে পায় না। মস্তিষ্কের এনাটমি ভাল করে জানা থাকলে ও অপ্টিক নার্ভের ফাইবার বা সুতোগুলি মস্তিষ্কের কোন জায়গা দিয়ে গেছে তা জানা থাকলে ডাক্তার সহজেই ও অতি সঠিকভাবে বলে দিতে পারেন যে মস্তিষ্কের কোন অংশে আঘাত লেগেছে বা কোন অংশ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ডাইয়াগ্নোসিসের আধুনিক বিশেষ উপায়গুলি অনেক ক্ষেত্রে নিউরোসার্জেনকে অনেক মূল্যবান সাহায্য দিয়ে থাকে। এই সব আধুনিক উপায়গুলির মধ্যে এক্সরে পরীক্ষার তাৎপর্য খুবই বেশী।

যদি আঘাতের পর মস্তিষ্কে হাড়ের কুঁচো, ধাতব স্প্লিণ্টার, বা অন্য কোন ফরেন বডি থেকে যায় তাহলে মাথার খুলির এক্সরে করে তা ধরা পড়ে ও স্পষ্টভাবে দেখা যায় মস্তিষ্কের কোন জায়গাতে তা রয়েছে।

সাধারণ এক্সরেতে মস্তিষ্ক দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু মাথার খুলির হাড়গুলি। তা হলেও মাথার খুলির হাড়ের যে পরিবর্তন সাধারণ এক্সরেতে ধরা পড়ে তার থেকেই অনেক সময় মস্তিষ্কের রোগ ডাইয়াগ্নোসিসের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ, মাথার খুলির (বেসের) তলদেশের হাড়গুলির কেন্দ্রস্থলে একটা ছোট্ট হাড় আছে যাতে চেরীর বিচির মতো একটা খোঁদল থাকে। ঐ হাড়টিকে বলে সেলাটার্সিকা (sella turcica) বা তুরস্কের ঘোড়ার জিন। সেই খোঁদলের মধ্যে থাকে অর্ধেক খোসা পড়ান বাদামের মতো দেখতে, দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড, হাইপোফাইসিস। মাথার পাশ থেকে ফটো তুললে এক্সরেতে সেলাটার্সিকার চমৎকার ছবি ওঠে।

হাইপোফাইসিসের টিউমার যার সম্বন্ধে নীচে বলা হবে, তাতে সেলাটার্সিকার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা টিউমার সেলাটার্সিকার মতো শক্ত হাড়টিকে আস্তে আস্তে ঠেলতে থাকে, ফলে খোঁদলটি মাপে কয়েক গুণ বড় হয়ে দাঁড়ায়।

রেডিওলজিস্ট বা সার্জেন ফটোতে সেলাটার্সিকার অনুরূপ পরিবর্তন দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন যে রোগীর হাইপোফাইসিসে টিউমার হয়েছে। (অবশ্য ঠিক মত বলতে হলে ঐ টিউমারের অন্যান্য উপসর্গগুলিকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়!)

অনেক ক্ষেত্রে যেখানে মস্তিষ্কের টিউমার ঠিক কোন জায়গাটিতে অবস্থিত তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না, সেখানে নিউরোসার্জেন ও রেডিওলজিস্টকে আরও জটিল পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয়।

...মস্তিষ্কের ভিতরে ঠিক তার মাঝখানটিতে কতগুলি গর্ত আছে যা থেকে অনবরত জলের মতো এক প্রকারের রঙবিহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ তৈরী হয়ে সবসময় প্রবাহিত হয়। সেই তরল পদার্থটিকে বলা হয় ইণ্ট্রাক্রেনিয়াল ফ্লুইড (intracranial fluid)। এই রকম গর্ত মস্তিষ্কের মধ্যে চারটে। এদের বলা হয় ভেণ্ট্রিক্ল্। মস্তিষ্ক পদার্থের মতই এইসব ভেণ্ট্রিক্লেরও

সাধারণ এক্সরেতে কখন ছবি ওঠে না, কেননা ভেণ্ট্রিক্লে অবস্থিত তরল পদার্থ ঠিক ততখানিই এক্সরে রশ্মির পথ ব্যাহত করে যতখানি ব্যাহত করে থাকে এর চারদিকের মস্তিষ্ক পদার্থ।

কিন্তু এমন উপায় আছে যার সাহায্যে এক্সরে করে মস্তিষ্কের সবচেয়ে গভীরে অবস্থিত অদৃশ্য গর্তগুলিরও চমৎকার ছবি তোলা যায়। এর জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্ল থেকে কিছু তরল পদার্থ বের করে নিয়ে তাতে সমপরিমাণ হাওয়া বা অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। হাওয়া বা অক্সিজেন এক্সরে রশ্মির পথ মোটেই ব্যাহত করে না বলে ছবি ওঠে। এক্সরে পরীক্ষার এই উপায়টির নাম হল কণ্ট্রাস্ট এক্সরে।

কণ্ট্রাস্ট এক্সরে তুলতে হয় মাথার খুলির হাড়ে সামান্য ফুটোর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্ক পদার্থের মধ্যে সূচ ফুটিয়ে সোজাসুজি ভেণ্ট্রিক্লে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে (ভেণ্ট্রিকুলোগ্রাফি), না হয়ত স্পাইন্যাল কর্ডের আবরণী কোমরের কাছে ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে হাওয়া ঠেলে দেওয়া হয় (এনসেফালোগ্রাফি)। এনসেফালোগ্রাফি (encephalography) সম্বন্ধে আমরা পরে বলব।

সুস্থ লোকের হাওয়া পূর্ণ ভেণ্ট্রিক্লগুলির ছবি দেখলে সমভাবে দুই দিকে দুই পাখা ছড়ান প্রজাপতির কথা মনে হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন গোলার্ধে যদি টিউমার হয় তাহলে আর 'প্রজাপতির' চেহারার চিহ্ন মাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। ভেণ্ট্রিক্লগুলির হয় থেৎলে

ক্যারটিড আর্টারির মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের ধমনিতে রঞ্জনরশ্মি আটকে দেয় এমন কণ্ট্রাস্ট পদার্থ প্রবেশ করান হয়েছে। মাথার এক্সরেতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টিউমারের শিরার গুচ্ছ, মস্তিষ্কের কোন জায়গায় সে টিউমার হয়েছে ও তার পরিমাপ কী।

যাওয়া না হয়ত টিউমারের বিপরীত দিকে সরে যাওয়া ছবি পরিলক্ষিত হয়। ভেণ্ট্রিক্লগুলির বিভিন্ন পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে নিউরোসার্জেন টিউমারের অবস্থিতি ও তার পরিমাপ নির্ণয় করতে পারেন।

তথাকথিত এঞ্জিওগ্রাফি (angiography) নামে মস্তিষ্কের আর এক প্রকারের কণ্ট্রাস্ট এক্সরে হয় যা পরীক্ষা করে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় ডাইয়াগ্নোসিসের দিক থেকে যার মূল্য ও গুরুত্ব কম নয়।

গলার পাশের দিকটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরলে নাড়ীর প্রবল স্পন্দন অনুভব করা যায় সেই জায়গায় যেখানে মাংসপেশীর তলা দিয়ে চলেছে মোটা রক্তের শিরা ক্যারটিড আর্টারি (carotid artery)। এই আর্টারির মধ্য দিয়েই মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছায়। রুশ ভাষায় এই আর্টারির যে নাম দেওয়া হয়েছে অনুবাদ করলে তার অর্থটা দাঁড়ায় 'ঘুম পাড়ানি রক্তের শিরা'। বহু পুরাকাল থেকেই ক্যারটিড আর্টারি এই নামে পরিচিত তার কারণ এই যে, এই আর্টারি জোর করে চেপে ধরলে মানুষ 'ঘুমিয়ে পড়ে'। আসলে অবশ্য মানুষ এতে ঠিক ঘুমোয় না সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে, কেননা এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছয় অনেক কম।

এঞ্জিওগ্রাফির জন্য ক্যারটিড আর্টারিতে লম্বা সূচ ফুটিয়ে কণ্ট্রাস্ট পদার্থ প্রবেশ করান হয়। অর্থাৎ এমন পদার্থ প্রবেশ করান হয় যা রঞ্জনরশ্মির গতি ব্যাহত করে (কার্ডিওট্রাস্ট, উমব্রডিল (cardiotrast, umbrodil) প্রভৃতি। অতি কম সময়ের মধ্যে ৩—৪ সেকেণ্ড ধরে এই কণ্ট্রাস্ট পদার্থ ক্ষিপ্র রক্ত প্রবাহে মিশে মস্তিষ্কের সমস্ত বড় ও ছোট রক্তের শিরা পূর্ণ করে ফেলে। এই সামান্য সময়ের মধ্যেও আধুনিক এক্সরে যন্ত্র প্রায় ২০টা ছবি তুলতে সক্ষম হয়। ঐসব ছবিগুলিতে চমৎকার ফুটে ওঠে মস্তিষ্কের অসংখ্য আর্টারি ও ভেনের শিরা উপশিরার বেড়া জাল।

সেই সব এক্সরে প্লেট ভাল করে পরীক্ষা করে রেডিওলজিস্ট ও নিউরোসার্জেন হয়ত দেখতে পেলেন যে মস্তিষ্কের কোন একটি অংশে একগুচ্ছ কালো কালো বাঁকাচোরা লাইনের মতো দাগ রয়েছে। ঐগুলোই হচ্ছে টিউমারের ভিতরকার রক্তের শিরা, যেগুলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কণ্ট্রাস্ট পদার্থে ভর্তি হয়েছে। অন্য এক্সরে প্লেটে হয়ত টিউমারের রক্তের শিরা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে মস্তিষ্কের রক্তের শিরা উপশিরাগুলি (যার স্বাভাবিক ছবি খুব ভাল করে আজকাল আয়ত্ত করা গেছে) যেন নানা দিকে সরে গেছে, তাদের কে যেন ঠেলে দিচ্ছে। এ দেখেও বিচার করে সঠিকভাবে বলা যায় মস্তিষ্কের কোন অংশে রয়েছে সেই টিউমার, এবসেস বা সিস্ট।

কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের অসুখ ধরবার জন্য সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডকে চলতি ভাষায় বলে 'লিকর'। এই স্বচ্ছ ও রংবিহীন জলবৎ পদার্থ তৈরী হয় মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্লে অবস্থিত এক বিশেষ রক্ত শিরার গুচ্ছ থেকে।

সুস্থ মানুষের কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমে লিকরের পরিমাণ বেশী নয় — প্রায় এক গ্লাস। প্রতি নিয়ত অতি ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে এই জলীয় পদার্থটি। ভেন্ট্রিক্লের রক্তের শিরার গুচ্ছে রক্ত থেকে ফিল্টার হয়ে যে লিকর তৈরী হয় সেই লিকর মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের সমস্ত অংশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের আবরণীর মাধ্যমে আবার রক্তে শোষিত হয়। প্রতি নিয়ত ঘূর্ণাকারে চলছে এই যে প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় লিকর সার্কুলেশন বা লিকর প্রবাহ।

লেবরেটারি পরীক্ষার জন্য এই লিকর যোগাড় করতে সার্জেন প্রথমে কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের উপর চামড়ার সামান্য একটু অংশ অবশ করে নিয়ে একটা সরু লম্বা সূচ মেরুদণ্ডের অস্থির পাশাপাশি দুই লেমিনার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। সূচের অগ্রভাগ যখন স্পাইন্যাল কর্ডের সাবএরাকনয়ড স্পেসে (subarachnoid space) প্রবেশ করে তখন সেই সূচের মধ্য দিয়ে কয়েক সিঃ সিঃ লিকর অনায়াসে সংগ্রহ করা চলে। এতে বিশেষ ব্যথাও লাগে না, বা প্রক্রিয়াটিতে তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনাও কিছু নেই।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডে আয়নার মতই কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের সমস্ত রোগের প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই জলীয় পদার্থটিতে থাকে খুব সামান্য এলবুমিন ও অতি সামান্য রক্তের শ্বেত কণিকা (এক কিউবিক মিলিমিটারে ১—২)। কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অসুখে যেমন এলবুমিন তেমনি কোষ সংখ্যা খুব বেড়ে যেতে পারে। তাতে আবার সময় সময় দেখা দেয় রক্ত বা স্বচ্ছতার পরিবর্তে ঘোলাটে অবস্থা বা আরও কত কি।

মস্তিষ্কের নিজস্ব বৈদ্যুতিক তরঙ্গ

মস্তিষ্কের রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য আজকাল ক্রমশই ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজির প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি নবীন বিজ্ঞান হলেও খুবই তাড়াতাড়ি বিকশিত হয়ে উঠছে। কী বিচার করে এই বিজ্ঞান? জীবন ক্রিয়ার গতি পথে মানুষ ও প্রাণীদেহের অনেক টিসু ও অনেক অঙ্গে বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা এই বিদ্যুতের নাম দিয়েছেন জৈব বিদ্যুৎ, বা জীবনের বিদ্যুৎ প্রবাহ। মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক বা স্পাইন্যাল কর্ড জাতীয় অঙ্গ যত দিন বেঁচে থাকে ও কাজ করে ততদিন পর্যন্ত তারা সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের মতই সবসময় তৈরী করে বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল।

এই সমস্ত জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ কিন্তু খুবই সামান্য, তাই এদের মাপতে হয় মাইক্রোভোল্টে মাইক্রোভোল্ট হল ১ ভোল্টের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। তাই জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ 'ধরে' তা মেপে পরীক্ষা করতে হলে থাকা প্রয়োজন নানা প্রকারের আধুনিক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি।

সব প্রথমে মানুষের হৃৎপিন্ডের জৈব বিদ্যুৎ অধ্যয়ন করা হয়েছিল। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ফটো টেইপে লিপিবদ্ধ করা যায় সেই তথাকথিত ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রকে বর্তমানে শুধু যে বড় বড় শহরের বড় বড় ক্লিনিকে ও ইনস্টিটিউটেই দেখা যায় তা নয়, এমনকি জেলার হাসপাতালেও এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিন্ডের জৈব বিদ্যুৎ রেকর্ড যাকে বলে ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাম তা সমস্ত প্রধান প্রধান হৃদরোগের ডাইয়াগ্নোসিস ও তার চিকিৎসার পক্ষে অপরিহার্য।

মানুষের মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ অধ্যয়ন করা ঢের কঠিন। ব্যাপার হল এই যে, মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ হৃৎপিন্ডের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহের তুলনায় ঢের দুর্বল। তাছাড়াও, মাথার খুলির হাড় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে বলে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরা পড়ে আরও দুর্বল অবস্থায়। এই সব কারণে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরে কাগজের টেইপে লিপিবদ্ধ করতে তাকে কয়েক লক্ষ গুণ জোরদার করে নিতে হয়। এরই জন্য অনেক ল্যাম্প যুক্ত শক্তিশালী

জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হচ্ছে মস্তিষ্ক কোষগুলির বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল, এ সব পটেনশিয়ালের আকৃতি ও ছন্দগতির বিশ্লেষণ (চিত্রে অঙ্কিত ৪নং লাইন দেখুন) নিউরোসার্জেনকে শুধু যে টিউমারের স্থান নির্ণয় করতেই সাহায্য করে তা নয় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধেও মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে।

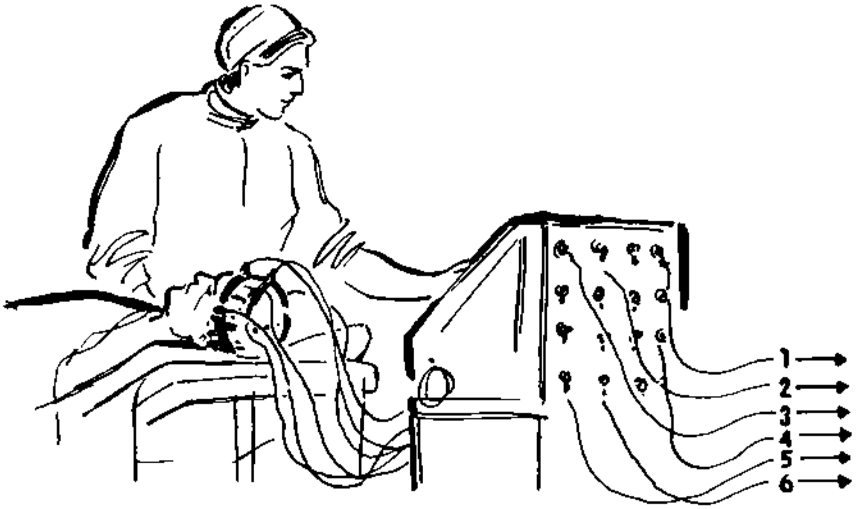

ইলেকট্রনিক এম্পলিফায়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গত বিশ বছরে আধুনিক ইলেকট্রনিক ও রেডিওটেকনিকের দ্রুত উন্নতির ফলে তা করা সম্ভব হয়েছে।

মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল বিকিরণ করে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি নার্ভ কোষ। এই তথ্যটি মাত্র কয়েক বছর হল জানা গেছে। যদি স্মরণ রাখা যায় যে মানুষের মস্তিষ্কে অনুরূপ নার্ভ কোষের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ার্ড (শত কোটি), তাহলে বোঝা যাবে যে মস্তিষ্কের ভিতরকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ রেকর্ড করলে যে জটিল 'প্যাটার্ন', বা ইলেকট্রো-ফিজিওলজিস্টদের ভাষায় বলতে গেলে যে জটিল কার্ভ (curve) পাওয়া যায়, তা ডিসাইফার করা (ব্যাখ্যা করা) বা তাকে বোঝা কত শক্ত।

...ছোট্ট ঘর, একটিও জানালা নেই, তাতে গদি আঁটা সোফার উপর স্থিরভাবে শুয়ে আছে রোগী। সেই ঘরের দেওয়াল লোহার খুব ঘন জাল দিয়ে তৈরী — যাকে বলে স্ক্রিন্‌ড দেওয়াল। ঘরের দেওয়াল এখানে স্ক্রিনের কাজ করে যাতে করে বাইরের আবহাওয়ায় (এটমসফিয়ারে) যে বৈদ্যুতিক কারেণ্ট আছে তা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

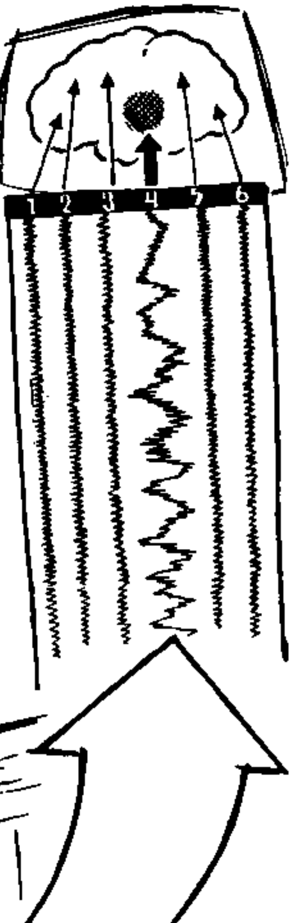

রোগীর মাথায় হালকা রবারের ক্যাপ পরান, যার থেকে সিলেক্টর পর্যন্ত একগুচ্ছ বিভিন্ন রঙের সরু সরু তার চলে গিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোড যাদের অগ্রভাগ মাথার চামড়ার বিভিন্ন বিন্দুকে ছুঁয়ে আছে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড মস্তিষ্কের সেই সামান্য অংশের বিদ্যুৎ প্রবাহ বহন করে যার উপরকার চামড়াকে সে ছুঁয়ে আছে।

স্ক্রিন করা ঘরটির বাইরে এক মস্ত বড় আলো সম্বলিত ঘরে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত বড় এক জটিল যন্ত্র। রূপে ও মাপে যন্ত্রটি ঠিক পিয়ানোর মতন। যন্ত্রটির কণ্ট্রোল বোর্ডের উপর বহু রেগুলেটার, চাবি ও হ্যাণ্ডেল।

ঐ যন্ত্রের উপরের প্যানেলে একটি চওড়া কাগজের ফিতে বা টেইপ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আর প্রায় ২০টি সরু সরু বাঁকান টিউবের মতো কলম তাড়াতাড়ি অসিলেট করতে করতে সেই কাগজের ফিতের উপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইনের সাহায্যে লিখে চলেছে ছোট ছোট ঢেউ-এর উত্থান ও পতন। গোটা যন্ত্রটাকে চালাচ্ছেন ডাক্তার ইলেকট্রো-ফিজিওলজিস্ট। মাঝে মাঝে তিনি সেই কাগজের ফিতেয় পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে কি যেন সংকেত চিহ্ন রেখে দিচ্ছেন। স্ক্রিন করা ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত মাইক্রোফোনের সাহায্যে ডাক্তার রোগীকে নির্দেশ দিচ্ছেন — 'চোখ খুলুন', 'শান্তভাবে শুয়ে থাকুন', 'শক্তভাবে হাত মুঠি করুন' ইত্যাদি। ঐ 'অতি বুদ্ধিমান', জটিল যন্ত্রটির নাম হল ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ। তার সাহায্যে মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ এক মিলিয়ন গুণ জোরদার করে কাগজের ফিতেয় তা লিপিবদ্ধ করা যায়।

লিপিবদ্ধ করা ত শেষ হল, কিন্তু তারপরই আসল কাজের শুরু। এখন ইলেকট্রো-ফিজিওলজিস্টকে নিউরোসার্জেনের সাথে বসে ১০ থেকে ১২ মিটার কাগজের টেইপ রেকর্ডকে অতি মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করতে হবে, দেখে বের করতে হবে যে সেই আঁকার মধ্যে কী আছে, — তার অর্থ কী। জটিলভাবে আঁকা হস্তলিপির বিশ্লেষণ যেমন বিজ্ঞানীর সামনে কোন এক প্রাচীন জাতির জীবন কাহিনী খুলে ধরে ঠিক তেমনি ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রামের খোঁচা খোঁচা লাইনগুলিও ডাক্তারকে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য যোগায় যা দেখে ডাক্তার বলে দিতে পারেন রোগের ফলে তার ক্রিয়ার কী পরিবর্তন ঘটেছে।

স্বাভাবিক ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রামে অর্থাৎ সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুতের অংকনে দেখতে পাওয়া যায় কতগুলি প্রায় সমান সমান জিগ্‌জ্যাগ্‌ লাইন বা সমান সমান অসিলেশনের দাগ যে অসিলেশনের পুনরাবৃত্তির গতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১০ বার। বিজ্ঞানীরা গ্রীক ভাষার প্রথম অক্ষর দিয়ে বৈদ্যুতিক অসিলেশনের এই পুনরাবৃত্তির স্বাভাবিক ছন্দ গতির নামকরণ করেন। একে বলা হয় 'আল্ফা-ছন্দ'।

আগেই বলা হয়েছে যে আধুনিক ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফ একইসঙ্গে মস্তিষ্কের ১৬টি থেকে ২০টি এমনকি ৩২টি বিন্দু থেকেও জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ রেকর্ড করতে পারে। ১৬, ২০ বা ৩২ যতগুলি বিন্দু থেকে রেকর্ড করা হয় তার থেকেই বোঝা যায় যে সেই যন্ত্রে ততগুলি মাত্র কেনাল আছে।

বিশেষজ্ঞ না হয়েও লক্ষ্য করা মোটেই শক্ত নয় যে রোগগ্রস্ত মস্তিষ্ক ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ রেকর্ডের মধ্যে অনেক তফাৎ।

প্রথমত, রোগগ্রস্ত হলে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের সমস্ত জায়গায় সেকেন্ডে ৮ থেকে ১০ বার দোলনের যে স্বাভাবিক ছন্দ (আল্ফা-ছন্দ) তার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় বা একেবারে বদলে যায়। শুধু তাই নয় অসিলেশনের গভীরতা বা এমপ্লিটুডও কমে যায় এবং তার জায়গায় দেখা দেয় বেতালা, অসমতাপূর্ণ ছোট ছোট অসিলেশনের দাগ। এদের বলে বিটা-ওয়েভ (beta wave)। এছাড়াও, উপরে দেখান মস্তিষ্কের ডান ফ্রন্টাল লোব থেকে রেকর্ড করা অসিলেশনের গতিভঙ্গীটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে অসিলেশন আরও ধীর গতি — অংকনগুলি ঠিক আরও টানাটানা ঢেউ-এর মতন। এদেরও গ্রীক অক্ষর দিয়ে নামকরণ হয়েছে। এদের বলে ডেল্টা-ওয়েভ (delta wave)। ইলেকট্রো-ফিজিওলজিস্টদের মতে ডেল্টা-ওয়েভ নির্দেশ করে যে মস্তিষ্কে এমন এক কেন্দ্র রয়েছে যার জৈব বৈদ্যুতিক অবস্থা স্বাভাবিক নয় — রোগগ্রস্ত। জৈব বৈদ্যুতিক গ্রাফ ভাষ্য করার ব্যাপারটিকে একটু সহজ করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে যদি মস্তিষ্কের কোন স্থানে ডেল্টা-ওয়েভ দেখা যায় তাহলে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেখানে, মস্তিষ্কের সেই অংশে, এ ক্ষেত্রে ডান ফ্রন্টাল লোবে, টিউমার হয়েছে।

নতুন বিজ্ঞান ইলেকট্রো-ফিজিওলজি এমনি করেই নিউরোসার্জেনকে সক্রিয়ভাবে সঠিক ডাইয়াগ্নোসিস করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে সাহায্য করে, টিউমার কোথায় আছে তা খুঁজে বার করতে। এর সাহায্যে এমনকি টিউমারের পরিমাপ ও মস্তিষ্ক সার্ফেস থেকে তা কত গভীরে রয়েছে তাও বলে দেওয়া যায়।

আমরা এখানে ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফি সম্বন্ধে একটু বিষদভাবেই বললাম তার কারণ এটা আধুনিক ফিজিওলজির একটা নতুন ও অতি কার্যকরী পরীক্ষার উপায়।

ইলেকট্রো-ফিজিওলজির কার্যকারিতার আরও একটা উদাহরণ দিই। পেরিফেরাল নার্ভ অর্থাৎ সেই সমস্ত নার্ভ যা মানুষের হাত পা প্রভৃতি সঞ্চালনে সাহায্য করে তা নষ্ট হয়ে গেলে বা তাতে চোট লাগলেও নিউরোসার্জিক্যাল চিকিৎসা করা হয়।

ধরা যাক যে, কাঁধ গুলিবিদ্ধ হবার পর কোন একজন লোকের হাত নড়াচড়া করবার প্রায় সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে ও চামড়ার এক বিশেষ অংশ অবশ হয়ে রয়েছে। আজ কিন্তু রোগীকে নানা উপায়ে পরীক্ষা করে নিউরোসার্জেন সঠিকভাবে বলে দিতে পারেন কোন নার্ভ নষ্ট হয়েছে, বা নষ্ট হয়েছে সেই নার্ভের কোন বিশেষ অংশ। কিন্তু অপারেশন করতে হলে

আরও অনেক তথ্য জানা দরকার —জানা দরকার নার্ভটি সম্পূর্ণ দুভাগ হয়ে কেটে গেছে না তার সামান্য অংশ কেটেছে, কোথায় সেই কেটে যাওয়া নার্ভের ধার দুটো, অবশ হয়ে যাওয়া মাংসপেশীগুলিরই বা অবস্থা কী বা তাদের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা।

এই সব প্রশ্ন সমাধান করতেও খুবই সাহায্য করে বিভিন্ন ইলেকট্রো-ফিজিওলজি ভিত্তিক পরীক্ষা, বিশেষ করে তারা সাহায্য করে আহত নার্ভ ও মাংসপেশীর ক্রোনাক্সি এবং বৈদ্যুতিক একসাইটেবিলিটি পরীক্ষা করতে। এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে নিউরোসার্জেন কেটে যাওয়া নার্ভের অগ্রভাগ দুটি সেলাই করবে কিনা বা সেই নার্ভকে শুধু স্কার টিস্যুর চাপ থেকে মুক্ত করবে।

নিউরোসার্জেনের সহায়তার কাজে রেডিওএকটিভ আইসোটোপ

কয়েক বছর হল বিজ্ঞানে পূর্ব চিহ্নিত পরমাণু ব্যবহার করা খুবই চালু হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষের শরীরের ফিজিওলজির প্রক্রিয়া ও মেটাবলিজম পরীক্ষা করার জন্য বা কোন কোন অসুখের ডাইয়াগ্নোসিস ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও পূর্ব চিহ্নিত পরমাণু ব্যবহার করা হচ্ছে। মাইক্রোস্কোপ যেমন বিজ্ঞানীদের, খালি চোখে দেখা যায় না বীজাণু জগতের এমন, সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু দেখতে ও পরীক্ষা করতে সাহায্য করে পূর্ব চিহ্নিত পরমাণুও ঠিক তেমনি মানুষের দেহের ভিতরে কার্যরত জটিলতম প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করতে আমাদের সাহায্য করে। রেডিওএকটিভ আইসোটোপ নিউরোসার্জারীর ক্ষেত্রে নতুন ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের টিউমার ডাইয়াগ্নোসিসে ঐ উপায়টি খুবই কার্যকরী।

আধুনিক ডোজিমেট্রি যন্ত্র থাকলে অতি সহজ ও সরল ভাবে এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা যায় এবং আসল কথা এই যে এতে শরীরের একটুও ক্ষতি হয় না। রোগীকে সামান্য একটু রেডিওএকটিভ পদার্থ (রেডিওএকটিভ আইডিন বা ফ্লুরসিন আইডিন অথবা রক্তের প্লাজমার পূর্ব চিহ্নিত এলবুমিন প্রভৃতি) খেতে দেওয়া হয় বা হাতের ভেনের ভিতর দিয়ে ইঞ্জেকশন করা হয়। এই সমস্ত রেডিওএকটিভ পদার্থের একটা গুণ হল এই যে, তারা চারপাশের সুস্থ মস্তিষ্ক টিস্যুর তুলনায় টিউমার টিস্যুতে গিয়ে বেশী করে জমে। রেডিওএকটিভ পদার্থ দেওয়ার পর খুব সঠিকভাবে রেডিওএকটিভ পদার্থের গামা-রশ্মির বিকিরণ ধরতে পারে এমন যন্ত্রের মিটার মাথায় ও শিরদাঁড়ার নানা জায়গায় বসিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। যে জায়গা থেকে টিউমারের দূরত্ব সবচেয়ে কম দেখা যায়, সেখানে যন্ত্রটি রেকর্ড করে গামা-রশ্মির উৎস অর্থাৎ সেখানকার রেডিওএকটিভ রশ্মির ইম্পাল্‌সই সবচেয়ে বেশী। অনেক সময় দেখা যায় যে, যেখানে টিউমার আছে সেখান থেকে যে রেডিওএকটিভ রশ্মি ধরা পড়ে তার ইম্পাল্‌স,

চারপাশের সুস্থ মস্তিষ্ক টিস্যু থেকে নির্গত রেডিওএকটিভ রশ্মির ইম্পাল্‌সের তুলনায় প্রায় ২—৩ হাজার বেশী।

সম্প্রতি কোবাল্ট সোনা ইট্রিয়াম বোরাক্স প্রভৃতি কয়েকটি রেডিওএকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করে মস্তিষ্ক টিউমারের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে মস্তিষ্ক টিউমারের আইসোটোপ চিকিৎসা এখনও ঠিক মস্তিষ্ক টিউমারের সার্জিক্যাল চিকিৎসাকে হটিয়ে দিতে পারেনি। সার্জিক্যাল চিকিৎসার সঙ্গেই এখনও পর্যন্ত তা ব্যবহার করা হয়।

স্পাইন্যাল কর্ডের টিউমার ডাইয়াগ্নোসিস করার এক সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় বের করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। স্পাইন্যাল কর্ডের টিউমার হয় স্পাইন্যাল কেনালের মধ্যে, সেখান থেকে সেই টিউমার স্পাইন্যাল কর্ডের কোন একটা বিশেষ অংশে চাপ সৃষ্টি করে। সেই চাপের স্থানটি খুঁজে বের করে তারপর টিউমার কেটে বাদ দিতে সার্জেনকে অন্তত দুটো তিনটে শিরদাঁড়ার অস্থির লেমিনা কেটে প্রথমে দেখতে হয় কোথায় টিউমারটা হয়েছে। সাধারণ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা দ্বারা শুধু বের করা যায় মেরুদণ্ডের কোন অংশে টিউমার হয়েছে — গলার অংশে, বুকের অংশে, কোমরের অংশে না সেক্রামের (sacrum) অংশে। এমনও কেস দেখতে পাওয়া যায় যাতে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার টপিক্যাল ডাইয়াগ্নোসিস মনে সন্দেহ জাগায়। তখন কিন্তু নিউরোসার্জেনকে আবার সেই রেডিওএকটিভ আইসোটোপেরই সাহায্য নিতে হয়।

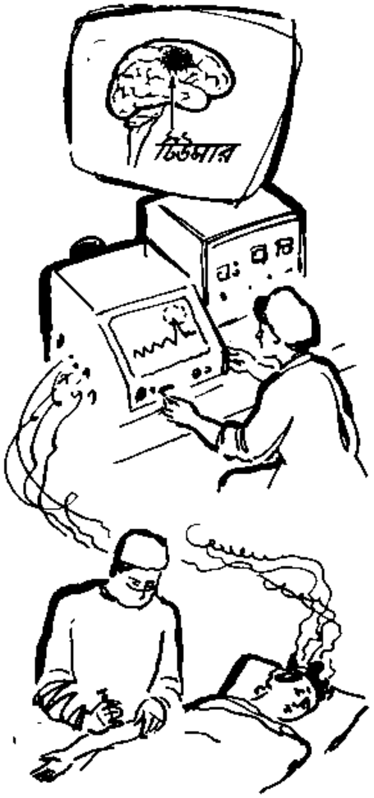

শরীরে প্রবেশ করানোর পর রেডিওএকটিভ পদার্থটি তার নিজস্ব গুণ অনুযায়ী টিউমার টিস্যুতে গিয়ে জমা হয়। কোন জায়গায় গিয়ে তা জমা হয়েছে ধরা পড়ে গামা-রশ্মি ও বেটা-রশ্মি ধরার বিশেষ এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে।

রোগীর স্পাইন্যাল পাংচার (spinal puncture) করতে হয় বসা অবস্থায়। (কেমন করে সে পাংচার করা হয় তা আগেই বলা হয়েছে)। তারপর স্পাইন্যাল কর্ডের সাবএরাকনয়ড স্পেসে সামান্য একটু রেডিওএকটিভ গ্যাস র‍্যাডন ভরে দেওয়া হয়। র‍্যাডন হল রেডিয়ামের ইমানেশন (emanation)।

র‍্যাডনের বুদ্বুদটি হালকা বলে তাড়াতাড়ি উপরে ভেসে ওঠে, কিন্তু বুদ্বুদটি ঊর্ধ্বে যেতে পারে মাত্র মেরুদণ্ডের সেই অংশ পর্যন্ত যেখানে টিউমার জনিত ব্লক সৃষ্টি হয়েছে — অর্থাৎ বুদ্বুদের অবস্থান টিউমারের সর্ব নিম্ন সীমানা সূচিত করে। আপনা থেকেই এখানে বুদ্বুদটি থেমে যায়। তখন ডাক্তার-রেডিওলজিস্ট রোগীর মেরুদণ্ড স্পর্শ করিয়ে যন্ত্রের ইণ্ডিকেটার বা রিসিভিং মিটারটি ধীরে ধীরে নীচ থেকে ওপরে বা ওপর থেকে নীচে ঠেলে দিতে থাকে। যন্ত্রটি যেখানে সবচেয়ে বেশী জোরদার রেডিওএকটিভ বিকিরণ গ্রহণ করে কোন সন্দেহ নেই যে সেখানে গিয়েই র‍্যাডনের বুদ্বুদটি আটকেছে — অর্থাৎ সেখানেই টিউমার হয়েছে।

অপারেশন থিয়েটারে

নিউরোসার্জারীর অপারেশন সাধারণত লোকাল এনেস্থেসিয়া দিয়েই করা হয়। ব্যাপার হল এই, যে এই সমস্ত অপারেশন, বিশেষ করে মস্তিষ্কের টিউমার কেটে বাদ দেওয়ার মতো অপারেশন সাধারণত ৩—৪ ঘণ্টা ধরে চলে। এতে নিউরোসার্জেনের এত সাবধানতা ও সুদক্ষ কাজের প্রয়োজন, যে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবার কথাই উঠতে পারে না। খুবই স্বাভাবিক যে কয়েক ঘণ্টা ধরে যদি সাধারণ এনেস্থেসিয়া দিয়ে রুগীকে অজ্ঞান করে রাখা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের কোন কোন গুরুতর রোগীর পক্ষে তাতে খুব খারাপ ফল হতে পারে।

লোকাল এনেস্থেসিয়া দেওয়ার উপায় এমন উন্নত হয়েছে, বিশেষত সোভিয়েত নিউরোসার্জারীতে যে এই এনেস্থেসিয়া দিয়ে বহুক্ষণ ধরে অপারেশন করলেও রোগী কোনই বেদনা অনুভব করে না। কাজেই আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই যে অপারেশন চলাকালে টেবিলে শুয়ে রোগী সার্জেনের সাথে কথাবার্তা বলে — তাঁর প্রশ্নের জবাব দেয় বা সার্জেনকে নিজের অবস্থার কথা জানায়। এমনকি ছোট শিশুরাও লোকাল এনেস্থেসিয়ার অপারেশন চমৎকার সহ্য করে। প্রায়ই দেখা যায় যে অপারেশনের সময় নার্স শিশুটির কাছে বসে তাকে গল্প শোনাচ্ছে বা তার প্রিয় খেলার পুতুল তাকে দেখাচ্ছে।

কিন্তু লোকাল এনেস্থেসিয়ার নানা গুণ থাকলেও বা সম্পূর্ণ বিপদবিহীনভাবে আধুনিক সার্জারীতে বহু দিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও তাকে সমস্ত রোগীর ও সমস্ত অপারেশনের একমাত্র বা সেরা এনেস্থেসিয়ার উপায় বলে গণ্য করা যায় না। নিউরোসার্জারীর অনেক কেসে সাফল্যের সঙ্গে ইণ্ট্রাভেনাস এনেস্থেসিয়া (যখন অজ্ঞান করার ওষুধ রক্তের শিরায় প্রবেশ করিয়ে বেহুঁশ করান হয়) বা ইনহেলেশন (inhelation) এনেস্থেসিয়া (যখন অজ্ঞান করার বাষ্প ইথার, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি নিঃশ্বাসের পথে ফুসফুসে প্রবেশ করান হয়) ব্যবহার করা

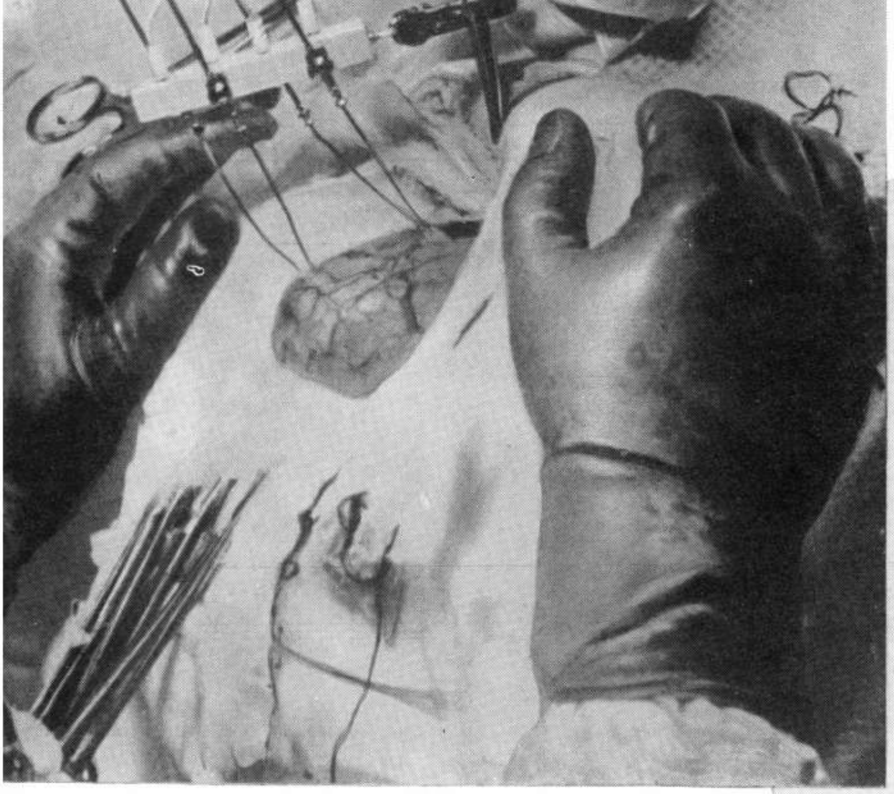

অপারেশন করে মস্তিষ্ক উন্মুক্ত করার পর বায়োইলেকট্রিক কারেণ্ট মেপে মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত টিউমারের স্থানটি সহজেই ধরা যায়।

মস্তিষ্কের ফ্রণ্টাল লোব থেকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নিউরোসার্জেন কর্তৃক অপসারিত বড় টিউমার (১২×১০×১০ সেণ্টিমিটার) এইরকম দেখতে।

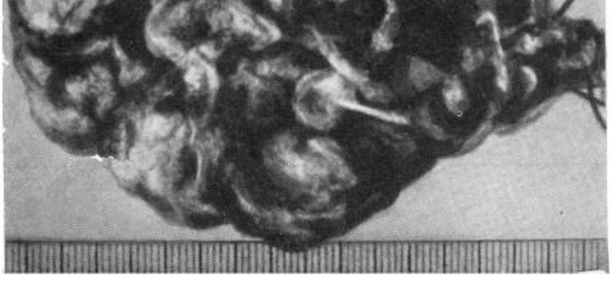

জীবিত মস্তিষ্কের রক্তের শিরায় কণ্ট্রাস্ট পদার্থ প্রবেশ করালে তার এক্সরে করে মস্তকের রক্তের শিরার ছবি পাওয়া যায়। নিউরোসার্জেনকে এখন ছবিতে দেখানো ইণ্টারন্যাল ক্যারটিড আর্টারির ঐ গোলাকৃতি এনিউরিজমটিকে কেটে বের করে আনতে হবে। এই অপারেশন খুবই শক্ত।

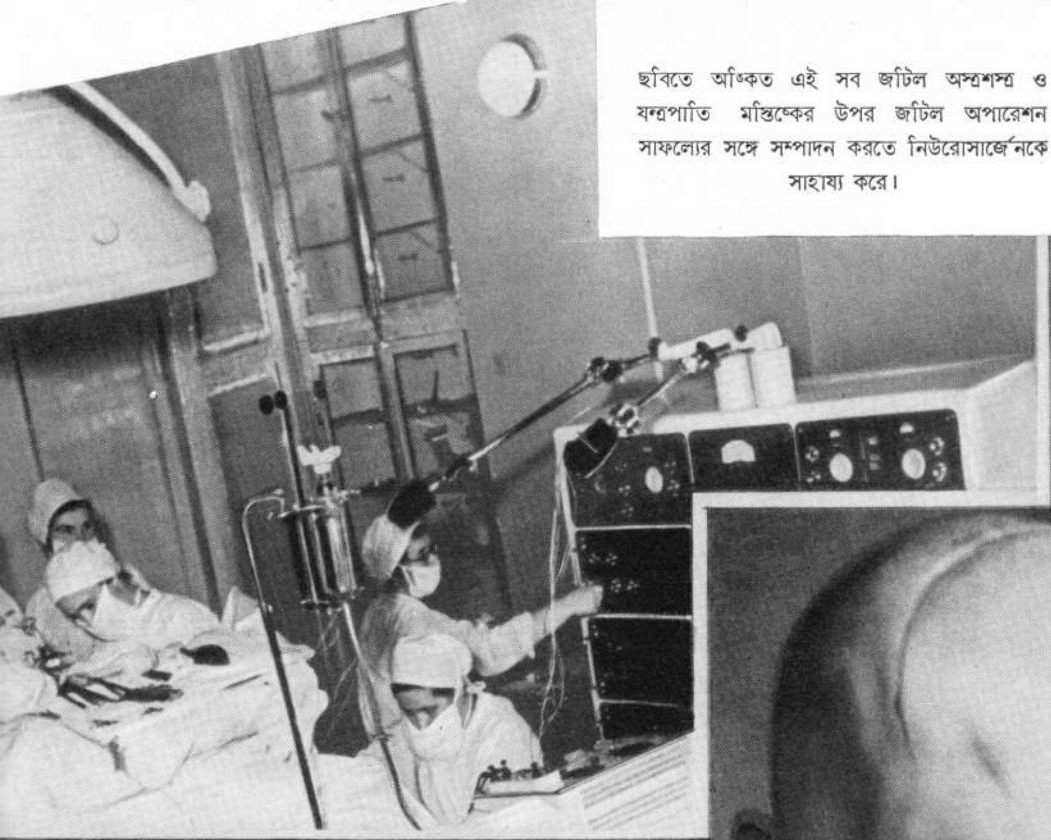

ছবিতে অঙ্কিত এই সব জটিল অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি মস্তিষ্কের উপর জটিল অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে নিউরোসার্জেনকে সাহায্য করে।

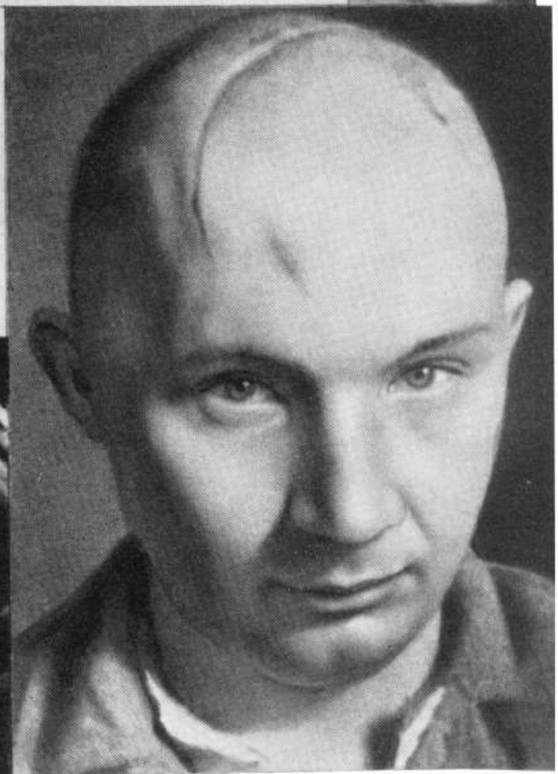

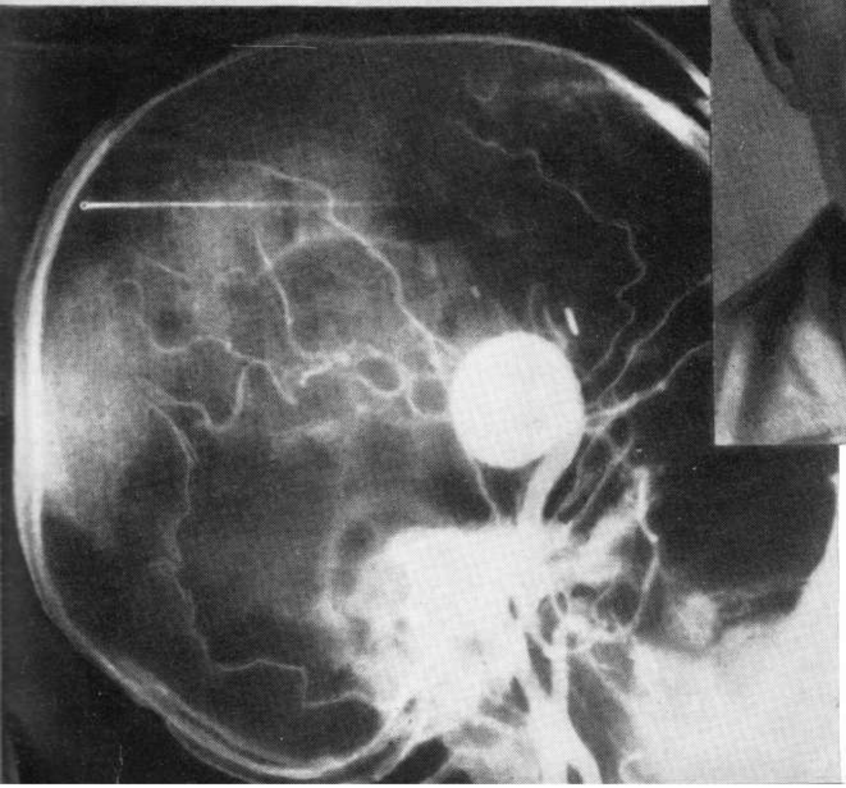

আঘাতের পর মস্তকের হাড়ের ছেঁদা বিশেষ প্লাস্টমাসের সাহায্যে ঢাকা হয়েছে, আর কিছুদিন পরে বাইরে থেকে দেখে এই শক্ত আঘাতের আর কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না.

হয়। শেষোক্ত এনেস্থেসিয়ার জন্য নানা রকমের জটিল আধুনিক অজ্ঞান করার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

নিউরোসার্জারীর অপারেশনের সময় অতি যত্ন সহকারে রোগীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাই নিউরোসার্জারীর অপারেশনের সময় অপারেশন থিয়েটারে আমরা যে শুধু অভিজ্ঞ ডাক্তারকেই দেখতে পাই তা নয় দেখি তাকে সাহায্য করার অনেক সূক্ষ্ম নির্ভুল অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি।

যতক্ষণ অপারেশন চলে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও তার শিরা উপশিরার ক্রিয়া, মস্তিষ্কের জৈব বিদ্যুৎ প্রবাহ, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ও তার দেহের তাপমাত্রা এবং রক্তের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়।

মস্তিষ্কের অপারেশন শুরু হয় মাথার চামড়া কেটে। এতে সাধারণত ঘোড়ার খুরের আকৃতি ইনসিশন দেওয়া হয়। চামড়া কেটে তাকে উল্টে দিয়ে সার্জেন খুলির হাড় ছিদ্র করতে আরম্ভ করেন। বিশেষ প্রকৃতির অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে মাথার খুলির মধ্যে একটা গোল 'জানালার' মতো ফাঁক সৃষ্টি করে সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে প্রথমে মস্তিষ্কের শক্ত আবরণীগুলি কেটে নিউরোসার্জেন মস্তিষ্কের সেই অংশে পৌঁছান যেখানে রয়েছে টিউমার, এবসেস বা ধাতব স্প্লিণ্টার। মাথার খুলির সেই ফাঁকের ডাইয়ামিটার করা হয় সাধারণত ৬ থেকে ৮ সেণ্টিমিটার।

মস্তিষ্কের ভিতর অপারেশন করা শেষ হলে ছিদ্র করে কেটে তোলা হাড়ের টুকরোটি আবার ঠিক খাপে খাপে ঐ ফাঁকের উপর বসিয়ে দেওয়া হয় আর মস্তিষ্কের সমস্ত আবরণী ও মাথার চামড়া নিপুণভাবে সেলাই করা হয় সিল্ক সুতো দিয়ে। ৩—৪ সপ্তাহ পরে, প্রায় চোখে পড়ে না, এই রকম সরু অপারেশনের দাগটি মনে করিয়ে দেয় যে মানুষটির মস্তিষ্কের ভিতর জটিল অপারেশন করা হয়েছিল।

এক কথায় বলা চলে যে নিউরোসার্জারীতে কোন সহজ অপারেশন নেই। মস্তিষ্কের অপারেশনে সার্জেনের প্রয়োজন গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং অপারেশনের সময় খুব মনোযোগ ও আগে থেকে অভ্যাস করে তৈরী করা, মাপা হাতের গতিবিধি। যেমন — হাইপোফাইসিসের টিউমার অপারেশন। হাইপোফাইসিস থাকে মস্তিষ্কের নীচে অনেক গভীরে। সার্জেনকে অতি সাবধানতা সহকারে ফ্রণ্টাল লোব একদিকে সরিয়ে, তাতে করে ফ্রণ্টাল লোব সহ মস্তিষ্ক ও মাথার খুলির ভিত্তির হাড়গুলির মধ্যে যে সরু অথচ গভীর ফাঁক সৃষ্টি হয় তার মধ্য দিয়ে গিয়ে হাইপোফাইসিসে 'পৌঁছতে' হয়। সে সময় অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন টেবিলের উপর ঝোলান মস্ত ছায়াবিহীন আলোটি নেভান হয়। সার্জেনের মাথায় শাদা টুপির উপর বাঁধা রিফ্লেক্টার সহ আলোটিও নিভিয়ে দেওয়া হয়; কেবল মাত্র এসিস্টেণ্ট

দেশলাই-এর কাঠির মাথার মতো অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক ল্যাম্প পরানো একটি সরু ধাতব ডাঁটি সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে সার্জেনের সামনে টিউমারে পৌঁছবার পথটি আলোকিত করে ধরে।

নিউরোসার্জারীর নতুন অধ্যায়

এম্বুলেন্সে করে একটি যুবককে নিউরোসার্জারীর ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দেওয়া হল। কালও ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। একদিনের জন্যও ওর কখন মাথা ধরেনি, কাজ করে, খেলে, সর্বদাই ও সুস্থ ছিল। সেদিন হঠাৎ ওর ভীষণ মাথা ধরল কয়েকবার বমি হবার পর ও জ্ঞান হারায়।

অবিলম্বে রোগীর স্পাইন্যাল পাংচার করলে পর সেখান থেকে রঙবিহীন স্বচ্ছ লিকরের পরিবর্তে সূচ দিয়ে বেরুল কালচে লাল রঙের রক্ত। ধরা পড়ল রোগীর এত খারাপ অবস্থার কারণটি কী। মস্তিষ্কের বহু আর্টারির একটি আর্টারি তার ছিঁড়ে গেছে ও সেখান থেকেই রক্ত এসে পড়ছে তার সাবএরাকনয়ড স্পেসে। ডাক্তারেরা এই রোগের নাম দিয়েছেন সাবএরাকনয়ডাল হেম্যারেজ (অর্থাৎ মস্তিষ্কের এরাকনয়ড আবরণীর তলায় রক্তপাত)।

মস্তিষ্কের রক্তপাতের কারণ কী? বয়স্ক লোক, যাদের রক্তের চাপ বেশী, তাদের রক্তের শিরার গায়ে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হেতু (আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস হয়ে) রক্তের শিরার গভীর পরিবর্তন হওয়ার দরুন মস্তিষ্কের মধ্যে এই রকম রক্তপাত হতে পারে। সাধারণত এর ফলে মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত রক্তের শিরা ফেটে যায় বা তাতে থ্রম্বোসিস হয়। বেরিয়ে পড়া রক্ত মস্তিষ্কের গোলার্ধের অভ্যন্তরে জমা হয় এবং অতি কদাচিৎ কখনও মস্তিষ্কের আবরণী পর্যন্ত যাবার পথ পায়।

কিন্তু যার রক্তের চাপ স্বাভাবিক বা আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসেরও কোন চিহ্ন নেই সেই রকম অল্পবয়সী যুবকের মস্তিষ্কের আর্টারি ফেটে যায় কেন? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ বয়সে রক্তের শিরা ফেটে যাওয়ার কারণ হল মস্তিষ্কের শিরার এনিউরিজম।

মনোযোগ সহকারে রোগীর মাথার এক্সরে ফটোর (প্লেটের) দিকে লক্ষ্য করুন। এটা অবশ্য সাধারণ এক্সরে প্লেট নয় এটা এঞ্জিওগ্রাম। এর সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে, আপনি এই প্লেটে দেখবেন কণ্ট্রাস্ট পদার্থ ভরা মস্তিষ্কের আর্টারির জাল। সে কণ্ট্রাস্ট পদার্থ ইঞ্জেকশন করা হয় ক্যারটিড আর্টারির মধ্য দিয়ে। মনোযোগ দিয়ে ছবির ত্রিশূলে চিহ্নিত জায়গাটি দেখুন, ওখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্ফীত গোলাকৃতি রক্তের শিরা যা কণ্ট্রাস্ট পদার্থ দিয়ে ভর্তি হয়েছে। ওটাই এনিউরিজম।

আমরা এখানে এই বিরল রোগটির উৎপত্তির জটিল বৈজ্ঞানিক থিওরি নিয়ে মাথা ঘামাব

না। কৌতূহল মেটাবার জন্য একটা কথা বলা যায় যে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ওয়ালটন বাইবেলে এক জায়গায় এমন এক বিবরণ পেয়েছেন যাতে মনে হয় যে এনিউরিজম ফেটে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে।

মনে রাখা দরকার যে যে-কোন শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ফলে রক্তের চাপ বেশী হয়ে 'থলের মতো' ফুলে যাওয়া এনিউরিজমের ভীষণভাবে সরু হয়ে যাওয়া দেওয়াল ফেটে যেতে পারে। এর ফলে ঠিক সেই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি। এনিউরিজম থেকে রক্তপাতের ফলে প্রায় অর্ধেক রোগী মরে যায়। রোগী যদি এতে বেঁচেও যায় তাহলেও তার আবার রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের রক্তের শিরার এনিউরিজম ফেটে গেলে পাঁচ জনের তিন জন মরে যায় একজন পঙ্গু হয় ও মাত্র একজন শুধু সেরে ওঠে।

কেমন করে এই সাংঘাতিক রোগটির চিকিৎসা করা হত? এই সেদিনও এসব কেসে পূর্ণ বিশ্রাম ও বিশেষ কাজের নয় এমন কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করা হত—বাস আর কিছু নয়।

মাত্র কয়েক বছর হল প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটি দেশের নিউরোসার্জেনরা এনিউরিজমের বিরুদ্ধে ভালো রকম তৈরী হয়ে লড়াই শুরু করেছে। অবশ্য এনিউরিজম বাদ দেওয়ার এক আধটা প্রচেষ্টা ঢের আগেও হয়েছে, এই যেমন ২০—৩০ বছর আগে, কিন্তু সেই সব নিউরোসার্জেনরা ছিল অসম সাহসী লোক, তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত ও কষ্টকর উপায়ে এনিউরিজম বাদ দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সে সময় নিউরোসার্জারী তখনও এত উন্নতি লাভ করতে পারেনি যাতে করে সাফল্যের সঙ্গে এই রকম অপারেশন শেষ করা যায়।

সত্যি, এই অপারেশনটি নিউরোসার্জারীর এক সবচেয়ে জটিল ও কঠিন অপারেশন। মস্তিষ্কে রক্ত পেঁছয় এমন চারটি মূল আর্টারির প্রধান প্রধান শাখা প্রশাখাগুলি নিউরোসার্জেনের পক্ষে মস্তিষ্কের সবচেয়ে দুর্গম জায়গায় অবস্থিত। সেগুলি থাকে একেবারে মস্তিষ্কের বেসের কাছে। সেখানে এই সব মোটা মোটা আর্টারির গুঁড়ি একত্রে যুক্ত হয়ে একটা বিশেষ বৃত্ত তৈরী করে। এনিউরিজম সাধারণত হয় এইসব মোটা মোটা আর্টারির গায়ে। অর্থাৎ এনিউরিজম সাধারণত হয়ে থাকে মস্তিষ্কের গভীরে, ব্রেন স্টেমের মতো সেই জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রগুলির কাছে।

সাফল্যের সঙ্গে মস্তিষ্ক শিরার এনিউরিজমের উপর অস্ত্রোপচার করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ডাইয়াগ্নোসিস। অর্থাৎ খুব ভাল করে জানা দরকার কোথায় এনিউরিজম হয়েছে, সেটা কত বড়, তার আকৃতি কী, সেখানে একটা এনিউরিজম না অনেকগুলি ইত্যাদি। এইরকম সব প্রশ্নের সবচেয়ে সঠিক উত্তর সার্জেন পায় মস্তিষ্কের এঞ্জিওগ্রাফির সাহায্যে। এঞ্জিওগ্রাফি সত্যিই ডাইয়াগ্নোসিসের এক চমৎকার উপায়।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে যে, মস্তিষ্কের রক্ত শিরার এনিউরিজম অপারেশন আজকাল যে-কোন সাধারণ হাসপাতালে করা সম্ভব। ভবিষ্যতে হয়ত তা হবে। এসব অপারেশন করতে হলে কেবল জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিউরোসার্জেন হলেই চলে না তার সাথে সাথে থাকা চাই আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও সেইসব বিশেষ ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি যা না হলে এই অপারেশন অসম্ভব। এই দুই-এর একত্র সমাবেশ হলে তবেই এমন রোগীর উপর অপারেশন করার নীতিগত অধিকার জন্মে।

মস্তিষ্কের শিরার এনিউরিজমের অস্ত্রচিকিৎসা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও উন্নতি লাভ করছে। এরই মধ্যে এই অপারেশনে মৃত্যুর হার এই রোগে সাধারণ চিকিৎসার মৃত্যু হারের তুলনায় অর্ধেকে কমে এসেছে, রক্ষা পাচ্ছে শত শত মানুষের জীবন।

নিউরোসার্জারীর সবচেয়ে বড় সমস্যা

দেহে এমন কোন অঙ্গ নেই যার ভিতর মস্তিষ্কের মতো এত রক্ত চলাচল করে। মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বড় ছোট অসংখ্য আর্টারি ও ভেন। ৫—৬ মিলিমিটার পুরু শিরা উপশিরা থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখা যায় না এই রকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার ঘন জাল সমস্ত দিক থেকে তাকে ছেয়ে রেখেছে।

এটা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় নিম্নলিখিত হিসাব থেকে। মস্তিষ্কের ওজন সাধারণত গোটা শরীরের ওজনের তুলনায় শতকরা দুই ভাগ মাত্র। কিন্তু নিয়মিত, সমস্ত জীবন ব্যাপী প্রতিবার সংকোচনে হৃৎপিণ্ড যতখানি রক্ত এওর্টার মধ্যে ঢেলে দেয় মস্তিষ্ক পায় তার শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ রক্ত। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে প্রায় এক লিটার রক্ত। এত প্রচুর রক্ত প্রবাহ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজের মূল্যবান পরিবেশ সৃষ্টি করে ও প্রতিনিয়ত মস্তিষ্কে সরবরাহ করে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন।

মস্তিষ্ক ঠিক যেন রক্তে ভরা স্পঞ্জের মতো। তাই যে সমস্ত কেসে মস্তিষ্ক টিসু কেটে টিউমার, এবসেস বা ধাতব স্প্লিণ্টার অপসারণ করতে হয় তাতে প্রচুর রক্ত ক্ষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। রক্তপাত নিবারণ করা বা তা শুরু হলে সে রক্ত বন্ধ করার উপায় খুঁজে বের করাই নিউরোসার্জারীর সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মনে করুন সার্জেন মস্তিষ্কের কর্টেক্স কেটে দেখলেন যে তার গভীরে টিউমার রয়েছে, এবং সেই টিউমার অপসারণে তিনি অগ্রসর হলেন। খুবই স্বাভাবিক যে এতে করে যে সমস্ত রক্তের শিরা মস্তিষ্ক টিসু থেকে টিউমারে প্রবেশ করছে তারা সমস্তই কাটা পড়বে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা থেকে রক্তপাত অপেক্ষাকৃত সহজেই বন্ধ করা যায়। যেখান থেকে রক্ত

পড়ছে সেখানে হলদে স্পঞ্জের মতো একটা জিনিষ বসিয়ে দেওয়া হয়, যাকে বলে ফাইব্রীন স্পঞ্জ। এই স্পঞ্জ খুব তাড়াতাড়ি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা শিরা থেকে রক্ত বেরুলে তা বন্ধ করা তত সহজ নয়। এর জন্য যেমন অনেক অভিজ্ঞতা দরকার তেমনি হাতের এমন কারিকুরি অভ্যাস করতে হয় যাতে সরু চিমটে দিয়ে মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত ক্ষতের সরু সরু আর্টারি যা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে তা চটপট 'ধরে ফেলা যায়'। আর্টারি যেমনি ধরা হল এসিস্টেণ্ট তখন সেই চিমটের সঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় একটি ধাতু নির্মিত সূচ। সূচটি এক লম্বা তারের সাথে যুক্ত যার উপর পরান থাকে একটা শাদা স্টেরাইল খোলস। এই সূচটিই হল অনেক ল্যাম্পযুক্ত জটিল ডাইয়াথার্মি যন্ত্রের কার্যকরী ইলেকট্রোড। ডাইয়াথার্মি যন্ত্রটি থাকে অপারেশন টেবিলের ঠিক পাশেই। উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক কারেণ্ট এক মুহূর্তে শিরার দেওয়ালকে পুড়িয়ে জোড়া দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে ফেলে।

অন্য আরও একটা উপায় আছে। সে হল বিশেষ লম্বা একটা ইনস্ট্রুমেণ্ট তাতে ইংরেজী অক্ষর 'ভি'এর মতো দেখতে ছোট ছোট রুপার তারের টুকরো পরান থাকে যাকে বলা হয় 'ক্লিপ'। সার্জেন ইনস্ট্রুমেণ্টটিকে জায়গা মতো নিয়ে টিপে দিলেন অমনি সেই তারের খণ্ডটি সোজা হয়ে বসে গিয়ে রক্ত পড়ছিল এমন শিরাটিকে চারপাশ থেকে চেপে ধরল। ঐ রুপার টুকরোটি মস্তিষ্কের গভীরে চিরকালের জন্য থেকে যাবে এবং তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হবে না।

ইদানিং নিউরোসার্জেনেরা রক্ত বন্ধের জন্য ফাইব্রিন স্পঞ্জের মতই আরও একটা জিনিস ব্যবহার করছেন সে হল হিমোস্ট্যাটিক গজ। জিনিসটা তৈরী সেলুলোজ থেকে — নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস দ্বারা অক্সিফাইড সেলুলোজ।

সহজ করে বলতে গেলে সাধারণ গজ থেকে একে তফাৎ করা যায় এই গজের হলদে রঙ দিয়ে। রক্তের প্রোটীন এই গজের সংস্পর্শে এলেই তা তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে গজের ফাঁকগুলি আটকে ফেলে তৈরী হয় থ্রম্বাস। তাছাড়াও রক্ত বন্ধকারী গজের আরও একটা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য হল এই, যে সেই গজ দেহের মধ্যে পুরোপুরি শুষে যায়, এতে কোন রকম মস্তিষ্কের ইরিটেশন বা ইনফ্লামেশন কিছুই হয় না। মস্তিষ্ক বা টিউমার সার্ফেসের যেখান থেকে রক্ত পড়ছে সেখানে নিউরোসার্জেন এক টুকরো এই রকম গজ পেতে দিতে পারলেই হল, রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

ফাইব্রিন স্পঞ্জ, রক্ত বন্ধকারী গজ, রক্তের শিরার কোআগুলেশন (coagulation) বা ক্লিপের সাহায্যে রক্ত বন্ধ করার যে সব উপায়ের কথা বলা হল এগুলি সবই ভাল উপায়, কিন্তু তাহলেও জটিলতর মস্তিষ্ক অপারেশনে রক্ত বন্ধের সমস্যার এখন পুরোপুরি সমাধান হয়নি।

মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা অভীষ্ট লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কখনো শেষ হয়ে যায় না।

নতুন নতুন আরও উন্নত ধরনের উপায় আস্তে আস্তে পুরন উপায়কে সরিয়ে বাতিল করে দেয় তা সে উপায় যতই ভাল হোক না কেন।

স্পঞ্জ ও গজ, ডাইয়াথার্মি ও ক্লিপ এখনও নিউরোসার্জারীতে উঁচু স্থান অধিকার করে আছে। এই সব হাতের কাছে না নিয়ে এখন আর কোন অভিজ্ঞ নিউরোসার্জেন অপারেশনে হাত দেয় না। গত দুতিন বছর হল ব্রেন সার্জারীতে রক্তপাত নিবারণ ও রক্ত বন্ধ করার এক সম্পূর্ণ নতুন উপায় ব্যবহার করা হচ্ছে। উপায়টি খুবই কার্যকরী ও এর ক্রিয়ার পদ্ধতিও একেবারে নতুন। এই উপায়টির উদ্ভাবন তথাকথিত গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লক (ganglionic block) করার পদার্থ আবিষ্কারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কী সেই পদার্থ?

আধুনিক নিউরোসার্জারীতে এই সব পদার্থের ও রক্তবন্ধের এই নতুন উপায়ের মূল্য কী তা বিচার করে এ সম্বন্ধে একটু বিষদভাবেই আলোচনা করা দরকার।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ মানে কী?

সকলেই জানে যে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম, অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ড ছাড়াও মানুষের দেহে আর একটি নার্ভাস সিস্টেম আছে। তার নাম ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেম। মেরুদণ্ডের দুই পাশের দুই নার্ভ-গ্যাঙ্গলিয়নের চেন (সিম্প্যাথেটিক স্টেম), দুই ভেগাস নার্ভ এবং মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল কর্ডের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বহু নার্ভ কোষের সমষ্টি নিয়ে তৈরী এই নার্ভাস সিস্টেম।

ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেম তার বহু সংখ্যক নার্ভ ও নার্ভের শাখা প্রশাখার সাহায্যে দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তার মধ্যে আছে হৃৎপিণ্ড, রক্তের শিরা উপশিরা, ফুসফুস, অন্ত্র, এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি। মেটাবলিজমের প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলিও এই নার্ভাস সিস্টেমই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আগে গোটা নার্ভাস সিস্টেমের এই অধিকতর প্রাচীন অংশটিকে 'স্বাধীন' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের প্রভাব মুক্ত সিস্টেম বলে মনে করা হত। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। মস্তিষ্ক, বিশেষ করে তার উচ্চতম বিভাগ বৃহত্তর গোলার্ধ দুটির কর্টেক্স নিয়মিতভাবে ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকলাপ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে ও এই উপায়ে শরীরের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গের কার্যকলাপ দেহের বাইরের পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

মানুষের গোটা নার্ভাস সিস্টেমে, যেমন কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম তেমনি ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমে উত্তেজনা বা নার্ভ ইম্পাল্‌স এক নার্ভ কোষ থেকে অন্য নার্ভ কোষে পৌঁছয় বিশেষ জটিল রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে। এইসব রাসায়নিক পদার্থের নাম রাখা হয়েছে নার্ভ ইম্পাল্‌সের 'মিডিএটর' বা পরিবাহক।

আজ খুব বেশী দিন হয়নি বিজ্ঞানী ফার্মাকোলজিস্টরা (যারা দেহের উপর ওষুধের ক্রিয়া অধ্যয়ন করেন) এক নতুন গ্রুপের রাসায়নিক পদার্থ বের করেছেন। এই পদার্থগুলোর বিশেষ গুণ হল সাময়িকভাবে নার্ভের ব্লক সৃষ্টি করা, অর্থাৎ ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের গ্যাঙ্গলিয়নগুলিতে উত্তেজনা বা ইম্পাল্স পৌঁছন বন্ধ করা। তাই এই সব দ্রব্যের নাম রাখা হয়েছে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক (গ্রীক ভাষায় গ্যাঙ্গলিয়ন মানে গুটি)।

এই সব গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের তালিকার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরী যে সব ওষুধ আছে তা হল টেটামন, প্যাকিকার্পিন, হেকসানিন, পেন্টামিন এবং অন্যান্য দেশে যে সব ওষুধ পাওয়া যায় তা হল হেকসামেথানিন (hexamethanin), পেণ্ডিয়ামিড্ (pandiamide), আর্ফোনাড (orphonade) প্রভৃতি। মানুষের দেহের উপর এই সব ওষুধের কাজ মোটামুটি প্রায় একই রকম। আমরা তাই এই সব ওষুধের মধ্যে সামান্য যা পার্থক্য আছে তা নিয়ে এখানে আর বিচার করব না।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ দিলে রোগীর দেহে কী কী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়? যে পরিবর্তন দেখা যায় তা যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির তেমনি জটিল। ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেম দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি, অংশত হৃৎপিণ্ড ও রক্তের শিরা উপশিরার উপর নিয়ত নিয়ন্ত্রণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহার করলে সে কাজ অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়ে যায়। গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ দেবার পর নার্ভ ইম্পাল্স যেগুলো আগে অনবরত রক্তের শিরায় পৌঁছত সেগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের গ্যাঙ্গলিয়নগুলির মুখের কাছে। রক্তের শিরা তখন সাময়িকভাবে তার স্বাভাবিক টোন হারায়, অসংখ্য ক্যাপিলারি ও আর্টেরিওল স্ফীত হয় ও তাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্তের শিরায় রক্ত ধারণের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় ও স্বভাবতই ঝট্ করে কমে আসে রক্তের চাপ। এই কারণেই ব্লাড প্রেসার রোগের চিকিৎসায় আজকাল গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুস্থ মানুষের সর্বোচ্চ রক্তের চাপ — অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনের সময় আর্টারির ভিতর যে রক্তের চাপ সৃষ্টি হয় সেইটি প্রায় ১১৫—১২০ মিলিমিটার পারদের চাপের সমান। যে-কোন গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহার করে এই চাপ কমিয়ে ৬০—৬৫ মিলিমিটারে নামিয়ে আনা যায়। কিন্তু রক্তের চাপ কমে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেলেও রোগীর তাতে কোন ক্ষতি হয় না, যদি না এই নিম্ন চাপের অবস্থা অনেকক্ষণ ধরে চলে। ব্যাপার হল এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপশিরাগুলি (আর্টেরিওল ও ক্যাপিলারি) স্ফীত হওয়ার ফলে তাতে রক্তস্রোতের গতি অনেক পরিমাণে কমে যায়, ফলে শরীরের সমস্ত টিসু ও অঙ্গ ধীরে চলা রক্ত থেকে তাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন টেনে নেবার যথেষ্ট সময় পায়। এর থেকেই বোঝা যায় গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহার করলে কেন রক্তের চাপ ও প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে

গেলেও মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী, যকৃৎ, কিড্‌নী প্রভৃতি শরীরের প্রধান অঙ্গগুলিতে হাইপক্সিয়া (hypoxia) বা অক্সিজেনের অভাব হয় না।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের ব্যবহারে শুধু যে রক্তের শিরার টোন কমে যায় তাই নয়, সেন্সারি নার্ভ ইরিটেশনের ফলে রক্তের চাপ ও হৃৎপিণ্ডের কাজের উপর সাধারণত যে রিফ্লেক্স পরিবর্তন হয়ে থাকে তাও বন্ধ হয়।

এখন মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার, কোন উদ্দেশ্যে ও কী ভাবে নিউরোসার্জারীতে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

এই উপায়টি একসঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য সম্পাদন করে। প্রথম উদ্দেশ্য অপারেশনের সময় রক্তপাত নিবারণ করা বা যতদূর সম্ভব তা কমান।

সকলেই জানে যে বেশী রকমের শক্ত সার্জিক্যাল অপারেশনগুলি, বিশেষ করে মস্তিষ্কের রক্তের শিরা ঘটিত টিউমার অপসারণের অপারেশন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বহুক্ষণ চলে, রোগী প্রায়ই তাতে প্রচুর রক্ত হারায়। সার্জেনকে রক্ত বন্ধের জন্য কখন কখন যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ও একাগ্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় এবং তার জন্য বহু সময়ও তাকে ব্যয় করতে হয়। মাঝে মাঝে অপারেশনে এত বেশী সময় লাগে যে টিউমার পুরোপুরি অপসারণ না করেই তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করে ফেলতে হয়।

যদিও সার্জেনদের হাতে আজকাল রক্তপাত বন্ধের নানা রকম উপায় আছে ও অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের পরিণতি রোধ করার জন্য রয়েছে সেই অতুলনীয় উপায় — রক্তের শিরায় রক্ত বা রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমন পদার্থের পরিসঞ্চালন; তাহলেও খুব বেশী রকম রক্তপাত হলে রোগীর অপারেশন জনিত সকের অবস্থা দেখা দিতে পারে। বহুদিন হল প্রমাণ হয়ে গেছে যে, রোগী অপারেশন টেবিলে যত কম রক্ত হারায় তত নির্বিঘ্ন ও মসৃণ ভাবে চলে তার অপারেশনের পরবর্তী পর্ব।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ দিলে যদি রক্তের চাপ খুব নীচে নেমে যায় তাহলে স্বভাবতই অপারেশনের সময় রক্তপাত অনেক কম হওয়ার কথা। কার্যতও কিন্তু দেখা যায় তাই। সমস্ত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম রক্তের শিরাগুলি থেকে এতে করে রক্ত ঝরা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ও অপারেশনের ক্ষেত্রটি একেবারে শুকনো হয়ে থাকে। অনেক সময় খুব কঠিন কঠিন দীর্ঘ অপারেশনগুলিও এতে করে একেবারে রক্তবিহীনভাবেই চলে।

অপারেশনের সময় গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের প্রয়োগকে বলা হয় হাইপোটেনশন উপায়ের অপারেশন। কেননা এতে কৃত্রিম উপায়ে রক্তের চাপ কমানো হয়।

উদাহরণস্বরূপ, এখানে অপারেশনের সময় সোভিয়েত গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ পেণ্টামিন প্রয়োগের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলছি। পেণ্টামিন হল শাদা স্ফটিকময় হাইগ্রস্কোপিক পাউডার, যা খুব তাড়াতাড়ি জলে, স্পিরিটে ও এসিটোনে গলে যায়।

তার আরও একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে পেণ্টামিন ও অন্যান্য গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ যেমন সামগ্রিক এনেস্থেসিয়া তেমনি লোকাল এনেস্থেসিয়ার সাথে ব্যবহার করা চলে। দেখা গেছে যে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের আরও একটা গুণ আছে, তা ব্যবহার করলে অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যারকটিক বা অজ্ঞান করার পদার্থও ঢের কম খরচ হয়।

অপারেশনের শুরুতে রোগীর ভেনের মধ্যে একটু বেশী মাত্রাতেই পেণ্টামিন ইঞ্জেকশন করা হয় তারপর প্রয়োজন হলে তা আবার দেওয়া যায় যদিও মাত্রার পরিমাণ আসলে নির্ভর করে রক্তের চাপের উপর। দ্বিতীয় বার দিতে হলে ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হয় কম মাত্রায়। আর্ফোনাডের মতো কোন কোন গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক ওষুধ গোটা অপারেশনের সময় জুড়ে ভেনের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে অনবরত দেওয়া হয়।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের প্রতি শরীরের প্রতিক্রিয়া বা এই পদার্থের প্রতি শরীরের স্পর্শকাতরতা সব ক্ষেত্রে এক রকম নয় — তা নির্ভর করে রোগী মেয়ে না পুরুষ, তার বয়স, শরীরের ওজন, সাধারণ অবস্থা ও আরও অন্যান্য জিনিষের উপর। কাজেই সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ও সাবধানতা। একটা বড় অপারেশনে ৫০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত পেণ্টামিন লাগে।

অপারেশনের সময় যাতে আরও ভাল করে রক্তপাত নিবারণ করা যায় তার জন্য গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ দেবার পর শরীরের যে অংশে অপারেশন হবে সেই অংশকে সবচেয়ে উঁচু লেভেলে রেখে অপারেশন করা হয়। মস্তিষ্ক অপারেশনের সময় তাই মাথাকে ঠেলে খানিকটা উঁচু করে পায়ের দিকটা নীচু করে দেওয়া হয়।

শেষোক্ত উপায়টির কী উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে সুস্থ মানুষে, সাধারণ অবস্থায় রক্তের চাপ দেহ রাখার ভঙ্গি বা শরীরের পস্চারের উপর নির্ভর করে না। মানুষ দাঁড়িয়ে থাকুক বা শুয়েই থাকুক তাতে করে পদার্থবিদ্যার নিয়মবিরুদ্ধ হলেও কার্যক্ষেত্রে রক্তের চাপ বদলায় না। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা একমাত্র কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকলাপ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় আমাদের শরীরের জটিল নার্ভ-রিফ্লেক্স মেকানিজমের অস্তিত্ব দিয়ে 'যা সর্বদা চেষ্টা করছে রক্তের চাপের সমতা বজায় রাখতে' (ই. প. পাভলভ)। দেহ রাখার ভঙ্গি বদলানর সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস সিস্টেম, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রিফ্লেক্সের সাহায্যে রক্তের শিরার টোন বদলে তার মারফৎ বিভিন্ন অঙ্গে রক্তের পরিমাণ পুনর্বণ্টন করে অবিলম্বে রক্তের চাপ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ শরীরে দেওয়ার পর সাময়িকভাবে এই সব রিফ্লেক্স মেকানিজম ব্যাহত হয় তাই শরীরের সেই অংশ যেখানে অপারেশন চলছে তা উঁচু করে ধরলে পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী সেখান থেকে রক্ত নীচে চলে যায়। অপারেশনের জায়গায় কম রক্ত সরবরাহ

হওয়া ও ধমনীর সাধারণ রক্তের চাপ কমে যাওয়া এই দুইটি জিনিষ একত্রে অপারেশনের সময় রক্তপাত অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেয়।

কাজেই, গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ বারবার ইঞ্জেকশন করা ও অপারেশন টেবিলে রোগীকে শোয়ানর ভঙ্গি বদলান, এই দুই উপায় অবলম্বন করে নিউরোসার্জেন আজ 'ধমনীর রক্তের চাপের মতো' দেহের মূল্যবান ফাংশন নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে যেতে পারে।

এক কথায়, অপারেশনের ধাপ, রক্তপাতের বিপদ ও রোগীর সাধারণ অবস্থা বিচার করে প্রয়োজন মত সার্জেন আজ রক্তের চাপ কমাতে বা বাড়াতে পারেন বা একই অবস্থায় রক্তের চাপ ধরে রাখতে পারেন।

আমরা আগেই বলেছি যে সার্জারীতে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্য পালন করে থাকে, কিন্তু তার মাত্র একটা উদ্দেশ্যের কথা এতক্ষণ বর্ণনা করেছি সে হচ্ছে অপারেশনের সময় রক্তপাত নিবারণ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আরও ঢের বেশী ব্যাপক, কেননা এর দ্বারা রোগীর সমস্ত শরীরের উপর প্রভাব বিস্তৃত হয়। গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ আধুনিক সার্জারীর অন্যান্য উপায়ের মতই শরীরের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা কমিয়ে রাখার এক চমৎকার ওষুধ। অর্থাৎ তা দাবিয়ে রাখে শরীরের সেই সব ভীষণ ও এলোমেলো রিএকশন বা প্রতিক্রিয়া যা দেখা দেয় অসম্ভব রকমের জোরাল ইরিটেশনের ফলে। সে ইরিটেশন আসে, যেমন শরীরের বাইরে থেকে তেমনি ভিতর থেকে। (ই. প. পাভলভ এই সব ইরিটেশনকে 'সহ্যসীমার বাইরের' ইরিটেশন নামে অভিহিত করেছেন)।

শরীরের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক ঐ রকম এক প্রতিক্রিয়া হল অস্ত্রপোচার ও আঘাত জনিত ট্রমাটিক সক, যার অর্থ কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের ক্রিয়া বিকল হয়ে রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, ও মেটাবলিজমের কাজে গভীর ব্যাঘাত হওয়া। অপারেশন যত বেশীক্ষণ ধরে চলে তত বেশী হয় অপারেশন জনিত আঘাতের পরিব্যাপ্তি ও গভীরতা। অপারেশন যত বেশী জটিল তত বেশী তাতে সমস্ত রকম পরিণতি সহ সক হওয়ার সম্ভাবনা।

ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের হাইপার এক্সাইটমেন্ট ও তৎপরবর্তী ফেটিগই মূলত সক, মস্তিষ্কের স্ফীতি, হৃৎপিন্ডের অক্ষমতা, রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত, ফুসফুসে জল জমা, প্রভৃতি অপারেশনের পরবর্তী কালীন ভয়াবহ জটিলতা (complication) সৃষ্টি করে থাকে।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ অপারেশনের আঘাতের ফলে দেহে যে অতি মাত্রার প্রতিক্রিয়া হয় তাকে অনেক পরিমাণে দাবিয়ে রাখে এবং তাতে করে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিবারিত হয়। আকাডেমিশিয়ন ন. ন. বুর্দেঙ্কোর নিউরোসার্জারী ইনস্টিটিউটে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের কার্যপদ্ধতির এ রকম ব্যাখ্যা গৃহীত হয়। সেখানে মস্তিষ্কের কঠিন কঠিন অপারেশনে ব্যাপকভাবে এইসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেম, তার কেন্দ্র ও নার্ভগুলিতে ইম্পাল্স যাওয়া ব্লক করতে পারলে মানুষ যথেষ্ট সহজে অপারেশন সহ্য করতে পারবে ও অপারেশনের পর উপরোক্ত জটিলতাগুলির আবির্ভাব সম্পূর্ণ রোধ করা যাবে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক দ্রব্যাদি ব্যবহারের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে এই অভিমতের সত্যতাই প্রমাণ করে।

সর্বপ্রথমে প্রমাণিত হয় যে, গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থগুলির খুবই সক বিরোধী ক্রিয়া আছে। যদিও রক্তের চাপ এতে খুবই কমে যায় (কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তের চাপ নেমে আসে ৫০—৫৫ মিলিমিটারে) তাহলেও অপারেশনের সময় সাধারণত সকের কোন উপসর্গ দেখা যায় না। রোগী সজ্ঞানে শান্তভাবে সার্জেনের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায় (এটা অবশ্য সম্ভব যখন অপারেশন করা হয় লোকাল এনেস্থেসিয়া দিয়ে)। অপারেশনে সক হলে রোগীর চামড়া ফ্যাকাশে বা শাদা হয়ে যায়, অস্বাভাবিক ঘাম হয়, নাড়ী দুর্বল হয়ে অতিদ্রুত চলতে থাকে। কিন্তু গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লকে তেমন ভয়ঙ্কর উপসর্গ সাধারণত হতে দেখা যায় না।

কঠিন অপারেশনের পর কখন সখন একটা খুব খারাপ জটিলতা দেখা দেয়, সে হল ফুসফুসে জল জমা। এই জটিলতা একবার হলে তাকে সারান খুবই মুশকিল। আমরা বহুদিন ধরে জানি যে খরগোসের রক্তের শিরায় বেশী মাত্রায় এড্রিন্যালিন ইঞ্জেকশন করলে তার মারাত্মক ফুসফুসের ইডিমা হয়। কিন্তু ইদানীং এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে, মরে যেতে পারে এমন মাত্রায় এড্রিন্যালিন দেওয়ার আগে খরগোসকে যদি গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ দেওয়া হয় তাহলে আর ফুসফুসের ইডিমা হয় না এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খরগোস বেঁচে যায়।

আকাদেমিশিয়ন ন. ন. বুর্দেঙ্কোর নিউরোসার্জারীর ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অপারেশনের পর মস্তিষ্ক স্ফীতি, ফুসফুসে জল জমা, রক্তপ্রবাহের ভীষণ রকমের অক্ষমতা প্রভৃতি জটিলতা নিবারণে বা তার চিকিৎসায় গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থের মূল্য সন্দেহাতীত।

সার্জেনরা সকলেই জানেন যে, যে সমস্ত জটিলতার কথা আমরা বললাম তার অনেকগুলি শুধু যে অপারেশনের সময়েতেই দেখা দেয় তা নয় এমনকি অপারেশনের দুতিন দিন পরও তার উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ যা অপারেশন টেবিলেই শুধু রোগীর ভেনে ইঞ্জেকশন করা হয় তার ক্রিয়ার মেয়াদ মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এই কারণে নিউরোসার্জারীর ইনস্টিটিউটে ঠিক করা হয় যে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ শুধু যে অপারেশনের সময়ই দেওয়া উচিত তাই নয়, অপারেশনের পরও দুই-তিন দিন ধরে তা দেওয়া দরকার।

ভেজিটেটিভ নার্ভাস সিস্টেমের ব্লকাড খানিকটা অগভীর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেশ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার এবং এর সাহায্যে রক্তের চাপ তীব্রভাবে নামিয়ে আনা সঙ্গত নয়, তবে ১৫—২০ মিলিমিটারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ। এটা করা সম্ভব হয় যদি ভেনের মধ্যে দেওয়ার পরিবর্তে মাংসপেশীর মধ্যে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ইঞ্জেকশন করা যায়, কেননা তাতে করে ওষুধের ক্রিয়া বজায় থাকে প্রায় ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত।

গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহার করে সার্জারীতে সাধারণভাবে কী কী ফল লাভ করা গেছে ? আগে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার উপর ইনস্টিটিউটের প্রচুর অভিজ্ঞতা থেকে আরও কতগুলি তথ্য যোগ করা যায়। ইনস্টিটিউটে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ ব্যবহার করে ১,৬০০টিরও বেশী কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের শক্ত অপারেশন হয়েছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই হল মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের টিউমার অপসারণের অপারেশন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্যাঙ্গলিয়ন ব্লককারক পদার্থ শুধু যে অপারেশনের সময় দেওয়া হয় তা নয়, অপারেশনের পরও তা চালিয়ে যাওয়া হয়। এই অপারেশনগুলির সময় এমনকি মস্তিষ্কের টিউমার, যার মধ্যে ভীষণ রক্ত চলাচল করে, তার অপারেশনেও, অপারেশন জনিত সক কখনও হতে দেখা যায়নি। এর ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টিউমারের র‍্যাডিক্যাল অপারেশন বা নানা রকমের মস্তিষ্ক টিউমার পুরোপুরি কেটে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়। তেমনি এই সব অপারেশন সম্পাদন করতেও এতে ঢের কম সময় লাগে। এই নতুন উপায়টির সাহায্যে নিউরোসার্জেনরা এখন মস্তিষ্কের গভীরে রয়েছে এমন বড় বড় টিউমারও অনায়াসে কেটে বাদ দিতে পারেন যাকে আগে অপারেশনের অযোগ্য বলে গণ্য করা হত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই উন্নতিটির ফলে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের টিউমার অপারেশনে মৃত্যুর হার কমে এসেছে প্রায় দুইগুণ। এই উপায় অবলম্বন করে অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি সবচেয়ে কঠিন ও জটিল অপারেশনের পরও, রোগীর অবস্থার তেমন কোন অবনতি পরিলক্ষিত হয়নি এবং ঢের তাড়াতাড়ি ও অনেক বেশী পরিমাণে ফিরে এসেছে মস্তিষ্কের হারানো কার্যক্ষমতা।

হাড়ের বদলে প্লাস্টিক

মাথার খুলির হাড়ের ডিফেক্টে প্লাস্টিক অপারেশন নিউরোসার্জারীর অন্যতম চমকপ্রদ সাফল্য। হাড়ের ডিফেক্টে প্লাস্টিক অপারেশন মানে কী ?

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় ম... স্প্লিণ্টারের আঘাতে মাথায় ভীষণ চোট পায়। মাথার ঘা তার সেরে গেল, কিন্তু সেখানে মাথার খুলির হাড়ে রয়ে গেল মস্ত বড় ফাঁক, তার উপর স্পন্দনরত শুকনো ঘায়ের লম্বা চল্‌টা। কথাটা এই নয় যে, সে জায়গায় হাড় না থাকার দরুন

তাকে দেখতে বিশ্রী লাগছিল, ভয় ছিল এই যে এ জায়গায় আবার কোন চোট লাগলে বিনা বাধায় সে চোট গিয়ে পড়বে মস্তিষ্কের উপর যার ফল হবে গুরুতর। তাছাড়াও মাথার নরম টিস্যুর মোটা চল্‌টা এই জায়গাটিতে সোজাসুজি একেবারে মস্তিষ্ক টিস্যুর সাথে জড়িয়ে গিয়ে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি করছিল। এতে এক এক সময় তার এপিলেপ্টিক ফিটও হত (অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও হাতপা খিঁচুনি)।

বোঝা গেল চল্‌টাটি ব্রেন ইরিটেট করছিল। নিউরোসার্জেন খুব মনোযোগের সঙ্গে ম...এর সেই মস্তিষ্কের সাথে জড়িয়ে যাওয়া চল্‌টা কেটে মাথার ক্ষতের উপর এক নরম ও মোলায়েম ফাইব্রিনের পাত বসিয়ে দিলেন। ফাইব্রিন পাতের বৈশিষ্ট্য এই যে তা মস্তিষ্ক টিস্যুর গায়ে জড়িয়ে যায় না।

এরপর ম...এর মাথার খুলির স্বাভাবিক আকৃতি পুরোমাত্রায় ফিরে আসে। রয়ে যায় শুধু, দেখা যায় না, এইরকম সরু একটা দাগ। মাথায় যখন চুল গজাবে তখন এও আর দেখা যাবে না। সার্জেন হাড়ের ডিফেক্ট বন্ধ করেন আগে থেকে তৈরী ও সযত্নে নির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়া প্লেট দিয়ে। প্লেটটি তৈরী দুধের মতো শাদা বিশেষ রকমের প্লাস্টিক দিয়ে। এই রকম প্লাস্টিককে বলা হয় পলিমেথিলমেটাক্রিলেট। শক্ত সিল্কের সুতো দিয়ে প্লেটটিকে ভাল করে মাথার খুলির হাড়ের সাথে সেলাই করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার এই অপারেশন শুধু যে রোগীর বাইরের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনে তাই নয়, সাধারণত এতে তাদের মাথার যন্ত্রণা দূর হয়, ফিট বন্ধ হয় ও সাধারণ স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয় অপারেশন

মস্তিষ্ক ও তার আবরণীর ইনফ্লামেটারী অসুখের পর তার পরিণতি হিসাবে যে সব পরিবর্তন রয়ে যায় তার চিকিৎসা করাও নিউরোসার্জারীর এক প্রধান অঙ্গ। এই রকম এক অসুখের কথা এখন বলব।

এমন লোক খুঁজে বের করা কষ্ট যার কোনদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। সাধারণত এই অসুখটি ভালয় ভালয় সেরে ওঠে। কিন্তু এক আধটা কেসে এবং সুখের বিষয় তা অতি কদাচিৎ, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর নানা রকমের সাংঘাতিক জটিলতা দেখা দেয়, যেমন বেস্যাল (basal) মেনিঞ্জাইটিস। এতে ইনফেকশন মস্তিষ্কের বেসের এরাকনয়ড আবরণী (arachnoid membrane) পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করে। এই অংশে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের গভীরে থাকে অপ্টিক নার্ভ। ইনফ্লামেশনের ফলে এখানে যে শক্ত এড্‌হিশন (adhesion)

হয় তা ঠিক যেন চিমটের মতই কোমল অপ্টিক নার্ভ দুটিকে চেপে ধরে। তাতে অপ্টিক নার্ভের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় ও মানুষটি অতি দ্রুত চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।

এসব ক্ষেত্রে যদি ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসায়, বিশেষ করে এণ্টিবায়োটিক চিকিৎসায়, (পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, বাইওমাইসিন প্রভৃতি) ফল না পাওয়া যায় তাহলে পর সেই রোগীকে একমাত্র নিউরোসার্জেনই সাহায্য করতে পারে।

কপালের হাড় ট্রিফাইন করে সেখানে গর্ত সৃষ্টি করে সার্জেন অতি সাবধানে মস্তিষ্কের ফ্রণ্টাল লোব সরিয়ে অপ্টিক নার্ভ ও অপ্টিক নার্ভ দুটি যেখানে ক্রশ করে সেই জায়গাটি খুঁজে বের করে স্পাইক ও এড্‌হিশন যা নার্ভকে চেপে ধরেছে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তা ভাল করে কেটে পরিষ্কার করেন।

অপারেশনের পর এক থেকে দুই সপ্তাহ যেতে না যেতেই আগে যার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাত্র ১০০ ভাগের ১ ভাগ দৃষ্টিশক্তি বজায় ছিল সে ক্রমশই ভাল দেখতে শুরু করে, নতুন করে চিনতে আরম্ভ করে চারদিকের নানা রকম জিনিষ এবং ২—৩ মাসের মধ্যেই তার সহজে খবরের কাগজ ও বই পড়ার শক্তিও ফিরে আসে। সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ তন্তুর সমষ্টি অপ্টিক নার্ভ দুটি আবার কাজ করতে শুরু করে দেয়।

নিউরোসার্জারী জয়লাভ করছে

যে রোগীর মস্তিষ্কে টিউমার হয়েছে তাকে সারিয়ে আবার তার কাজের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা? এই প্রশ্ন যদি করা হয়, অনেক পাঠকই মনে হয় এই জবাব দেবেন যে, না, তা সম্ভব নয়। মনে করা স্বাভাবিক যে টিউমার মস্তিষ্কের টিসু নষ্ট করে দেহের মূল্যবান ফাংশন চিরতরে এমন ভাবে নষ্ট করে যে, তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সকলেই জানে যে নার্ভ কোষ অতি উচ্চ সংগঠিত কোষ ও তা যে-কোন ক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই কোষ বংশবৃদ্ধি করতে জানে না, তাই মরে গেলে এর শূন্য স্থান পূরণ করার কিছুই থাকে না। দেহের অন্যান্য কম মূল্যবান কোষের সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য, এইখানেই মস্তিষ্ক টিসুর সাথে কানেকটিভ টিসুর তফাৎ।

উপরের এই সমস্ত কথা কটি সবই সত্যি, কিন্তু তা হলেও ন. ন. বুর্দেঙ্কোর নিউরোসার্জারী ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জোরের সঙ্গে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে বেশীর ভাগ মস্তিষ্ক টিউমারের কেসে সার্জিক্যাল অপারেশন শুধু যে রোগীর জীবন ফিরিয়ে দেয় তাই নয়, তার কার্যক্ষমতাও পুনরুদ্ধার করে। আজ পর্যন্ত ঐ ইনস্টিটিউটে এ রকম হাজার হাজার অপারেশন হয়েছে। অবশ্য এ সব কেসে রোগ বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার আগে সময়মত অপারেশন করা উচিত।

যদিও এসব কথা প্রথম প্রথম যেন, অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তা হলেও দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের এক বড় অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও রোগী শুধু যে সেরে ওঠে তাই নয়, তার চলাফেরা, স্পর্শশক্তি, শরীরের ভারসাম্য রাখার ক্ষমতা, দৃষ্টি, শ্রবণ প্রভৃতি দেহের মূল্যবান কাজগুলিও সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকে। নিউরোসার্জেনেরা প্রতিদিন মস্তিষ্কের এই অদ্ভুত ক্ষমতা নিজ চোখে লক্ষ্য করে থাকেন। একেই বলা হয় নার্ভাস সিস্টেমের প্লাস্টিসিটি বা পূর্বে নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্রিয়া পুনরুদ্ধার ও পরিপূরণের ক্ষমতা।

ফাংশন পুনরুদ্ধারের প্রশ্নটি সম্বন্ধে গভীর গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন মহান ফিজিওলজিস্ট আকাদেমিশিয়ন ই. প. পাভলভ। তারপর এ নিয়ে কাজ চালিয়ে যান তাঁর ছাত্র প. ক. আনোখিন ও এ. আ. আস্রাতিয়ান। মস্তিষ্কের ফাংশন পুনরুদ্ধারের অনেক উদাহরণ দেওয়া সম্ভব তবে আমরা এখানে শুধু কয়েকটি উদাহরণের কথাই উল্লেখ করব।

দশ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা আকাদমীর পূর্ণ সদস্য প্রফেসর ব. গ. ইয়েগোরভ একজন অল্পবয়সী বেহালা বাজিয়ের উপর অপারেশন করেন। তার মস্তিষ্কে মস্ত বড় টিউমার হয়েছিল, তার ফলে তার সেরিবেলামের একটি গোলার্ধ প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। অপারেশন করে টিউমারটিকে বাদ দেওয়া হয়।

সুবিদিত যে সেরিবেলাম মস্তিষ্কের এক প্রয়োজনীয় অংশ এবং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার সূক্ষ্ম কাজের সমন্বয় ও শরীরে ব্যালান্স বা ভারসাম্য। মনে হয়েছিল যে এই অপারেশনের পর সেই বাজিয়ের হাতের নড়াচড়া ও আঙ্গুলের সূক্ষ্ম কারিকুরি যা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা হয়ত আর ফিরে আসবে না, আর যদি বা ফেরে তাহলেও তা এমন হবে না যে, সে আবার বেহালা হাতে নিতে পারে। কিন্তু অপারেশনের ৬ মাসের মধ্যেই বাজিয়ে আবার বেহালা হাতে তুলে নেয়। তারপর আজ ১০টা বছর পার হয়ে গেছে এবং এই দশ বছর ধরে সে মস্কোর কোন এক থিয়েটারের অর্কেস্ট্রায় নিয়মিত বেহালা বাজিয়ে চলেছে। তার বাজনা এখন অসুখের আগের বাজনার তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয়।

আরও একটা উদাহরণ দিই। নিউরোসার্জারী ইনস্টিটিউটে একজন রোগীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি করা হয়। তার নাম ও ...। সে নিজে বৈজ্ঞানিক কর্মী। ইনফ্লামেশনের ফলে তার একিউট হাড্রোসেফালাস (acute hydrocephalus) হয়, অর্থাৎ তার মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্লে জল জমে যায় ও মস্তিষ্কের উপর কড়া চাপ সৃষ্টি হয়ে অনেক মূল্যবান ফাংশন নষ্ট হয়, দেখা দেয় মানসিক গণ্ডগোল। প্রফেসর ল. আ. কারেইশা সেই রোগীর উপর শক্ত অপারেশন করেন। সে অপারেশনের মূল ব্যাপারটি এই রকম — সার্জেন খুব সাবধানে ফ্রণ্টাল লোব সরিয়ে মস্তিষ্কের বেসের কাছে গিয়ে তৃতীয় ভেণ্ট্রিক্লের পাতলা হয়ে যাওয়া দেওয়ালের গায়ে এক ছিদ্র করে দেন এবং এতে করে মস্তিষ্কের ভেণ্ট্রিক্ল থেকে সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইড

প্রবাহের এক কৃত্রিম রাস্তা তৈরী হয়ে যায়। অপারেশনের পরই সেই রোগীর সমস্ত কঠিন উপসর্গগুলি অন্তর্হিত হয় এবং তার দুবছর পর রোগী সাফল্যের সঙ্গে থিসিস সাবমিট করে 'ক্যান্ডিডেট অব ফাইললজিক্যাল সায়েন্স' ডিগ্রী পান। এখন তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন ও মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ।

স্পাইন্যাল কর্ডের ক্রিয়া দ্রুত ও পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের কেসগুলিও কম উপভোগ্য নয়। কয়েক বছর আগেকার কথা, একটি রুগীকে নিয়ে এল ইনস্টিটিউটে, দুমাস হল তার দুই পা অবশ হয়ে গেছে। পুরুষ মানুষ, এমনিতে বলিষ্ঠ দেহ, সে মিলিটারি অফিসার। কিন্তু দুমাস হল একেবারে অথর্ব। দেখে মনে হল যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিনের জন্য তাকে বিছানা নিতে হল। খুব ভাল করে সমস্ত দিক থেকে পরীক্ষা করে ডাইয়াগ্নোসিস করা হল স্পাইন্যাল কর্ডের থোরাসিক অঞ্চলে টিউমার হয়েছে।

সার্জেন মেরুদণ্ডের কেনাল কেটে ছোট্ট একটা টিউমার সম্পূর্ণ অপসারণ করলেন। ঐ টিউমারটাই স্পাইন্যাল কর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। অপারেশনের পর আজ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু লোকটি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ।

* * *

মিখাইল ইভানভিচ কালিনিন এক সময় চমৎকার একটা কথা বলেন, 'সবচেয়ে মূল্যবান যা আমাদের আছে, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় মূলধন — সে হল আমাদের সোভিয়েতের মানুষ। কাজেই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা ও তাদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কাজ করা এক সবচেয়ে জনহিতকর পেশা।'

আধুনিক নিউরোসার্জারী মেডিসিনের অন্যান্য বিভাগের মতই আজ অনেক চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তাহলেও একে এখনও অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আগামী কয়েক বছরে সোভিয়েত নিউরোসার্জেনেরা তাঁদের সমস্ত সৃজনশীল শক্তি দিয়ে ঐসব সমস্যা সমাধানেই যে মনোনিবেশ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

ন. ম. মিখেলসন
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

ম. ব. কুশানির
প্রফেসর

মুখমণ্ডলের অস্ত্রচিকিৎসা

সার্জিক্যাল চিকিৎসার বিশেষত্ব এই (গ্রীক ভাষায় 'সার্জারী' কথার অর্থ — 'হাত চালিয়ে কাজ করা') যে এতে সার্জেন স্ক্যালপেলের সাহায্যে শরীরের রোগগ্রস্ত অংশ কেটে ফেলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সেই রোগগ্রস্ত অংশটি তার চারপাশের টিস্যু বা গোটা শরীরের উপর আর বিষক্রিয়া করতে না পারে।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা গ্যাংগ্রিনের মতো অসুখ যাতে অপারেশন না করলে অবধারিত জীবন নষ্ট হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শরীরের রোগগ্রস্ত অংশ কেটে বাদ দেওয়া সত্যিই যুক্তিসঙ্গত। এতে অপারেশনের লক্ষ্যই হল রোগীর জীবন বাঁচান। কিন্তু অপারেশন করে জীবন বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় বেশী রকম মূল্য দিতে হয়। রোগী তখন হয় পুরোপুরি না হয় আংশিকভাবে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

বহু যুগ ধরে সার্জেনদের স্বপ্ন ছিল যে এমন অপারেশন করতে হবে যাতে শুধু যে রোগীর জীবন রক্ষা পায় তাই নয়, যে অঙ্গের উপর অপারেশন করা হল তাও যেন ফিরে পায় তার স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ মূল লক্ষ্য এই যে অপারেশন যেন মানুষের শরীরের সমস্ত অক্ষমতা দূর করে তাকে ফিরিয়ে দেয় তার পূর্ণ কার্যক্ষমতা।

মানব দেহের ফিজিওলজি, বিশেষ করে রোগগ্রস্ত দেহের ফিজিওলজি নিয়ে গবেষণায়, সারা দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তারই ফলে আজ রচিত হয়েছে এই সব সমস্যা সমাধানের তত্ত্বগত বুনিয়াদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নগুলি সমাধানে, এবং যেমন তত্ত্বগত তেমনি হাতে কলমে কাজের দিক থেকেও আমাদের দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগামীদের অবদান অমূল্য। রুশী মনীষী সার্জেন ন. ই. পিরোগভ সার্জারীতে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। তাতে করে অস্ত্রচিকিৎসায় নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। তিনি ও তাঁর ছাত্রেরা অপারেশনের ফলাফলের ফাংশন্যাল দিকটার প্রতি খুবই গুরুত্ব অর্পণ করতেন যাতে করে অস্ত্রোপচারকৃত অঙ্গটির কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অপারেশনের পর অপারেশনকৃত অঙ্গে কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্ত্রচিকিৎসার মূল বিষয়সূচি। সেই সময় কী করে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া রোধ করা যায়, এই সমস্যার প্রতি অস্ত্রচিকিৎসা খুবই মনোযোগ আরোপ করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া কেসের সংখ্যা তখন খুবই বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও পুঁজিবাদ সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি যুদ্ধে শুধু যে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নষ্ট হয় তা নয়, হাজার হাজার লোক দেহ বিকলাঙ্গ হয়ে বা মানসিক আঘাতের ফলে অথর্ব হয়ে কার্যক্ষমতা হারায়। এদের চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে সার্জেনদের উপর।

আঘাত ও তার পরবর্তী অবস্থা চিকিৎসার বিশেষ হাসপাতালগুলিতে চেষ্টা চলে-কী ভাবে অপারেশন করে আহতদের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায়। এইভাবেই পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসার গোড়াপত্তন হয়। এটা এখন অস্ত্রচিকিৎসার এক আলাদা বিভাগে পরিণত হয়েছে।

পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা আলাদা বিভাগ হিসাবে গঠিত হওয়ার আগেই অস্ত্রচিকিৎসা শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগ নিরাময়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তখন অস্ত্রচিকিৎসার একটি বিভাগ ছিল যার নাম দেওয়া হত সর্ট সার্জারী বা 'ছোট্ট অস্ত্রচিকিৎসা'। চোখের অসুখ, নাক কান গলার অসুখ, দাঁত, চোয়াল ও তার চারপাশের নরম মুখমন্ডলের টিস্যুর অসুখ, এই সব নিয়ে চর্চা করত ছোট্ট অস্ত্রচিকিৎসা।

মুখমন্ডল ও চোয়ালের সাংঘাতিক আঘাত ও রোগ চিকিৎসার বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত রকমে ও সমস্ত দিক থেকে চর্চা করার পর চোয়াল ও মুখমন্ডলের অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক পৃথক শাখা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এই বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সামনে দাঁড়ায় কঠিন সমস্যা। অপারেশনের সেই পুরন উপায়, যাতে আহত বা অসুস্থ অঙ্গটিকে কেটে অপসারণ করা হত সে রকম অস্ত্রচিকিৎসা অন্য অঙ্গের উপর চলতে পারে কিন্তু এই অঙ্গে তা অচল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মুখমন্ডলে পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা দুচার জন উচ্চ গুণসম্পন্ন সার্জেন ছাড়া আর কেউই বড় একটা করতে সাহস পেত না এবং সে রকম অপারেশনও খুব বেশী হত না।

রাশিয়া যখন ১৯১৪ সালে যুদ্ধে নামে তখন হাজার হাজার মুখমন্ডল ও চোয়ালের আঘাতগ্রস্ত রুগী জমে উঠতে থাকে।

জারের আর্মির চিকিৎসা ব্যবস্থা এই রকম আহতদের প্রথমে ফ্রণ্টে তারপর ফ্রণ্টের পেছনে নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এতই অপ্রস্তুত ছিল যে মুখমন্ডলে আঘাত লাগা সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আদৌ উদ্ধার করাই হত না।

আসলে মুখমণ্ডলের অস্ত্রোচিকিৎসা, অস্ত্রোচিকিৎসা বিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক শাখা হিসাবে গড়ে ওঠে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য সোভিয়েত সরকার খুব অভিজ্ঞ ও অনেকদিন কাজ করেছেন এমন ডাক্তারদের একত্র সংগ্রহ করে কাজে নিয়োগ করেন।

মস্কোর ট্রমাটলজি ও অর্থোপেডির কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম ২০টি বেড যুক্ত আলাদা মুখমণ্ডলের অস্ত্রোচিকিৎসা বিভাগ খোলা হয়। সেই বিভাগের নেতৃত্ব করেন প্রতিভাসম্পন্ন সার্জেন আ. এ. রাউএর। রাউএর ছিলেন প্রফেসর ভ. ন. রজানভের ছাত্র, যিনি ১৯১৮ সালে চক্রান্তকারীর আঘাতে আহত ভ. ই. লেনিনের উপর অপারেশন করেন।

আলেক্সান্দর এদুয়ার্দোভিচ রাউএর ছিলেন যেমন চমৎকার সংগঠক তেমনি গুণী বৈজ্ঞানিক। তিনি সেখানে বিপুলভাবে বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানমূলক গবেষণার কাজ শুরু করে দেন ও নিজের উদ্দীপনা ও উৎসাহব্যঞ্জক সৃজনশীল শক্তি দিয়ে নিজ দলের অন্য সকলকেই সেই কাজের মধ্যে আকৃষ্ট করেন। একদিকে অস্ত্রোচিকিৎসার উচ্চ পারদর্শিতা ও শিল্পী প্রতিভা (তিনি ছবি এঁকে কাটাতেন অবসর সময়), ও বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান এবং অন্যদিকে চমৎকার শিক্ষক প্রতিভা থাকার ফলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই মুখমণ্ডলের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রোচিকিৎসায় একজন মস্ত বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন।

আ. এ. রাউএর সোভিয়েত মুখমণ্ডল অস্ত্রোচিকিৎসায় এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন, যা পরে সারা দুনিয়ার স্বীকৃতি অর্জন করে। তাঁকেই আমাদের দেশে অস্ত্রোচিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করা হয়।

চোয়াল ও মুখমণ্ডলের অস্ত্রোচিকিৎসার প্রথম বছরেই বোঝা যায় যে স্টোমাটলজি, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান মুখের ভিতরকার ও চোয়ালের রোগ চর্চা করে, তার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না রেখে অস্ত্রোচিকিৎসার এই বিভাগের অগ্রগতি অসম্ভব।

বর্তমানে চোয়াল ও মুখমণ্ডলের অস্ত্রোচিকিৎসা এবং স্টোমাটলজি লক্ষ্যের দিক থেকে পরস্পর এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়েছে যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এরা উভয়ে মিলে এক বিশেষ মিলিত বিভাগ রচনা করেছে।

আ. এ. রাউএর, আ. আ. লিম্বের্গ, আ. ই. ইয়েভদোকিমভ, ফ. ম. খিত্রভ, ব. ইয়ে. ফ্রাঙ্কেনবের্গ ও তাঁদের বহুসংখ্যক ছাত্রেরা, যাঁরা মুখমণ্ডলের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রোচিকিৎসা নিয়ে কাজ করে গেছেন তাঁদের লেখা শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ডাক্তারদের কাছেই পরিচিত তা নয়, দেশের বাইরে অনেক দূর দেশেও তা পরিচিত।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়, প্রচুর সংখ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তৈরী সার্জেন নিয়োগের ফলে এবং যুদ্ধ ফ্রণ্টে ভালো চিকিৎসার সংগঠন, চমৎকার সুসজ্জিত হাসপাতাল ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষিকৃত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক জাল রচিত থাকায় মুখমণ্ডলের আঘাতে

সর্বত্রই একক চিকিৎসা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। তাই মুখমণ্ডলের আঘাতে আহত প্রতি ১০০ জন সৈন্যের ৮৫ জনকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়ে তুলে আবার ফ্রণ্টে পাঠান সম্ভব হয়। দুনিয়ার কোন সৈন্যবাহিনী চিকিৎসায় এমন সুফল দেখাতে পারেনি।

যুদ্ধের পর যুদ্ধের সময়কার চিকিৎসার সমস্ত অভিজ্ঞতা একত্র জড় করে ও তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুখমণ্ডল ও চোয়ালের অস্ত্রচিকিৎসা নতুন নতুন সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ও উন্নত করে তুলছে মুখমণ্ডলের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসার পদ্ধতি।

মানুষের মুখের গড়ন খুবই জটিল। এর ভিত্তি হল মুখমণ্ডলের স্কেলিটন বা হাড়ের কাঠামো। মুখের হাড়ের কাঠামোতে থাকে দাঁত সহ উপরের ও নীচের চোয়াল এবং নাক ও গালের হাড়। মুখের এই সমস্ত হাড়ই এক জোড়া করে (একটা ডাইনে একটা বাঁয়ে)। নীচের চোয়ালটাই শুধু একটা গোটা হাড় দিয়ে তৈরী, মুখের অন্যান্য হাড়ের তুলনায় নীচের চোয়ালই হল সবচেয়ে সচল, তার কারণ এই হাড়ের দুই দিকে দুই জয়েণ্ট আছে যাকে বলে চোয়ালের জয়েণ্ট বা টেম্পোরো ম্যাণ্ডিবুলার জয়েণ্ট (temporo-mandibular) joint)।

টেম্পোরাল ও ফ্রণ্টাল বোন দিয়ে মুখের কাঠামোর উপরের তলাটা তৈরী হয়, এরাই আবার মাথার খুলিরও অংশ। উপরের চোয়ালে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আচ্ছাদিত একটা গর্ত থাকে যা নাকের ফুটোর সাথে যুক্ত। একে বলা হয় উপরের চোয়ালের সাইনাস বা হাইমোরের এণ্ট্রাম বা গর্ত।

এছাড়া তালুর হাড়ও উপরের চোয়ালেরই অংশ এবং এই হাড় মুখের গর্তকে নাকের গর্ত থেকে আলাদা করে রাখে।

মুখের হাড়গুলি বাইরের দিকে মুখভঙ্গি ও চিবনোর মাংসপেশী দিয়ে ঢাকা। এদের সাহায্যেই চোখের পাতা, গাল, ঠোঁট ও নীচের চোয়াল নড়াচড়া করে।

নাক ও কান সাধারণত নড়ে না, যদিও এদেরও একটু একটু নড়ান চড়ান সম্ভব। এদের নড়াচড়া নির্ভর করে মুখভঙ্গির মাংসপেশীগুলির উপর যদি নাক ও কানের সঙ্গে তাদের সামান্য কিছু অতিরিক্ত যোগাযোগ থেকে থাকে। কানের পাতা ও নাকের নীচের অংশ জটিল ও বিশেষ আকার যুক্ত উপাস্থি (cartilige) দিয়ে তৈরী।

মুখের নরম টিসুতে ঠিক চামড়ার নীচে প্রচুর রক্তের শিরা উপশিরা থাকে, এই সব শিরা নরম টিসু ভেদ করে চামড়ার নীচে ছোট ছোট উপশাখা হিসাবে চলে আসে। ঠিক ঐ একই ভাবে মুখমণ্ডল, মোটর ও সেন্সারি নার্ভের শাখা উপশাখায় ভর্তি।

মুখের মোটর নার্ভ, যাকে বলে মুখমণ্ডলের নার্ভ (facial nerve), তা মুখভঙ্গির মাংসপেশীগুলিকে কাজ করায় এবং তার গা বেয়ে ইম্পাল্‌স বা স্টিমুলাস এলে ঐসব মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়।

এনাটমির দিক থেকে মুখের সমস্ত অংশগুলি পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের এই জটিল মুখমণ্ডল তৈরী করে থাকে। কিন্তু পরস্পরের সাথে যুক্ত হলেও তাদের কাজ নানা প্রকৃতির ও বিভিন্ন ধরনের — শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, নিশ্বাস নেওয়া, কথা বলা, মুখভঙ্গি করা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের সিগন্যাল পালনকারী অঙ্গগুলির আকৃতি ও কাজের ঐক্য হল তাদের ফিজিওলজিক্যাল প্রক্রিয়া পালনের ভিত্তি। (এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে কান দেখলেই মনে হয় যে তা শব্দ ধরার যন্ত্র, চোখের ডিম হল দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থা)। এই ঐক্যের কোন অংশে কোন রকম লঙ্ঘন ঘটলে সমস্ত ফিজিওলজিক্যাল প্রক্রিয়াটি নষ্ট হয়। যেমন ঠোঁট, জিহবা বা তালুর আকৃতি নষ্ট হলেই স্বাভাবিক কথা বলাও নষ্ট হয়। এতে করে মানুষ হারিয়ে ফেলে ঠিকভাবে কথা বলার ক্ষমতা এবং তাতে করে তার কথাবার্তা অন্য সকলের দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের বাইরের চেহারার বিকলাঙ্গতা এবং তার সাথে কোন ফিজিওলজিক্যাল কাজের সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্য, তাকে যেমন গভীর নৈতিক আঘাত করে, তেমনি তার সাঙ্ঘাতিক মানসিক পরিবর্তনও সৃষ্টি করে থাকে। এই কারণেই আমাদের দেশে চোয়াল ও মুখমণ্ডলের বিভিন্ন রোগ বা জখমে তার সফল চিকিৎসার জন্য মুখমণ্ডল ও চোয়ালের অস্ত্রচিকিৎসার উপর এত নজর দেওয়া হয়।

অতি প্রাচীন কালেও যে এই রকম রোগীদের চিকিৎসা করা হত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার কতগুলি চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের যুগের প্রায় ১,০০০ বছর আগে ভারতীয় দার্শনিক ও চিকিৎসক সুশ্রুতের লেখা 'জীবনের জ্ঞান' নামক বইটির কথা প্রথমে উল্লেখ করা যায়। তাতে কপাল বা গালের চামড়া দিয়ে পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে নাকের বিকলাঙ্গতা সারানোর কথা লেখা আছে। সুপ্রাচীন মিশরেও নাকের বিকলাঙ্গতা সারাবার চেষ্টা হয়েছিল।

মাত্র কিছু দিন হল ঐতিহাসিকেরা জানতে পেরেছেন যে আমাদের যুগের ৩,০০০ বছর আগে তিব্বতের চিকিৎসকেরা বিকলাঙ্গ নাক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এইভাবেই মুখের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা বা প্লাস্টিক সার্জারীর উৎপত্তি হয়। প্লাস্টিক কথাটি গ্রীক শব্দ 'প্লাস্টিকা' থেকে নেওয়া। এর মানে হল ছাঁচ ও ভাস্করবিদ্যা। কথাটি সত্যিই অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় এই ধরনের অপারেশনে সার্জেনের কর্তব্য। মুখের প্লাস্টিক সার্জারীতে সার্জেন সত্যি সত্যিই চামড়া প্রভৃতি টিসু ব্যবহার করে ভাস্করের মতই মানুষের মুখের কোন না কোন অংশের ছাঁচ তৈরী করে।

আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারী মুখের যত রকমের বিকৃতি সম্ভব সব সারাতে পারে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে পুরন উপায় হল স্থানীয় টিসু দিয়ে, অর্থাৎ বিকৃত স্থানটির চারপাশের অথবা তার নিকটবর্তী টিসুর সাহায্যে বিকৃতিকে শুধরে তোলা।

কুকুরের কামড়ের ফলে রোগী দ...এর নাক বিকৃত হয়ে যায়। তার নাকের ফুটোর ধারগুলির কোন অস্তিত্বই ছিল না। গাল থেকে চামড়ার ছিলা টেনে নিয়ে তার নাকের প্লাস্টি বা নাক মেরামত করা হয়। চামড়ার ছিলার একটি ধার নাকের ক্ষতের ধারগুলির সঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হয়। প্রথম দুই সপ্তাহ চামড়ার ছিলাটি যে ধার দিয়ে গালের সঙ্গে যুক্ত ছিল সেখান দিয়েই সংরক্ষিত হচ্ছিল তার রক্ত সরবরাহ ও নার্ভের যোগাযোগ। চামড়ার কাটা ধারটি যখন নাকের ক্ষতে জোড়া লেগে গেল, তখন গালের সঙ্গে লাগা ধারটি; যেখান দিয়ে তাতে রক্ত সরবরাহ হচ্ছিল সেটা কেটে তাকে নাকের পাতার আকৃতি করে ফেলা হয়। এই উপায়, যাকে বলে ছিলার সাহায্যে প্লাস্টি, আজকাল প্লাস্টিক অস্ত্রচিকিৎসায় তা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

এমনকি প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকেরাও নাকের ডিফেক্টে, নাকের সেই খোলা ফুটোর ধারে কপাল থেকে চামড়ার ছিলা টেনে সেলাই করে লাগিয়ে দিতেন। প্রথমে সেই ছিলার একটা ধার কপালের সাথে যুক্ত থাকত যাতে সেখান দিয়ে রক্ত সরবরাহ ও নার্ভের যোগাযোগ সংরক্ষিত হয়। নাকের প্লাস্টির এই উপায়টি ভারতীয় রাইনোপ্লাস্টি নামে পরিচিত। (গ্রীক ভাষায় rinos কথাটির অর্থ হল নাক)। এইভাবে তৈরী নাক খুব তাড়াতাড়ি বিকৃত হয়ে যেত — দেবে যেত বা চ্যাপ্টা হয়ে যেত। তার কারণ সেই চামড়ার ছিলার ফাইব্রোসিস (fibrosis)। কেননা কপাল থেকে ছিলা তুলবার পর তার ভিতরের দিকটাতে ত আর কোন চামড়ার আবরণ থাকে না! তাছাড়াও টিস্যুর ইনফেকশনের জন্যও চামড়ার ছিলাটি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যেত; ইনফেকশনের বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হয় তা ত আর তখন জানা ছিল না।

এই সব ত্রুটির ফলে ভারতীয় রাইনোপ্লাস্টির ব্যবহার একেবারে উঠে যায়। কেবল ১৯শ শতাব্দীতে ইংরেজ সার্জেনরা আবার এই উপায়টির সাহায্য গ্রহণ করেন। এনেস্থেসিয়া ও এণ্টিসেপ্টিকের (পচন নিবারণ) উপায় আবিষ্কারের পর এই উপায়টির কতগুলি প্রধান গলদ দূর হয় ও উপায়টি আরও উন্নত হয়। এরপর থেকেই পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় একধারে পূর্ববর্তী অঙ্গের সাথে যুক্ত চামড়ার ছিলা খুব ব্যবহৃত হতে থাকে ও তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়। মুখমণ্ডলের প্লাস্টিক অপারেশনেই ডাক্তাররা এই উপায়টি বেশী করে ব্যবহার করতে শুরু করেন তার কারণ এতে টেনে নেওয়া চামড়া ও ক্ষতের চারপাশের চামড়ার মধ্যে কোন রঙের পার্থক্য প্রায় দেখাই যায় না।

কিন্তু চামড়ার ছিলার ভিতরের নগ্ন দিকটার ফাইব্রোসিসই বহুকাল ধরে এই অপারেশনের অসাফল্যের প্রধান কারণ হিসাবে রয়ে যায়।

১৮৬০ সালে বিখ্যাত জার্মান সার্জেন দিফেনবাখ প্রস্তাব করেন চামড়াটি প্রথমে দু-ভাঁজ করে তারপর নাকের ক্ষতের ধারের সাথে যুক্ত করতে। এতে আগের উপায়টির তুলনায় ভাল

ফল পাওয়া যায় ও সেই জন্যেই এই উপায়টি মুখমণ্ডলের প্লাস্টিক অপারেশনে খুব প্রচলিত হয়ে ওঠে।

দিফেনবাখের এই পদ্ধতিকে গালের এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে জখম হওয়া বিকৃতির অপারেশনে ব্যবহার করা শুরু হয়। তাতে প্রথমে বিকৃতির মুখগহ্বরের দিকটায় লাগানো হত ক্ষতের চারদিকের কোন একটা জায়গা থেকে কেটে নেওয়া চামড়া, তারপর গালের বাইরের দিকের ক্ষত বুজিয়ে ফেলা হত অন্য জায়গা থেকে চামড়ার ছিলা টেনে নিয়ে। এতে করে গালের এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাওয়া ক্ষত একদিকে যেমন নির্ভরযোগ্যভাবে বন্ধ করা সম্ভব হত তেমনি বাইরের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এতে ভাল ফল পাওয়া যেত।

বিখ্যাত রুশী সার্জেন ইউ. ক. শিমানভস্কি রাশিয়ায় সর্বপ্রথমে দুই গাল থেকে চামড়ার ছিলা নিয়ে নাক তৈরী করেন। এক ছিলা তিনি নাকের ভিতরের আবরণী হিসাবে ব্যবহার করেন অপরটি দিয়ে তৈরী করেন বাইরের আবরণী। এতে করে অপারেশনের টেকনিকটাও যেমন সহজ হয় কপালের চামড়াও তেমনি আস্ত থেকে যায়। কিন্তু ঐ দু-ভাঁজ করা চামড়াতেও ফাইব্রোসিস শুরু হয়ে সেই অস্থি ও উপাস্থিবিহীন নাক প্রাথমিক রূপ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত চুপসে বসে যেত। ইউ. ক. শিমানভস্কি তখন দুই চামড়ার ছিলা থেকে নাকের ভিতরে খাড়াখাড়িভাবে ভারবহনকারী একটা মাঝের দেওয়াল সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেন। তাতে পরস্পরের সাথে এদের সেলাই করবার পর নাকের মাঝখানের একটা পার্টিশান দেওয়াল সৃষ্টি হয় এবং গড়া নাকের আকৃতিও হয় দেখতে ঢের সুন্দর। তবে এতেও শেষ পর্যন্ত নাকের বসে যাওয়া ভাবটা কাটান যায় না। তখন সার্জেনরা নাকের আরও ভাল অবলম্বন বা ভারবহনকারী দেওয়াল কী করে সৃষ্টি করা যায় তা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ১৮৫৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ল্যাংগেনবেক প্রস্তাব করেন যে, কপাল থেকে চামড়া ও পাতলা হাড়ের ছিলা নিয়ে নাকের সাপোর্ট বা শক্ত অবলম্বন তৈরী করতে হবে।

ইতিমধ্যে চামড়ার প্লাস্টি সম্বন্ধে এত কাজ হয় যে সেই সব বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্র করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৮৬৫ সালে এ বিষয়ের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইউ. ক. শিমানভস্কির লেখা 'মানবদেহের সার্ফেসের অপারেশন' নামে একটা বই বেরোয়। সে বইটি কিন্তু, বিশেষ করে স্থানীয় টিস্যু দিয়ে প্লাস্টি করার প্রশ্নে, আজও পর্যন্ত তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হারায়নি।

সে সময় মুখমণ্ডলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্ষত হলে সার্জেনদের খুবই বেগ পেতে হত। চারদিকের চামড়া খুব বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত বা নষ্ট হয়ে গেলে বা চামড়া কম পড়ে গেলে পর স্থানীয় টিস্যু ব্যবহার করা আর সম্ভব হত না। এ সব কেসে তাই অপারেশন করার সুযোগ খুবই কম হত। মুখের বিকৃতি ঢাকা বা স্থানীয় টিস্যু নিয়ে প্লাস্টিক অপারেশন করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়াও, স্থানীয় টিস্যু নিয়ে প্লাস্টি করা মানে

হল যেখান থেকে চামড়ার ছিলা নেওয়া হয়েছে মুখের উপর সেইখানে নতুন ঘায়ের দাগ সৃষ্টি করা।

অস্ত্রচিকিৎসার সামনে তাই পুনরুদ্ধারমূলক অপারেশনের নতুন উপায় খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিল।

সার্জেনরা বহুদিন ধরে অনুসন্ধান করতে লাগলেন কী উপায়ে মুখ থেকে দূরবর্তী, মানবদেহের অন্য কোন অংশের চামড়া মুখমণ্ডলের অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহের আবরণী আয়তনে প্রায় ২৫,০০০ বর্গ সেণ্টিমিটার, অর্থাৎ প্লাস্টিক মালমসলার মস্ত বড় ভাণ্ডার।

কিন্তু নাক বা চিবুকের মতো জায়গায় এই চামড়া কী করে টেনে নেওয়া ?

প্রত্যেক অপারেশনের সারমর্ম হল এই, যে অপারেশনে ক্ষতের ধারগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের গায়ে সেলাই করে দেওয়া হয় তখন সেই টিসু পরস্পর পরস্পরের গায়ে জুড়ে যায়। এটা টিসুর বায়োলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য। চামড়ার ছিলার সবচেয়ে মূল্যবান চরিত্র হল এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ছিলাটি একটা ধার দিয়ে তার পূর্বের জায়গায় লেগে থাকে, সেখান দিয়ে যদি তাতে রক্ত চলাচল ঠিকমত চলতে থাকে তাহলে সেই ছিলাটি মরে না। এবং নতুন জায়গায় অন্য টিসুর সাথে ঐ ছিলার যে ধারটি সেলাই করা হয় সেই ধারটি সেই নতুন টিসুর সাথে সহজেই জুড়ে যায়।

১৫শ শতাব্দীতে ইতালির সামরিক চিকিৎসক ব্রাংকা কপাল ও গলা থেকে চামড়া নিয়ে চমৎকারভাবে নাকের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা করেন। তাঁর ছেলে সিসিলির বিখ্যাত সার্জেন আনতোনি ব্রাংকা নাক, ঠোঁট ও এমনকি কানের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় সর্বপ্রথম কাঁধের চামড়া ব্যবহার করেন। আমরা এই সব অপারেশনের খুঁটিনাটি জানতে পারিনি তার কারণ গির্জা তখন চিকিৎসাশাস্ত্রের বই লেখা নিষিদ্ধ করে দেয়। অস্ত্রচিকিৎসার গোপন তথ্য তখন মুখে মুখে এক বংশ থেকে অন্য বংশে ছড়িয়ে পড়ত ও চিকিৎসক জাতের মধ্যেই সে গোপন তথ্য সীমাবদ্ধ থাকত।

'কেটে অস্ত্রচিকিৎসা' নামে বোলনে তালিয়াকচির একটা বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসার সত্যিকারের বিজ্ঞান সম্মত যুগ শুরু হয়। ১৫৫৭ সালে ভেনিস থেকে প্রকাশ করা এই রচনায় কাঁধের চামড়া দিয়ে নাক ও ঠোঁটের প্লাস্টি করার বিবরণ দেওয়া আছে ও সঙ্গে সঙ্গে আঁকা ছবির সাহায্যে দেখানো আছে সেই অপারেশন কী করে করতে হয়। কিন্তু এই উপায়টিও, (যাকে বলে 'প্লাস্টির ইতালীয় উপায়') ভারতীয় উপায়ের মতই বহুদিন ধরে অবহেলিত থেকে যায়, কেননা এতেও প্রায়ই কাঁধ থেকে নেওয়া চামড়ার ছিলাটি মরে যেত। তার উপর হাত থেকেও ত চামড়ার যোগান এমন কিছু বেশী নয়।

এর প্রায় ৩০০ বছর পর ১৮৮৯ সালে জার্মানি থেকে হেক্কার জানান যে তিনি ইতালীয় উপায় ব্যবহার করেছেন। তার নতুন ও নিজস্ব অবদান হল এই যে তিনি বুক থেকে নেওয়া লম্বা চামড়ার ছিলা ব্যবহার করেন যাকে তিনি প্রথমে কনুই-এর উপর হাতের সঙ্গে সেলাই করেন এবং হাতে সেই চামড়া জুড়ে যাওয়ার পর ছিলার বুকের সংলগ্ন দিকটি কেটে দেন, যা দিয়ে এতদিন পর্যন্ত ছিলার রক্ত চলাচল সংরক্ষিত হচ্ছিল। কাটা দিকটা তখন তিনি মুখের বিকৃত অংশে কাজে লাগান। এই চলমান চামড়ার ছিলা প্রথমে 'পা বাড়ায়' হাতে তারপর হাত থেকে মুখের যে কোন অংশে। চামড়া চালানের এই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে অনুরূপ অপারেশনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

কিন্তু চামড়ার ছিলার আবরণবিহীন ভিতরের দিকটায় ইনফেকশন হয়ে পেকে গিয়ে বা তার রক্ত সরবরাহের স্বল্পতা হেতু ছিলা চামড়াটি প্রায়ই মরে যেত। এই সব কমপ্লিকেশন বা জটিলতা দেখা দিলেও চলমান চামড়ার ছিলা প্রমাণ করল যে, দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গোটা চামড়া এনে লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ছিলাটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা, অর্থাৎ ইনফেকশনের হাত থেকে তাকে বাঁচান ও এমন ভাবে ছিলাটিকে কাটা যাতে তার গায়ের সাথে লেগে থাকা অংশটিতে যত বেশী সম্ভব রক্তের শিরা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে চলবে তার খাদ্য সরবরাহ বা পুষ্টি।

শেষোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে চামড়ার ছিলা কাটা শুরু হল পূর্ববর্তী টিস্যুর সাথে দুইদিকে দুই যোগাযোগের ব্যবস্থা বজায় রেখে, যাতে দেহের দুই জায়গা থেকে ছিলাটির রক্ত সরবরাহ চলে। এই রকম 'পুলের আকৃতি' চামড়ার ছিলা প্রথমে ব্যবহৃত হয় হাতের আঘাতে যাতে জখম হয়ে অনেকখানি জায়গার চামড়া উঠে গেছে। সে ক্ষেত্রে বুক থেকে কেটে তোলা চামড়ার নীচে হাতের বিকৃত অংশটিকে রাখা হয়। সোভিয়েত সার্জেন ভ. আ. গুসিনিন মুখের নীচের অংশের প্লাস্টির জন্য গলা থেকে নেওয়া পুলের আকৃতি চামড়ার ছিলা ব্যবহার করেন। তিনি সেই ছিলাটিকে নীচের ঠোঁট ও চিবুকের উপর বসিয়ে দেন। কোন কোন কেসে পুরুষ মানুষের উপরের ঠোঁট তৈরী করবার জন্য মাথার চুল আবৃত চামড়ার পুলাকৃতি ছিলা তুলে ঠোঁটের উপর বসিয়ে দেওয়া হয় (যাতে তার গোঁফ বজায় থাকে)। সেই পুলের দুই পা লেগে থাকে দুই কানের কাছে দুই রগের সাথে ও সেখান থেকেই এর রক্ত সরবরাহ চলে। এই রকম পুলাকৃতি ছিলা নীচের দিকে টেনে মুখের উপর বসিয়ে দেওয়া খুবই শক্ত।

সার্জেনরা ছাড়বার পাত্র নন, তাঁরা চামড়া ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের (transplantation) নতুন উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন যাতে করে অনেকখানি জায়গা পুড়ে গেলে বা মস্ত বড় না শুকোনো ক্ষত ঢাকবার জন্য যে প্রচুর পরিমাণ চামড়ার দরকার হয় সে চাহিদা মেটান যায়। এই রকম রোগীদের সারিয়ে তুলবার জন্য আসলে প্রয়োজন এমন চামড়ার অংকুর ক্ষতস্থানে বসিয়ে দেওয়া, পরে যা বৃদ্ধি পেয়ে ও ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত ক্ষতস্থানটি ঢেকে ফেলতে পারে।

পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় স্বতন্ত্র উপায় হিসাবে চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের বিকাশ শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ফরাসী সার্জেন রেভের্দেন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেন কেন ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার চামড়া সোজাসুজি তুলে লাগিয়ে দিলে সে চামড়া মরে যায়। তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট প্রমাণ করে যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করবার জন্য যদি সমস্ত স্তর যুক্ত চামড়া নেওয়া যায় ও তার সঙ্গে যদি তার তলার চর্বি যুক্ত স্তর লেগে থাকে তাহলে সেই চামড়ার ছিলা নতুন জায়গায় কখন বাঁচে না, কেননা নীচের টিস্যুর সাথে জোড়া লেগে যেতে হলে সে চামড়ার এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগে, অথচ খাদ্যের অভাবে ও সেই কারণে মেটাবলিজ্মের ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে প্রথম দুই এক দিনেই চামড়ার টুকরোটি মরে যায়।

বহু পরীক্ষা করার পর তিনি দেখাতে সফল হন যে পাতলা ফিলফিলে ছোট ছোট চামড়ার টুকরো ক্ষতের উপর ঢের বেশী দিন ধরে বেঁচে থাকে, প্রথম দিনেই তা মরে না। তারপর সেই টুকরোগুলি বিস্তৃত ক্ষতের গায়ে লেগে গেলে সেখানে তাদের ছোট ছোট দ্বীপের মতো দেখায়। রেভের্দেন গোটা দশেক ছোট ছোট পাতলা চামড়ার টুকরো ক্ষতের উপর বসিয়ে দিয়ে তাদের স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে আটকে দেন। তিনি দেখেন যে, প্রথম ২৪ ঘণ্টাতেই সেই চামড়ার টুকরোগুলো নীচের টিস্যুর গায়ে লেগে যায় ও দ্বিতীয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপের মতো ঐসব চামড়ার চারদিকে নতুন চামড়া গজাতে আরম্ভ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই চামড়ার অংকুরগুলি থেকে নতুন চামড়া গজিয়ে ক্ষতের সারাটা গা ছেয়ে ফেলে ও দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে সবটাই নতুন চামড়ায় ঢেকে যায়। এই রকম সব ছোট ছোট চামড়ার টুকরো এক এক করে বসাতে যথেষ্ট সময় লাগে। তাছাড়াও, টুকরো টুকরো চামড়া বসালে গজিয়ে ওঠা চামড়া মোজেইকের মতো দেখায় ও বোঝা যায়, চারপাশের চামড়ার সাথে তার তফাৎ রয়েছে। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও রেভের্দেন টুকরো টুকরো চামড়া বসিয়ে যে ফল পান তা অভূতপূর্ব। রোগীর যে ক্ষত কিছুতেই শুকোচ্ছিল না তা চট করে শুকিয়ে যায়। তাতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে এক জায়গা থেকে চামড়া তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় তাকে সফলভাবে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা সম্ভব।

রেভের্দেনের পর তার উপায়টির যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হয় তাতে টেকনিকের উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু উপায়টির সারমর্ম একই রয়ে গেছে। এতে শুধু অতি পাতলা করে কাটা চামড়ার টুকরোই ব্যবহার করা হত ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের জন্য।

১৮৭১ সালে রেভের্দেনের এক্সপেরিমেণ্টের দুই বছর পর রুশী সার্জেন আ. ইয়াৎসেঙ্কো তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিসে প্রমাণ করে দেখান যে বড় বড় চামড়ার ছিলাও ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা সম্ভব। আরও পনর বছর পর এই উপায়টি ভালভাবে খুঁটিয়ে বিচার করে বিস্তারিতভাবে তার ধাপ বর্ণনা করে লেখেন জার্মান সার্জেন তির্শ। তাই তাঁর নাম অনুযায়ী এই চামড়া রোপণের উপায়টির নাম হয়েছে তির্শের উপায়। ইয়াৎসেঙ্কো — তির্শের উপায় অনুযায়ী বড় বড় চামড়ার ছিলা ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করে দেখা গেছে যে এতে যেমন ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন করতে কম সময় লাগে

তেমনি গজিয়ে ওঠা চামড়াটি দেখতেও অনেক ভাল হয়। যেখান থেকে চামড়ার সেই এপিথেলিয়ামের স্তরটি কেটে নেওয়া হয় সেখানে ব্যান্ডেজের তলায় ১৪ থেকে ১৬ দিনের মধ্যে আপনা থেকে গজিয়ে ওঠে নতুন এপিথেলিয়াম।

মুখের যে অংশ কম নড়াচড়া করে তার প্লাস্টিক অস্ত্রচিকিৎসায় উপরোক্ত উপায়টি সবচেয়ে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মুখমন্ডলের যে অংশ খুব নড়াচড়া করে, যেমন চোখের পাতা বা গাল, তাতে পাতলা চামড়ার ছিলা ট্রান্সপ্ল্যান্ট করলে ক্ষতের ফাইব্রোসিস জনিত সে চামড়া কুঁচকে যায়। তাছাড়াও. রোপণ করা চামড়ায় ও স্বাভাবিক চামড়ায় রঙের অনেক তফাৎ পরিলক্ষিত হয়।

নীচেকার চর্বির স্তর নেই অথচ চামড়ার সমস্ত স্তর নেওয়া হয়েছে এই রকম চামড়া প্রথম ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে সফল হন ক্রাউজে। এই রকম ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনে ক্ষত টাটকা হলে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা চামড়া চমৎকার জুড়ে যায়, ঐ অংশের নড়াচড়ার ক্ষমতা বহুদিন ধরে বজায় থাকে। এবং রঙের দিক থেকেও চারপাশের সুস্থ চামড়ার সাথে এর প্রায় কোন পার্থক্যই বোঝা যায় না। এসত্ত্বেও এ পদ্ধতিটি বেশী প্রসারলাভ করতে পারেনি। এর দুটি কারণ। প্রথমত, ক্ষত স্থানটি পুরোন হলে এই ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা চামড়া জোড়া লাগা শক্ত। দ্বিতীয়ত, সমস্ত স্তর যুক্ত চামড়া উরত বা অন্য জায়গা থেকে কেটে নিলে সবসময় সেলাই করে সে ক্ষত বন্ধ করা যায় না প্রায়ই সেখানে চওড়া ঘা থেকে যায়।

এই উপায়টির এদিক ওদিক কিছু পরিবর্তন করে মোটা চামড়া ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের ফলাফলে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত সার্জেন ইউ. ইউ. জানেলিদজে, ন. ন. পেত্রভ, ব. ভ. পারিন এবং আরও অনেকে সহজে চামড়ার ছিলা যোগাড়ের নিজ নিজ উপায় বের করেন ও ব্যাপকভাবে অস্ত্রচিকিৎসায় তা ব্যবহার করে সাংঘাতিক আঘাতের ফলে চামড়া উঠে যাওয়া হাজার হাজার রোগীর জীবন রক্ষা করেন।

১৯২৯ সালে ব্লের ও ব্রাউন বিস্তৃত ক্ষতের গা ঢাকবার জন্য প্রস্তাব করেন, বেশী পুরু নয় বেশী পাতলাও নয় এই রকম মাঝামাঝি পুরু চামড়া ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য ব্যবহার করতে। অন্যান্য সার্জেনরা মনে করলেন যে এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। ব্লের ও ব্রাউন এ প্রস্তাব করেন তার কারণ তারা খুঁজছিলেন এমন চামড়ার ছিলা যা একই সঙ্গে অতি পাতলারও সমস্ত গুণ পাবে ও চামড়ার সমস্ত স্তর যুক্ত যে মোটা চামড়ার ছিলা তারও সমস্ত গুণগুলি পাবে। প্রয়োজন ছিল তখন এমন এক উপায় উদ্ভাবনের যাতে প্রচলিত দুটি উপায়ের সমস্ত সুগুণগুলিকেই একত্রে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ব্লের ও ব্রাউন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, চামড়ার উপরের দুটো স্তর দিয়ে ছিলা তৈরী করতে পারলে সেই ছিলা পাতলা পাতলা ইয়াৎসেঙ্কো — তির্শ ছিলা ও মোটা ক্রাউজে ছিলার চেয়ে ঢের বেশী গুণ সম্পন্ন হবে।

কিন্তু কী করে সম্ভব মাত্র এক মিলিমিটার পুরু করে চামড়ার ছিলা কেটে তোলা? তাও আবার সেই ছিলা কাটতে হবে চামড়ার এক বিশেষ স্তর দিয়ে এবং ছিলাটি সব জায়গায় একই রকম পুরু হওয়া চাই!

১৯৩৯ সালে ইংরেজ সার্জেন পেজেট এই শক্ত কাজটি হাসিল করতে সমর্থ হন। তিনি এক নতুন যন্ত্র তৈরী করেন যার নাম দেওয়া হয় ডার্মাটোম (ডার্মা-চামড়া, টোমিয়া-কাটা)। এর সাহায্যে সার্জেন ইচ্ছামত পুরু ও ইচ্ছামত আয়তনের চামড়ার ছিলা কাটতে পারেন।

আধুনিক সার্জিক্যাল ক্লিনিকে এক নতুন ধরনের ডার্মাটোম ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে আরও ঢের সহজে চামড়ার ছিলা তোলা সম্ভব।

এখন এক জায়গা থেকে চামড়ার ছিলা কেটে নিয়ে অন্যত্র তাকে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার উপায়টি মুখমণ্ডলের প্লাস্টিক অস্ত্রচিকিৎসায় পাকাপাকিভাবে তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে।

নাতাশা প.., জন্ম থেকেই মেয়েটির মুখ দেখতে কুৎসিত, কেননা তার ডান দিকের গালে ও কপালের এক অংশে কালচে খয়েরি রঙের মস্ত দাগ রয়েছে। এ রকম রঙ অপারেশন না করে তোলা যায় কি? অপারেশন করলেও বিপদ — মুখের উপর থেকে যাবে বিস্তৃত ক্ষত। এই অবস্থায় চামড়া ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সার্জেনকে সাহায্য করে। নাতাশার রঙ্গীন চামড়া কেটে বাদ দিয়ে সে জায়গায় উরত থেকে কেটে নেওয়া চামড়ার ছিলা ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা হল। রোপিত চামড়াটি যখন ক্ষতের গায়ে লেগে গেল তখন দেখা গেল সেই চামড়ার সঙ্গে মুখের অন্য অংশের চামড়ার রঙে সামান্য একটু পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হল উরতের চামড়া মুখের চামড়ার চেয়ে ফ্যাকাশে। কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর মেয়েটি যখন বড় হয়ে যুবতী হয়ে উঠল তখন দেখা গেল যে মুখের চামড়ার রঙের সে তারতম্য আর নেই।

ঠিক এমনি করেই রক্ত শিরা উদ্ভূত রঙ্গীন দাগ বা পুড়ে যাওয়ার দাগ দূর করা যায়। সবক্ষেত্রেই যে এই উপায়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় তা নয়। বিশেষ করে চামড়ার ফাইব্রোসিস হলে তা সম্ভব নয়, কিন্তু তাহলেও মুখের বিকৃতির ভাব এতে অনেকটা কেটে গিয়ে পূর্বের চেহারা ফিরে আসে ও চামড়া আরও ইলাস্টিক হয়।

স্থানীয় টিসুর সাহায্যে প্লাস্টি করে বা অন্য জায়গা থেকে নেওয়া চামড়া ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের সাহায্যে মুখের নানা রকম বিকৃতি দূর করা সম্ভব। কিন্তু যাদের নীচের চোয়াল ও তার চারপাশের নরম টিসু নেই বা নাক উপরের চোয়াল ও গালের খানিকটা অংশ নেই তাদের কী করে সাহায্য করা? গুলির আঘাতে, দুর্ঘটনা বা অসুখের ফলে মুখের এই রকম বিকৃতি হলে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টির মালমসলার প্রয়োজন।

শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে চর্বির স্তর সহ গোটা চামড়া তুলে এনে নাক বা গালে লাগাবার উপায় উদ্ভাবন না করে মুখের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা আর এগুতে পারছিল না। সে উপায়টি এমন হতে হবে যাতে রোগীর জীবনের কোন আশঙ্কা না থাকে, চামড়ার

ছিল্যাটি যাতে নিজের জীবনী শক্তি না হারায় ও অতি সহজে মুখের টিস্যুর সাথে জুড়ে যায়। এছাড়াও, ভাস্করের মতই সার্জেনকেও এই সব চামড়ার ছিলা দিয়ে মুখের সুন্দর গড়ন তৈরী করতে পারা চাই যাতে করে রোগীর পূর্বের চেহারা ফিরিয়ে আনা যায় বা যতদূর সম্ভব তার মুখের সৌন্দর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে কয়েক জন সার্জেনের অনুরূপ প্রচেষ্টাকে অন্যান্য সার্জেনেরা অবাস্তব বলে মনে করতেন।

এরকম রোগীরা আগে মুখের বিকৃতি ঢাকবার জন্য বিকৃত নাক বা মুখের অন্যান্য অংশে শিল্পীদের তৈরী রবার বা অন্যান্য শক্ত জিনিষের ছাঁচ পরে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এই সমস্ত ছাঁচের সে রকম ব্যাপক প্রচলন কখন হয়নি। সে মুখোস বা ছাঁচগুলি শুধু যে পরিষ্কারভাবে কৃত্রিম বলে নজরে পড়ত তাই নয়, ওগুলি পরে পরে মুখের নরম টিস্যুতে ঘা হয়ে যেত।

বর্তমানে শুধু তখনই মুখের ছাঁচ প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয় যখন রোগী অপারেশন করতে নারাজ বা তার স্বাস্থ্যের অবস্থা এত খারাপ যে অস্ত্রোপচার করা একেবারে অসম্ভব। ছাঁচের মধ্যে কানের পাতার কৃত্রিম ছাঁচই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত ছাঁচ হয় বিশেষ আঠা দিয়ে সেঁটে, না হয় সার্জেন কর্তৃক আগে থেকে কেটে তৈরী করা কোন চামড়ার আঁকশির সাহায্যে পরতে হয়। কৃত্রিম কান তৈরী করা হয় এক রকমের বিশেষ প্লাস্টমাস দিয়ে।

চামড়া টানলে খানিকটা লম্বা হয় এবং ছেড়ে দিলে রবারের মতই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে তার ইলাস্টিসিটির জন্য। লেজুড় যুক্ত স্থানীয় টিস্যুর ছিলা বা পুলাকৃতি ছিলা দিয়ে মুখের বিকৃতি ঢাকবার সময় চামড়ার এই ফিজিওলজিক্যাল গুণটি কাজে লাগান হয়। ছিলা তুলে নেবার পর তার রয়ে যাওয়া ক্ষতের ধারগুলি বিশেষ না টেনেই একসঙ্গে লাগিয়ে সিল্কের সাহায্যে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং এর ফলে সেই ক্ষত শুকিয়ে গেলে পর পড়ে থাকে প্রায় লক্ষ্য করা যায় না এই

উপরে অঙ্কিত ছবিগুলিতে দেখানো হয়েছে চামড়ার সেই সব স্থান যেখান থেকে চামড়া নিয়ে মুখের বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অংশে বসানোর জন্য ফিলাতভের ডাঁটি তৈরী করা যায়।

রকম একটা সরু দাগ। ছিলাটিকে তারপর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যবহার করা চলে। অর্থাৎ চওড়া চামড়ার ছিলাও যদি তুলে নেওয়া হয় যেমন দুই দিকে দুই পুষ্টি সরবরাহকারী পা যুক্ত পুলাকৃতি ছিলা, তাহলেও বিশেষ মেহনত না করে সেই সৃষ্টি করা ক্ষতের ধারগুলি সেলাই করে ছিলার মাতৃস্থানটির বিকৃতি ঢেকে দেওয়া সম্ভব। সমস্যা শুধু এই যে সেই চামড়ার ছিলার ভিতরের দিকটায় যে কাঁচা অবস্থা থেকে যায় তার একটা কিছু করা, যাতে এর ফাইব্রোসিস হওয়া বা তাতে ইনফেকশন হওয়া ঠেকানো যায়।

কিন্তু কী করে তা করা ? এবং এমন ভাবে করা যাতে এর জন্য অন্য টিসুর কোন ক্ষতি না হয় বা ছিলাটির পুষ্টি বজায় থাকে দীর্ঘকাল ধরে যতদিন না চামড়ার সেই কাঁচা দিকটার ঘা শুকোচ্ছে। এই সমস্যার এক অভাবনীয় সহজ সমাধান বের করেন সুবিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ন ভ. প. ফিলাতভ, তাঁর বিখ্যাত কর্ণিয়াল গ্রাফ্‌ট (corneal graft) অপারেশনের উপায় প্রকাশের বহু আগে, — যে অপারেশন হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করে। ১৯১৬ সালে তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন ও নিজেই চোখের নীচের পাতা মেরামতের জন্য সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন নতুন উপায়ে তৈরী এক অভিনব চামড়ার ছিলা।

পুলাকৃতি চামড়ার ছিলা তুলে ভ. প. ফিলাতভ সেই চামড়ার ফিতেটির ধার দুটোকে একত্র সেলাই করে ছিলাটিকে একটি গোল টিউব বা ডাঁটির আকৃতিতে পরিণত করেন। চারদিক তার চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়ার কাঁচা দিকটাও এতে সবদিক থেকে ঢাকা পড়ে যায় কেননা ছিলার ধার দুটো পরস্পরের সাথে সেলাই করে যুক্ত করা এবং পা দুটোও মাতৃ টিসুর সাথে সেলাই করা। এমনিভাবে ডাঁটি যেমন চারিদিকে চামড়া পরিবৃত হয় তেমনি তার দুই পায়ের মাধ্যমে পুষ্টি ও রক্ত সরবরাহেরও চমৎকার অবস্থা সৃষ্টি হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে মাতৃস্থান ও ডাঁটির সেলাই করা ধারগুলি শক্ত হয়ে জুড়ে যায়; এবং সেলাই কেটে দেওয়ার পর রোগীর পেট, বুক বা গলার উপর অবস্থিত ঐ ডাঁটিটিকে দেখতে হয় ঠিক যেন একটা বাক্সের হাতলের মতন। ভ. প. ফিলাতভ এই রকম ডাঁটি সর্বপ্রথম তৈরী করেন গলা থেকে।

ফিলাতভের গোল ডাঁটি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই অস্ত্রচিকিৎসার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় কেননা সার্জেনরা এতে করে মুখমণ্ডলের প্লাস্টির জন্য যত প্রয়োজন তত পরিমাণ চামড়ার সন্ধান পেয়ে যান। ফিলাতভের ডাঁটি সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসাতেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়।

ফিলাতভের গোল ডাঁটির সুবিধা কী কী? প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই ডাঁটি ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে; তাতে নতুন রক্তের শিরার জাল তৈরী হয় এবং ডাঁটির সেলাই করা ধারগুলি ভাল করে জুড়ে যায়, তখন ডাঁটির একটা পাকে ওখান থেকে নিয়ে অন্যত্র পরিরোপণের প্রস্তুতি হিসাবে তার ঐ পা যেখানে বেসের সঙ্গে মিশেছে সেই অংশ রবারের ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। প্লাস্টির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য, অর্থাৎ প্রথম স্থান থেকে হাতে চালান করার

জন্য ডাঁটির এই রকম প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। এইভাবে ফিলাতভের ডাঁটি, পেট বা বুক থেকে প্রথমে হাতে তারপর মুখে চালান করার উপায়টি প্রথম ব্যবহার করেন ব. ভ. পারিন। প্লাস্টির তৃতীয় পর্যায়ে হাত সহ ডাঁটাটিকে মুখের যে কোন স্থানের উপর নিয়ে বিকৃত অংশের ধারগুলিতে তার একটা দিক সেলাই করে দেওয়া হয়।

৪৫ দিনের মধ্যেই ডাঁটাটি অপারেশনের শেষ পর্যায়, মুখের বিকৃত অংশ পুনর্গঠনে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। অনেক দিন ধরে তৈরী করা হয় বলে চামড়ার ডাঁটাটি বায়োলজির দিক থেকে বেশ নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং প্লাস্টি করার খুব ভাল পরিবেশ না থাকলেও, বিশেষ করে মুখের ক্ষত অংশের চামড়ায় প্রশস্ত ফাইব্রোসিস হওয়া সত্ত্বেও পরিরোপণের পর সে ডাঁটি জোড়া লাগার ব্যাঘাত হয় না। তাছাড়াও মেরামতের জন্য স্থানীয় টিসু ব্যবহারে মুখে অবধারিত নতুন জায়গায় ফাইব্রোসিস হয়, কিন্তু ফিলাতভের ডাঁটি ব্যবহারে মুখে নতুন করে ফাইব্রোসিস হবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় আজকাল এমন সব উপায় বেরিয়েছে যে মুখের সাংঘাতিক রকম বিকৃতিকারী আঘাতেও অস্ত্রচিকিৎসা করে তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর পেছনে ডাঁটির মতো গোল চামড়ার ছিলা তৈরী করার উপায় যিনি আবিষ্কার করেছেন সেই আকাদেমিশিয়ন ভ. প. ফিলাতভের অবদান অমূল্য।

চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের এই উপায়টির ফলে মুখমণ্ডল ও চোয়ালের অস্ত্রচিকিৎসা ইদানীং খুবই উন্নতি লাভ করেছে। ফিলাতভের ডাঁটির জীবনশক্তি ও কার্যকারিতা ভাল করে যাচাই করে দেখবার পর আজ আমাদের দেশে অস্ত্রচিকিৎসায় তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চামড়ার এই ডাঁটি কী ভাবে আরও ভাল করে তৈরী করা যায় বা কী করলে আরও সহজে সেই চামড়ার ছিলা প্লাস্টির পর জুড়ে যেতে পারে এ সম্বন্ধে ম. প. শেফতেল, ইয়ে. ম. জাক, আ. গ. লাপচিনস্কি ও অন্যান্য সার্জেনরা এর অনেক অদল বদল করেছেন। মুখের পুনরুদ্ধারমূলক জটিল অপারেশনে এইভাবেই ফিলাতভের ডাঁটি ব্যবহার করা প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এই উপায়টির আজ এত প্রচলন হয়েছে যে কোন কোন ক্লিনিকে এরই মধ্যে এই অপারেশনের সংখ্যা কয়েক হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখের প্লাস্টিক সার্জারীর কী ভাবে আরও উন্নতি করা যায়, এই সব বহু ধাপ যুক্ত অপারেশনগুলির ধাপ কেমন করে কমান যায় সৃজনশীল এই সব অনুসন্ধানের মাধ্যমে সোভিয়েত পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসা খুবই উন্নতি লাভ করেছে।

প্রফেসর ফ. ম. খিত্রভ ফিলাতভের ডাঁটির সাহায্যে নাক মেরামত করার এক অভিনব উপায় বের করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশীর ভাগ ক্লিনিকই এখন এই নতুন উপায়টি রপ্ত করে ফেলেছে এবং বিদেশেও উপায়টি যথেষ্ট চালু হয়েছে।

আগেকার প্রচলিত উপায়গুলির তুলনায় ফ. ম. খিত্রভের উপায়টির বিশেষত্ব হল এই যে এটা এক ধাপের অপারেশন, অর্থাৎ একবার অপারেশন করেই নাকের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা হয়। এতে নাকের চেহারাও যেমন সুন্দর হয় তার ফাংশনও তেমনি চমৎকার ফিরে আসে।

নিকোলাই ব ... এর বয়স তখন ২৯ বছর। যুদ্ধক্ষেত্রে ওর মুখে সাংঘাতিক আঘাত লাগে। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পরও ও বোঝেনি যে ওর কী হয়েছে। ড্রেসিং রুমে ডাক্তার ওর যাতে ব্যথা না লাগে এইভাবে আস্তে আস্তে মুখের ব্যান্ডেজ যখন খুলে ফেললেন নিকোলাই তখন উপরের ছায়াবিহীন ল্যাম্পের কাচে নিজের মুখের ছায়া দেখে নিজেকে চিনতে পারেনি। নাকের স্থানটিতে নাক নেই, রয়েছে এক গভীর অন্ধকারময় গর্ত। প্রফেসর খিত্রভ রোগীকে দেখে ঠিক করলেন যে ফিলাতভের ডাঁটি দিয়ে ওর নাক মেরামত করতে হবে।

ডাঁটিটা যখন দুই ভুরুর মাঝখানে কপালে জুড়ে গেল তখন সার্জেন হাতের সঙ্গে ডাঁটির যে পাটি যুক্ত ছিল তা কেটে দিলেন। তারপর কপাল থেকে ঝোলা সেই গোল চামড়ার ডাঁটিটিকে তার পিছনের দেওয়াল বরাবর কেটে তাকে চামড়ার ফিতের মতো বিস্তারিত করা হল।

দেখা গেল যে বিস্তৃত চামড়ার ফিতেটি নাকের ডিফেক্টের চেয়ে ঢের চওড়া।

চওড়াই হওয়া চাই, কেননা নাক হল দেহের ফাঁপা অঙ্গ যার বাইরের দিকটা চামড়ায় ঢাকা ও ভিতরের দিকটা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত। অর্থাৎ নাকের বাইরে ও ভিতরে দুটো আবরণ থাকে। এই দুই আবরণকে বিস্তার করে যদি পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে তা দেখতে হয় ঠিক চতুষ্কোণের আকৃতি যার আয়তন ১২০—১৪০ বর্গ সেণ্টিমিটার। অর্থাৎ নাক তৈরী করতে হলে সার্জেনের চাই অন্তত পক্ষে ৯ সেণ্টিমিটার চওড়া ও ১৫ সেণ্টিমিটার লম্বা চামড়ার ফিতে। অর্থাৎ ফিতেটাকে হতে হবে নাকের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা কেননা এর থেকেই তৈরী করা হবে নাকের সেই বাইরের ও ভিতরের আবরণ। চামড়ার ফিতেটির ভিতরের চর্বির স্তরটি কেটে পরিষ্কার করার পর প্রথমে তাকে আড়াআড়িভাবে দু-ভাঁজ করে মোড়া হয়, তারপর আঙ্গুল দিয়ে সার্জেন তাকে আর্চের আকৃতি করে দু-ভাঁজ করা চামড়ার ভিতরকার পাতে একটা ভাঁজ সৃষ্টি করেন। এই ভাঁজটি দিয়েই তৈরী হয় নাকের মাঝখানকার পার্টিশান। বাকি রইল শুধু ভাঁজ করে নাকের আকৃতি করা চামড়ার ছিলাটিকে নাকের ডিফেক্টের ধারগুলির সাথে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া। অপারেশন টেবিলেই রোল করা গজের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক আকৃতির নাক তৈরী করা শেষ হয়। তবে সেলাই খোলার আগ পর্যন্ত সেই রোল করা গজের গোঁজগুলিকে আর একবারও স্পর্শ করা হয় না।

এইরকম প্লাস্টিক অপারেশনের টেকনিক খুবই শক্ত। এর মধ্যে প্রচুর কারিকুরি করতে হয়। এর জন্য দরকার কর্মকার সুলভ, সত্যিকারের নিপুণতা ও শিল্পী সুলভ রুচি।

মুখের ডিফেক্ট প্রত্যেক কেসেই একটা নিজস্ব বিশেষত্ব নিয়ে দেখা দেয়। এই জন্যই ডিফেক্টগুলি খুব ভাল করে অনুধাবন করে অপারেশনের নিখুঁত পরিকল্পনা আগে থেকে ঠিক করা প্রয়োজন। এই রকম অপারেশন করতে সার্জেনের যেমন দক্ষতা তেমনি যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তি থাকা চাই।

বর্তমানে ফিলাতভের ডাঁটির সাহায্যে গাল, ঠোঁট প্রভৃতি মুখের সমস্ত জায়গা পুনর্গঠিত হয়।

প্রফেসর ন. ম. মিখেলসন সর্বপ্রথম জিহ্বা মেরামত করতে সফল হন। তিনি গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে উড়ে যাওয়া নীচের চোয়াল ও জিহ্বা পুনর্নির্মাণ করেন। এই অপারেশনের জন্যও ফিলাতভের ডাঁটি ব্যবহৃত হয়। ১৯৪২ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলার আঘাতে ২২ বছরের ভাসিলি দ ...এর নীচের চোয়ালটি থেঁৎলে যায় ও একেবারে মূলের কাছ থেকে তার জিভ কাটা পড়ে। প্রথমে তার নীচের চোয়াল মেরামত করা হয় ও তার দুবছর পর, পিঠের যেখানে চুল নেই সেই জায়গা থেকে নেওয়া ফিলাতভের ডাঁটির সাহায্যে তার জিহ্বা তৈরী করা হয়। সার্জেন চামড়ার ডাঁটটিকে মুখের ভেতর নিয়ে তাকে জিহ্বার সেই অবশিষ্ট মূলের সঙ্গে সেলাই করে দেন। তিন সপ্তাহ পর সেখানটা জুড়ে গেলে পর হাতের সাথে যুক্ত ডাঁটির অপর পাটি কেটে তাকে যতখানি প্রয়োজন ছোট করে তারপর তার ধারগুলি সেলাই করে দেন।

রোগী আজ দশ বছরের উপর সেই তৈরী করা নতুন জিহ্বা নিয়ে বেঁচে আছে, চমৎকার কথা কইতে পারে। এই নতুন তৈরী করা জিহ্বাটি স্বাভাবিক জিহ্বার মতই দেখতে; একে কৃত্রিম বলে চেনা মুশকিল।

মুখের হাড় ভেঙ্গে গিয়ে যে সব ডিফেক্ট হয় শুধু নরম টিসু দিয়ে সে ডিফেক্ট ঢেকে ফেলা মুশকিল। নীচের চোয়াল গাল বা নাকের হাড় থেঁৎলে গেলে মুখের সেই অংশ তুবড়ে যায়। সেই অবস্থায় মুখের পূর্ব আকৃতি ফিরিয়ে আনতে হলে নরম টিসু ভর করতে পারে এমন হাড়ের কাঠামো প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে হাড়ের পরিবর্তে নানান দ্রব্য ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

মুখের বিকৃতি ঢাকবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে সার্জেনেরা নানা রকমের মূল্যবান ধাতু, হাতীর দাঁত ও অন্যান্য পদার্থ ব্যবহার করতে, এমনকি ইঞ্জেকশন করে সিরিঞ্জের সাহায্যে চামড়ার নীচে প্যারাফিন ঢুকিয়েও তাঁরা মুখের বিকৃতি সারাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু বাইরের এইসব পদার্থ জীবন্ত টিসুর নীচে বসিয়ে দেবার পর প্রায়ই ওপরকার চামড়া মরে গিয়ে সেই জায়গা পেকে উঠত ও সেই কারণে বসানো ধাতব টুকরোটিকে বের করে ফেলে দিতে হত এবং তাতে করে মুখের বিকৃতি আরও বেড়ে যেত। এই কারণেই তখনকার এইসব উদ্ভাবিত উপায় তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। বিশেষ করে প্যারাফিন ব্যবহার করলে আরও খারাপ জটিলতা দেখা দিত।

১৮৯৬ সালে জার্মান সার্জেন ইজরায়েল সর্বপ্রথম চেপটে যাওয়া নাকের পিঠ তৈরী করবার জন্য হাড়ের ছিলা ব্যবহার করেন। র‍্যাশিয়ায় ১৯০০ সালে সার্জেন ব. জিকভ সর্বপ্রথম নীচের চোয়াল মেরামতে অন্য জায়গা থেকে নেওয়া হাড় ব্যবহার করেন। তাঁর অপারেশনের ফল এতে খুব ভালো হয়, হাড়টি নতুন জায়গায় চমৎকার জুড়ে যায় ও তৈরী হয় অবিকল নীচের চোয়ালের বাঁকান আকৃতি। কিন্তু মাঝেমাঝে কী কারণে যেন সেই বসানো হাড় হয় ঝাঁজরা হয়ে শুষে যেত, না হয় কিছুতেই আর জুড়ত না। কেন এমন হত তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলে।

দেখা গেছে যে হাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান করতে হলে সর্বপ্রথম রোগীর শরীরের সাধারণ অবস্থা ভালো থাকা চাই। যেখানে হাড় বসান হবে সেই জায়গাটিকে আগে থেকে বিশেষভাবে তৈরী করা চাই ও বিনষ্ট হাড়ের অংশের সাথে সে হাড়ের টুকরোটিকে নির্ভরযোগ্যভাবে জুড়ে দেওয়া চাই।

সবচেয়ে সহজে যে হাড় ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা যায় সে হল পাঁজরের হাড় এবং ইলিয়াক বোন যাকে কোমরের পাশের দিকটা টিপলে সহজেই হাতে অনুভব করা যায়। কিন্তু হাড় সংগ্রহের অপারেশনটি হাড় বসিয়ে দেওয়ার অপারেশনের তুলনায় নেহাত সহজ নয়।

সুইডীশ সার্জেন স্ভান্ত ওরেল হাড় ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার জন্য তথাকথিত বিশুদ্ধ হাড় ব্যবহারের সুপারিশ করেন, হাড় থেকে বারে বারে জলে ধুয়ে ও নানা রকমের রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে সমস্ত ইনঅর্গানিক (inorganic) দ্রব্য আগে দূর করা হয়েছে। ঐ রকমের হাড় যেমন মাসের পর মাস ধরে সঞ্চয় করে রাখা যায় তেমনি অপারেশনে ব্যবহারের আগে তাকে ফুটিয়ে নেওয়াও চলে।

বর্তমানে হাড় জিয়িয়ে রাখার বিশেষ উপায় বেরিয়েছে যার সাহায্যে ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য বিশেষ পরিবেশে হাড় জমা রাখা যায়।

সোভিয়েত সার্জেন মার্লেভিচ জানান যে তিনি দ্নেপ্রোপেত্রভস্কে মৃতের দেহ থেকে পুরো নীচের চোয়াল কেটে নিয়ে তাকে এণ্টিবায়োটিক দিয়ে পরিষ্কার করে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় জিয়িয়ে রেখে পরে তা অন্যের দেহে লাগিয়ে দেন।

পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় ভর করা যায় এমন কাঠামো তৈরীর জন্য হাড় ছাড়াও উপাস্থি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ট্রেকিয়ার (trachea) ডিফেক্ট সারাবার জন্য ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মানগল্দ সর্বপ্রথম উপাস্থি ব্যবহার করেন।

মুখের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসায় যত রকমের ডিফেক্ট হতে পারে তার সবেতেই উপাস্থি ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। বিশেষ করে নাক জখম হলেই উপাস্থি এখন বেশী ব্যবহৃত হয়। বায়োলজির দিক থেকে এর কতগুলি বিশেষ গুণ থাকায় প্লাস্টিক অপারেশনে ব্যবহারের সবচেয়ে উপযুক্ত দ্রব্য হিসাবে উপাস্থি ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার এখন এত প্রচলন হয়েছে।

মানুষের মধ্যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার জন্য সাধারণত পাঁজরের উপাস্থি ব্যবহৃত হয়। ছুরির সাহায্যে একে যে-কোন আকৃতিতে পরিবর্তিত করা সম্ভব। কিন্তু বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেছে যে কয়েক বছরের মধ্যে উপাস্থির ট্রান্সপ্ল্যান্ট কোন কোন ক্ষেত্রে বরফ যেমন গলে যায় ঠিক তেমনি ভাবেই শুষে যায়।

১৯৩৫ সালে ন. ম. মিখেলসন টাটকা উপাস্থির পরিবর্তে মানুষের সংরক্ষিত উপাস্থি ব্যবহারের সুপারিশ করেন। ২০ বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর দেখা গেছে যে সংরক্ষিত উপাস্থি সবসময়ের জন্য নিজের আকৃতি বজায় রাখে তাই এতে আর রোগীর দ্বিতীয় অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

ঠান্ডায় জমিয়ে সংরক্ষণ করা ছাড়াও ঠান্ডায় জমিয়ে তারপর শুকিয়ে ভ্যাকুয়ামে সংরক্ষিত করা উপাস্থি আজকাল খুব ব্যবহার করা হচ্ছে।

মোটর দুর্ঘটনায় মোটরের সামনের কাচের সাথে ধাক্কা লেগে কলেজের ছাত্রী গালিনা ভ...এর নাকের পিঠের হাড় ভেঙ্গে যায়। তার নাক তখন ঘোড়ার পিঠের জিনের মতো বিকৃত আকার ধারণ করে। মেয়েটির শেষ পর্যন্ত প্লাস্টিক অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

একেবারে নাকের ফুটোর ধারে ঠিক নাকের ডগার কাছে সার্জেন চামড়া কাটেন। এইভাবে নাকের চামড়া কাটার প্রস্তাব করেন আ. এ. রাউএর। এতে করে অপারেশনের পর ঘা শুকিয়ে গেলে চোখে পড়ে না, এইরকম একটা মাত্র সরু দাগ থেকে যায়। চামড়া কাটবার পর তার তলায় নাকের ঠিক পিঠের উপর সংরক্ষিত উপাস্থি ঢুকিয়ে দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। অপারেশনের সেলাই কাটবার পর দেখা যায় যে উপাস্থির টুকরোটি টিসুর উপর শক্ত হয়ে বসে গেছে। পরে সেটা একেবারে টিসুর সাথে জুড়ে যায় ও তৈরী হয় স্বাভাবিক আকৃতির নাক।

প্রফেসর আ. আ. লিম্বের্গের ক্লিনিকের ডাক্তাররা মুখের টিসুতে সংরক্ষিত উপাস্থি ঢুকিয়ে দেবার এক নতুন উপায় বের করেছেন। উপাস্থিকে আগে থেকে স্টেরাইলভাবে মাংসের কিমার মতো অতি ছোট ছোট দানায় গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর এক বিশেষ সিরিঞ্জের সাহায্যে মোটা সুচের মধ্য দিয়ে সেই গুঁড়নো উপাস্থি প্রয়োজনীয় টিসুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে উপাস্থি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করবার জন্য আর চামড়া কাটবার প্রয়োজন হয় না। এর ফলও খুবই ভাল। তাই আজকাল এই উপায়টি কার্যক্ষেত্রে বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইদানীং কয়েক বছর হল কোন অঙ্গ জখম হলে বা কোন একটা অঙ্গ না থাকলে সেই অঙ্গের বিকৃতি ঢাকবার জন্য এক বিশেষ রকমের প্লাস্টমাস ব্যবহারের খুবই প্রচলন হয়েছে।

মুখের প্ল্যাস্টির জন্যও আমাদের দেশে আজকাল ঐ রকমই এক প্রকারের ইলাস্টিক প্লাস্টমাস তৈরী করে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার নাম 'এগমাস ১২'। তাতে থাকে পলিক্লোরভাইনিল ও প্লাস্টিফিকেটার। রাষ্ট্রীয় প্রাইজ প্রাপ্ত ই. ই. রেভজিন ও আ. ব. মাস্কি কেন্দ্রীয় ট্রমাটলজি ও অর্থোপেডি ইনস্টিটিউটের প্লাস্টমাস লেবরেটারিতে ঐ প্লাস্টমাসটি তৈরী করেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত ইয়ে. ভ. গুজদকভাই সর্বপ্রথম ইলাস্টিক প্লাস্টমাস এক্সপেরিমেণ্টে ও ক্লিনিকে ব্যবহার করেন। তা ব্যবহার করে তিনি যে ফল পেয়েছেন তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, এইরকম প্লাস্টমাস শরীরের ভিতর ব্যবহার করলে তাতে শরীরের কোনই ক্ষতি হয় না। প্লাস্টমাসের কী আকৃতি হবে ও কতখানি পরিমাণে তা ব্যবহার করা হবে সে সবই নির্ভর করে কেসের উপর এবং প্রতি কেসেই তা আলাদা। প্রথমে প্লাস্টার অব প্যারি দিয়ে মুখের ছাঁচ তুলে তারপর নিরূপণ করতে হয় কত প্লাস্টমাস তাতে লাগবে। এতে করে অনেক জায়গা জুড়ে বড় ডিফেক্ট হলেও বিকৃতি সহজেই ঢেকে ফেলা চলে। সাধারণত ছোট ইন্সিসনের মধ্য দিয়ে টিসুতে বড় বড় প্লাস্টমাসের মডেল বসান সম্ভব নয় এরই জন্য বিভিন্ন আলাদা আলাদা ছোট ছোট অংশে সেই মডেল তৈরী করে তা পর পর জখমের টিসুতে সাজিয়ে বসিয়ে পরস্পরকে পরস্পরের সাথে এক রকম হুক দিয়ে আটকে দেওয়ার এক বিশেষ উপায় বের করা হয়েছে। এইভাবে ছাঁচ ঢোকানোর পর ইন্সিসনের জায়গাটায় চামড়া সেলাই করে দেওয়া হয়।

এই উপায়টির সুবিধে হল এই যে নরম টিসুর ভর করবার বস্তু হিসাবে প্লাস্টমাস ব্যবহার করা যেমন সহজ তেমনি সস্তা এবং তা অতি সহজেই সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তাহলেও হাড় বা উপাস্থির মতো বায়োলজিক্যাল গুণ প্লাস্টমাসের নেই।

প্লাস্টমাসের মতো টিসুর ভর করার বস্তু সহযোগে ফিলাতভের ডাঁটি প্রয়োগের উপায়টি মুখের পুনরুদ্ধারমূলক অস্ত্রচিকিৎসার সামনে আজ সীমাহীন সম্ভাবনার পথ খুলে ধরেছে।

চোয়াল ও মুখের জখম যত শক্তই হোক না কেন, আজ প্লাস্টিক সার্জারীর বিভিন্ন প্রচলিত উপায়গুলি ব্যবহার করে সব কেসেই বিকৃতি সংশোধন করা সম্ভব হয়।

আ. আ. লিম্বের্গের বিশ্ববিখ্যাত গবেষণার ফলে স্থানীয় টিসুর সাহায্যে প্লাস্টিক অপারেশন খুবই উন্নতি লাভ করেছে। 'মানবদেহের উপরিভাগে প্লাস্টিক অপারেশনের গাণিতিক ভিত্তি' নামে তাঁর লেখা বইটি ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে। গভীর তত্ত্বগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বইখানি লেখা।

পুড়ে যাওয়া স্থানের ঘা যখন শুকোতে থাকে তখন বহুদিন ধরে চলে ফাইব্রোসিসের প্রক্রিয়া, চারদিকের অন্য নরম টিস্যুকে সেই ঘা নিজের দিকে টেনে নেয়, কেননা চামড়া সেখানে সংকুচিত হয়ে যায়। আ. আ. লিম্বের্গের উপায়টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এতে ফাইব্রোসিসযুক্ত টিস্যু যা নাকি সচল অঙ্গগুলির চলনশক্তি হ্রাস করে তাকে দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে দেওয়া হয়। যেখানে স্কার তৈরী হয়েছে তার সবচেয়ে ওপর ও নীচের বিন্দু দুটি থেকে দুটো সমান্তরাল রেখা কাটা হয় ছুরির সাহায্যে ফাইব্রোসিস কেটে। তার একটি ইনসিসন দেওয়া হয় ডান দিকে অপরটি বাঁ দিকে স্কারের সাথে ৭০—৭৫° কোণ রচনা করে। ফলে দুটি সমান সমান চামড়ার ত্রিভুজ তৈরী হয়।

যদি এই ত্রিভুজ দুটিকে তাদের অবস্থানের পরস্পর বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে সেলাই করা হয় তাহলে তাতে করে একদিকে যেমন স্কার অন্তর্হিত হয় অন্যদিকে চামড়ার সার্ফেস দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই গুণ বেড়ে যায়। যদি এক টুকরো কাপড়ের উপর ঐভাবে দুটি ত্রিভুজ কেটে তারপর সেই দুই ত্রিভুজকে পরস্পর বিপরীত দিকে বসান হয় তাহলে সহজেই এর সত্যতা বিচার করা যায়। দেখা যাবে যে সেই কাপড়ের টুকরো দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে।

এই অপারেশন যাকে বলে 'পরস্পরগামী ত্রিভুজাকৃতি ছিলার প্লাস্টি', তাতে গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী বিশেষ কোণ রচনা করে ত্রিভুজাকৃতি চামড়ার ছিলা কাটা হয়।

স্থানীয় টিস্যুর সাহায্যে প্লাস্টি করার ক্ষেত্রে পরস্পরগামী ত্রিভুজাকৃতি ছিলার প্লাস্টি মূল্যবান স্থান দখল করে আছে। আ. আ. লিম্বের্গের ক্লিনিকে জন্মগত ক্লেফট প্যালেট কেসে এক নতুন প্লাস্টিক অপারেশন করার সুপারিশ করা হয়। তাতে প্রফেসর প. প. লভভ যিনি তাঁর জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ক্লেফট প্যালেট সমস্যা অধ্যয়নে নিয়োগ করেন, তাঁর অবদান খুবই বেশী, ক্লেফট প্যালেটের মতো জন্মগত খুঁতে লভভের উপায়টির এদিক ওদিক কিছু পরিবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিদেশের সমস্ত ক্লিনিকে আজকাল প্রচুর অপারেশন করা হচ্ছে। এই অপারেশনের সাহায্যেই ঐ সব রোগীর কণ্ট ও অক্ষমতা সবচেয়ে ভালভাবে নিবারণ করে শক্ত ও নরম তালুর স্বাভাবিক আকার ফিরিয়ে আনা যায়।

পরে এই অপারেশনটির আরও উন্নতি সাধন করেন আ. আ. লিম্বের্গ, ফ. ম. খিত্রভ ও ইউ. ইউ. বের্নাদস্কি।

আ. এ. রাউএর লেখেন যে, 'স্টোমাটোলজির মতো সার্জারীর অন্য কোন বিভাগে আমাদের দেশে এত কম সময়ের মধ্যে এত সুদূর প্রসারী অগ্রগতি হয়নি'। এর কারণ হল এই যে দাঁত ও চোয়ালের সমস্ত রোগ আজ সমস্ত দিক থেকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে ই. গ. লুকোমস্কি, দ. ই. ইয়েভদোকিমভ, আ. ইয়ে. ভের্লৎস্কি, স. ন. ভাইসব্লাৎ ও অন্যান্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীর গবেষণা ও অদম্য পরিশ্রম। স্টোমাটোলজির ক্ষেত্রে সোভিয়েত স্টোমাটোলজি আজ দুনিয়ায় উচ্চ সম্মানিত ও সমাদৃত।

নীচের চোয়াল নড়ানোর অক্ষমতার মতো শক্ত রোগ (anchylosis) যাতে রোগী (টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের) চোয়ালের জয়েন্টের হাড়গুলি জুড়ে যাওয়া বা সেখানে ফাইব্রোসিস হওয়ার জন্য একেবারে হাঁ করতে পারে না, তাতে সার্জেনেরা রাউএরের উপায়ে অপারেশন করে থাকেন। ঐ রোগে এটা আজ এক বুনিয়াদি অপারেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাউএর-এর অপারেশনের এত মূল্য দেওয়া হয় এই জন্য, যে এতে অস্ত্রোপচার হয় ঠিক জয়েন্টের কাছে ও এর ফলে পরে রোগী সবচেয়ে বড় করে মুখ হাঁ করতে পারে। যাতে আবার নীচের চোয়াল টেম্পোরাল বোন বা রগের হাড়ের সাথে জুড়ে না যায় তার জন্য রাউএর তাদের মাঝখানে উরত থেকে ফাসাশুদ্ধ চর্বির একটা টুকরো নিয়ে বসিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আ. আ. লিম্বের্গ সেই দুই হাড়ের মাঝে বসানোর জন্য ফিলাতভের ডাঁটির চর্বি যুক্ত টিসু ব্যবহার করেন। বর্তমানে ম. ম. ভেলিকানভা এই রোগে হাড় কেটে তার কাটা ধার দুটোতে নাইট্রিক এসিড মাখিয়ে দ্বিতীয় বার এংকাইলোসিস রোধ করার এক অভিনব উপায় বের করেছেন। এতে আরও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

বারে বারে নীচের চোয়াল ডিস্লোকেশনে আগে যাতে খুব শক্ত সার্জিক্যাল অপারেশন করা হত, রাউএরের প্রস্তাবিত অপারেশন তার চিকিৎসা ঢের সহজ করে তুলেছে।

আ. এ. রাউএর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সার্জিক্যাল উপায়ে ল্যারিংস (larynx) ও তার উপাস্থি ঘটিত অংশ তৈরী করতে সমর্থ হন। সেই অপারেশনটিকে আরও উন্নত করে তুলেছেন ফ. ম. খিত্রভ।

মুখ ও চোয়ালের অস্ত্রচিকিৎসার এক অতি মূল্যবান অংশ হল মুখমণ্ডলের নিরীহ ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের চিকিৎসা করা ও সে বিষয়ে গবেষণা করা। এই রোগ নেহাত কম হয় না এবং তাতে ভীষণভাবে মুখ বিকৃত হয়ে যায়। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, বিশেষ করে উপর ও নীচের চোয়ালের টিউমারে রোগীর প্রাণের আশঙ্কাও খুবই বেশী। তাই সময় মত এই রোগ ডাইয়াগ্নোসিস করতে পারার মূল্যও খুবই বেশী। প্রমাণ হয়ে গেছে যে ধূমপান করা, বিশেষ করে সিগারেট খাওয়া; খারাপ ও কৃত্রিম দাঁতের জন্য সর্বদা মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ইরিটেশন; অনেকদিনকার পুরন ঘা এই সবই ঠোঁট, মুখের ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও জিহ্বার ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়ার জন্য দায়ী।

মুখ বা মুখের গহ্বরে যদি এমন ঘা বা ছড়ে যাওয়া অবস্থা থাকে যা অনেকদিন ধরে শুকোচ্ছে না, বা মুখের কোন জায়গায় যদি নরম টিসু শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা অবিলম্বে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করে দূর করা দরকার।

এই সমস্ত উপসর্গ, যাকে প্রাক-ক্যান্সার উপসর্গ বলা হয়, তাতে যদি সময় মত চিকিৎসা শুরু করা যায় বা ধূমপান প্রভৃতির মতো ক্ষতিকর জিনিষের ক্রিয়া সময়মত বন্ধ করা যায় তাহলে পর সে রোগ আর এগুতে পারে না।

অস্ত্রচিকিৎসার সঙ্গে রেডিয়াম বা ডিপ এক্সরে (deep x-ray) ব্যবহার করে বর্তমানে ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের চিকিৎসা হয়। মুখের চামড়ার কয়েক প্রকারের ক্যান্সার ডাক্তাররা আজকাল শুধু রশ্মি চিকিৎসা করেই সারিয়ে ফেলতে পারেন।

চোয়ালের ক্যান্সারের চিকিৎসার ফলাফল নির্ভর করে সময়মত অপারেশন করা এবং রেডিয়াম ও ডিপ এক্সরে থিরাপির উপর। যদি একটা বিশেষ সময় কালের মধ্যে ক্যান্সারের উপসর্গ দূরে হয়ে যায়, তাহলে অপারেশনের সময় কেটে ফেলা টিসুর জায়গায় বিকৃতি দূরে করার প্লাস্টিক অপারেশন করা চলে।

রুগী ক...। খাবার সময় হঠাৎ নীচের চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার হয়ে তার নীচের চোয়াল নষ্ট হয়ে যায়। হাড় ভাঙ্গে তার কারণ হাড়ের টিসুর জায়গা দখল করে বসছিল ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার টিসু। বিলম্ব না করে অপারেশনের সাহায্যে নীচের চোয়ালের খানিকটা অংশ তার চারপাশের আক্রান্ত নরম টিসু সহ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এতে রোগীর মুখটি সাংঘাতিকভাবে বিকৃত হয়ে যায়।

এক বছর পর (এই এক বছর ধরে চলছিল ডিপ এক্সরে থিরাপি) রোগীর পেট থেকে দুটো ফিলাতভের ডাঁটি তৈরী করে সেখান থেকে তাদের হাতে চালান করে তারপর তাদের একটা দিক মুখের জখমের ধারগুলিতে জুড়ে দেওয়া হয়। ডাঁটি দুটো সেখানে জুড়ে যাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে নীচের ঠোঁট ও চিবুকের প্লাস্টি করা হয়। তার একটি ডাঁটি দিয়ে তৈরী হয় মুখের ভিতরের অংশ অপরটি দিয়ে বাইরের অংশ।

এমনি করেই নীচের চোয়ালের সেই খোলা ঘায়ের ডিফেক্ট পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া সম্ভব হয়। এর ছয় মাস পর মুখের নরম টিসুর স্থানে এই চামড়ার নীচে মাজা থেকে নেওয়া হাড়ের ছিলা বসিয়ে দেওয়া হয়। তৈরী হয় নরম টিসুর ভর দেওয়ার চমৎকার কাঠামো। তারপর নীচের চোয়ালে একপাটি কৃত্রিম দাঁত বসিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই নীচের চোয়ালের কাজ পুরোপুরি ফিরে আসে।

বর্তমানে ক... সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন সে তার পুরন কাজে ফিরে গেছে। প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা করে দেখা গেছে সে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে।

নিরীহ টিউমার যাতে রোগীর প্রাণ হারানোর কোন আশঙ্কা নেই তা এক এক সময় এত বড় আকার ধারণ করে যে রোগীর পক্ষে তাই নিয়ে লোক সমাজে মুখ দেখানো মুশকিল। জন্মগত টিউমারগুলিই সাধারণত খুব বড় আকৃতি ধারণ করে থাকে।

১৭ বছরের মেয়ে গালিয়া স...। তার মুখের অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক হিমাঞ্জিওমা (hemangioma) বা রক্তের শিরার টিউমার হয়। টিউমারটি ছিল নীলাভ লাল রঙের। মুখের চামড়া থেকে অনেকখানি উঁচু হয়ে ওঠা এই টিউমারের জন্য তার মুখ ভীষণ কদাকার

দেখাতে। কিন্তু এখন মেয়েটিকে যেন চেনাই যায় না। মুখের চেহারা তার সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ঐ কুৎসিত জিনিস থেকে ডাক্তাররা গালিয়াকে কী ভাবে রেহাই দিল?

এরকম টিউমার কেটে বাদ দেওয়ার অপারেশনে, রক্ত বন্ধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে রোগী মরে যেতে পারে, কেননা অসংখ্য রক্তের শিরা দিয়ে তৈরী হয় এই টিউমার। এক্সটার্নাল ক্যারটিড আর্টারি (external carotid artery) দিয়ে ঐ টিউমার টিসুতে রক্ত পৌঁছায় বলে, রোগী যাতে ভীষণ রক্তপাত হয়ে মরে না যায় তার জন্য এই অপারেশনের আগে এক্সটার্নাল ক্যারটিড আর্টারি বেঁধে নেওয়া হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও এনাস্টমসিসের (anastomosis) মারফৎ অন্যান্য আর্টারির সাথে টিউমারের এই ঘন শিরার জালের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায়, এক্সটার্নাল ক্যারটিড আর্টারির মতো মোটা আর্টারি বেঁধে ফেলেও এ টিউমারের রক্তপাত বন্ধ করা অনেক সময় মুশকিল হয়।

এই সব রক্তের শিরা থেকে রক্তপাত যাতে কম হয় তার জন্য সার্জেন আরও একটি সাবধানতা অবলম্বন করেন। ক্যাটগাট সুতো দিয়ে টিউমার টিসুতে আগে গভীরভাবে কতগুলি সেলাই দিয়ে নেওয়া হয়। ক্যাটগাট তৈরী হয় বাছুরের নাড়ীভুড়ি থেকে। এই সুতোর বিশেষত্ব হল যে এক থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই সুতো শরীরে শুষে যায়। এইসব সেলাই বসানোর ফলে টিউমার টিসুর ভিতরের বহু রক্তের শিরা বুজে যায় বলেই টিউমারটি এরপর আকারে অনেক ছোট হয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হিমাঞ্জিওমা একটা শক্ত গুটিতে পরিণত হয় এবং তখন তা প্রায় রক্তপাত বিহীনভাবেই কেটে বাদ দেওয়া যায়।

এই অপারেশনের শেষের ধাপ হল স্থানীয় টিসু দিয়ে বা ফিলাতভের ডাঁটি দিয়ে মুখের ক্ষত স্থানের প্লাস্টি করা।

লিম্ফ প্রবাহের শিরা উপশিরার টিউমার লিম্ফ্যাঞ্জিওমাও এইভাবেই বাদ দেওয়া হয়। নিউরোফাইব্রোমার (neurofibroma) চিকিৎসাও ঠিক এইভাবেই করা হয়। নিউরোফাইব্রোমা হল নার্ভের শাখা প্রশাখা থেকে তৈরী মস্ত বড় চামড়ার টিউমার।

ব ... এর রোগটি হল নিউরোফাইব্রোমা। ডান চোখ, চোখের পাতা ও গাল জুড়ে ওঠে ঐ বিরাট টিউমার। চোখের পাতা ভীষণ ফুলে উঠে তার ডান চোখটিকে একেবারে ঢেকে ফেলে।

কয়েক ধাপে অপারেশন করে টিউমারটিকে একেবারে কেটে বাদ দিয়ে স্থানীয় টিসু দিয়ে তার মুখের প্লাস্টি করা হয়। ফলে মুখের ডান দিককার চেহারাটা এখন তার স্বাভাবিক হয়েছে।

ব ... এখন চাকরি করে তাকে আর এখন মুখের বিকৃতি ঢাকবার জন্য ব্যাণ্ডেজ পরে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

মুখমণ্ডলের নার্ভ (facial nerve) অবশ হলে বিশ্রী দেখতে হয় মুখের চেহারা। কেননা মুখের ভাব প্রকাশের মাংসপেশীগুলি এতে অচল হয়ে যায়।

ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, রিউম্যাটিজম, অটাইটিস মিডিয়া (otitis media) ও অন্যান্য নানা রকমের সংক্রামক ব্যাধিতে, রোগের জটিলতা হিসাবে অনেক সময় মুখমণ্ডলের নার্ভের সাময়িক ও আংশিক প্যারালিসিস হয়; কিন্তু সময়মত মূল রোগের চিকিৎসা করলেই তা কেটে যায়। আরও স্থায়ী প্যারালিসিস হয় সাধারণ আঘাত বা গুলির আঘাত বা কানের কাছে গ্ল্যান্ড ফুলে গেলে পর। এইসব ক্ষেত্রে নার্ভের প্যারালিসিস জনিত মুখের চেহারায় যে সব পরিবর্তন দেখা যায় তা শোধরানর জন্য অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। এর নানা রকম অপারেশন আছে। মুখের দুই অর্ধেক যাতে এক রকম দেখায় তার জন্য অনেক সময় গালের চামড়া বা মুখের কোণের চামড়া খানিকটা এক দিকে টেনে দেওয়া হয়। যদি শুধু মুখমণ্ডলের নার্ভ কেটে যায় তাহলে কাটা অংশ দুটি সেলাই করে জুড়ে দিলেই মুখের ভাব প্রকাশের মাংসপেশীগুলি আবার সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু আঘাতের পর অপারেশন করতে যদি বেশ কিছুদিন দেরী হয়ে যায় তাহলে পর মুখমণ্ডলের নার্ভের বাইরের অর্ধকে সাবলিঙ্গুয়াল (sublingual) বা এক্সেসারি (accessory) নার্ভের সাথে সেলাই করে তার চিকিৎসা করা হয়। এই দুটি নার্ভের ফাংশনও মুখমণ্ডলের নার্ভেরই মতন। এ অপারেশন কিন্তু সবসময় ফলপ্রসূ হয় না, কেননা নার্ভের রিজেনারেশন বা হৃত ফাংশন পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা খুবই কম।

মুখমণ্ডলের যে নার্ভ, তার প্যারালিসিসের এখন আরও উন্নত সার্জিক্যাল চিকিৎসা বেরিয়েছে। তাতে সার্জেন টেম্পোরাল মাংসপেশীর সামনের ধার থেকে একটি ছিলা কেটে নিয়ে চোখের নীচের পাতার মাংসপেশীর সাথে তা যুক্ত করে দেন। আর একটা ছিলা নেওয়া হয় ম্যাসিটার (masseter) মাংসপেশীর সামনের ধার থেকে যাকে উপর ও নীচের ঠোঁটের মাংসপেশীর সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, ছিলা দুটি যাতে অবশ হয়ে যাওয়া, মুখের ভাব প্রকাশের মাংসপেশীর সাথে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে যায়। মুখমণ্ডলের নার্ভের স্থায়ী প্যারালিসিস হলে, মাংসপেশী দিয়ে নার্ভের কাজ চালানোর অপারেশনেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এতদিন পর্যন্ত চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে গেলে তার চিকিৎসা করা হত দাঁত ফিক্স করে (৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত) সবসময়ের জন্য মুখ বন্ধ করে রেখে। এতে নীচের চোয়াল একেবারে নড়ত না — অর্থাৎ খাবার চিবন একেবারে বন্ধ রাখতে হত। এখন চোয়ালের ভেঙ্গে যাওয়া অংশ দুটিকে ঠিক অবস্থায় সংযুক্ত রাখবার অন্য উন্নততর উপায় বেরিয়েছে যাতে ভ. ফ. রুদকো ও ইয়া. ম. জ্বোর্জার যন্ত্রের সাহায্যে, ভেঙ্গে যাওয়া চোয়ালের টুকরো দুটিকে তার দিয়ে সেলাই করে বা ধাতব প্লেটের সাথে চোয়ালের ভেঙ্গে যাওয়া অংশ দুটিকে ফিক্স করে চোয়াল ফ্র্যাকচারের চিকিৎসা করা হয়। স্টোমাটোলজিতে আজকাল ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্লাস্টমাসের সাহায্যে, চোয়ালের ফ্র্যাকচার এমনভাবে চিকিৎসা করা যায় যে চিকিৎসার সময় চোয়ালের কাজ — চিবন বন্ধ রাখতে হয় না।

এমনি করেই বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত ও সৃষ্টিশীল অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুখমণ্ডল ও চোয়ালের রোগগুলি দিন দিন অধিকতর সংখ্যায় নিরাময় যোগ্য হয়ে উঠছে। এই দিকে মুখের প্লাস্টিক সার্জারীর সাফল্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল, এই সাংঘাতিক দুর্ভোগের হাত থেকে মুখের আকৃতি ও ফাংশনকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা।

মুখমণ্ডলের পুনরুদ্ধারমূলক সার্জারীর অনেক সমস্যাই আজও সমাধান করতে পারা যায়নি। ধৈর্য সহকারে আমাদের অনবরত তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও তাদের কার্যকরী চিকিৎসা অনুসন্ধান করে যেতে হবে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, মহান আদর্শের নামে সোভিয়েত চিকিৎসকেরা যে ভাবে আত্মত্যাগী পরিশ্রম করে চলেছেন, রোগের বিরুদ্ধে নতুন নতুন জয় লাভে তা সাহায্য করবেই।

ভ. আ. নেগোভস্কি
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রফেসর

জীবন রক্ষার সংগ্রাম

আলোক পূর্ণ সুউচ্চ অলিম্পাসের পাহাড়ে বসে ভাগ্যদেবী ক্লোতো মানুষের জীবন গ্রন্থি বুনছেন, সেই গ্রন্থি ছিঁড়ে গেলেই জীবনের শেষ। মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক ধর্মশাস্ত্রে এইরকম ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই ঘোর প্রাচীন কালে আবার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রচলিত ছিল। বলা হত যে সুস্থ সমর্থ দেহে হঠাৎ কেউ প্রাণ হারালে তখনই তার জীবন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। তখনকার সময় থেকেই মানুষ মানুষের জীবন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে। তবে তার প্রচেষ্টার সেই সব উপায়গুলি আজকের দৃষ্টিতে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কান্ডজ্ঞানশূন্য। মরে যাচ্ছে এমন অবস্থায় তখন মানুষের দেহ থেকে রক্তপাত করান হত; মরে গেছে এমন লোকের গায়ে লাল তপ্ত লোহার ছেঁকা লাগান হত; সামনের এক জোড়া দাঁত উপড়ে ফেলা হত বা তার শ্বাসনালী ও অন্ত্রে ধোঁয়া ভরে দেওয়া হত বা অনেক সময় মানুষটিকে পিপের মধ্যে ভরে পিপে শুদ্ধ তাকে গড়ান হত। প্রচলিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব ১৫ শতাব্দীতেও মানুষকে বাঁচাবার জন্য তার মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাবার চেষ্টা করা হত। সেই উপায়টিকে ঢের উন্নততর করে আজ আমরা তা মানুষকে বাঁচাবার অন্যতম উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছি।

এই সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তখন খুবই কদাচিৎ মানুষের প্রাণ বাঁচান সম্ভব হত। কেননা মানুষের শরীরের গঠন ও দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধে তখন তেমন সঠিক ধারণাও ছিল না, বা মানুষ কী ভাবে মরে সে সম্বন্ধেও মানুষের কোনই জ্ঞান ছিল না। শুধু মৃত্যু হয়েছে জানলেই ত হয় না, কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় সে সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে কি কখনও মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

কেবল মাত্র গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় সেই সব অনুসন্ধানমূলক কাজ, যাকে মানুষের প্রাণ পুনরুদ্ধার সমস্যা সমাধানের নতুন ধাপ বলে বর্ণনা করা চলে। চিকিৎসকেরা এজন্য পৃথক পৃথক টিসু ও অঙ্গের জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তাদের পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে জানবার প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রমাণিত হয় যে হৃৎপিন্ড, যকৃৎ, এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড এমনকি মস্তিষ্কের মতো জায়গাতেও কৃত্রিম রক্ত চলাচল শুরু করাতে পারলে সাময়িকভাবে তাদের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায়।

এ বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন ব্রাউন-সেক্কার, ড. হেইমান্স, ক. হেইমান্স, আ. আ. কুলিয়াবকো, স. ই. চেচুলিন এবং স. স. ব্রুখোনেঙ্কো। তাঁরা প্রমাণ করেন যে মৃত্যুর পর প্রাণী দেহের মস্তিষ্ক পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। ল্যাঙ্গেনদর্ফ, ন. প. ক্রাভকভ ও আরও অনেকে প্রাণীর মৃত দেহ থেকে হৃৎপিন্ড বের করে নিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার এক্সপেরিমেণ্ট করেন।

১৯০২ সালে রুশী বিজ্ঞানী আ. আ. কুলিয়াবকো পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মৃত মানুষের হৃৎপিন্ড বের করে নিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হন।

মানুষ ও পশুর পৃথক পৃথক অঙ্গের জীবনী শক্তি নিভিয়ে দেওয়া ও তারপর তা পুনরুদ্ধার করার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্য আজও চলেছে। যেমন স. ভ. আন্দ্রেয়েভের এক্সপেরিমেণ্ট। তিনি মৃত্যুর ৯৯ ঘণ্টা পরে একটি মৃত মানুষের হৃৎপিন্ড পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হন।

দেহের পৃথক পৃথক অঙ্গ পুনরুজ্জীবিত করণের নিয়মাবলী এক্সপেরিমেণ্টের সাহায্যে অধ্যয়ন করার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোটা দেহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে নতুন বস্তুবাদী ও বিজ্ঞান সঙ্গত পদক্ষেপের সূচনা হয়। সেই পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে চেক বিজ্ঞানী স্পিন, জার্মান বিজ্ঞানী ত্সেলার ও রুশ বিজ্ঞানী ফ. আ. আন্দ্রেয়েভের গবেষণা।

১৯১৩ সালে ফ. আ. আন্দ্রেয়েভ দেখান যে, ডিপথেরিয়া টক্সিন ইঞ্জেকশন দিয়ে, শ্বাস রোধ বা রক্তপাত করিয়ে অথবা ইলেকট্রিক কারেণ্ট দিয়ে কুকুরকে মেরে ফেলে যদি তার ক্যারটিড আর্টারিতে (হৃৎপিন্ড থেকে মগজে রক্ত বহন করে নিয়ে যায় এই আর্টারি) হৃৎপিন্ডমুখী রক্ত অথবা, হৃৎপিন্ডের পুষ্টি ও স্টিমুলেশন করতে সক্ষম, এই রকম লবণ যুক্ত সলিউশন ইঞ্জেকশন করা যায় তাহলে সেই তরল পদার্থ হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর পুষ্টি বহনকারী করোনারি আর্টারিতে পৌছে হৃৎপিন্ডের কাজ পুনরুজ্জীবিত করে। হৃৎপিন্ড তখন আবার কাজ করতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পর নতুন করে কুকুরটির শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয় এবং আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয় তার মস্তিষ্কের উচ্চতন ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু, শেষে এক্সপেরিমেণ্টকৃত কুকুরটি আবার প্রাণ হারায়। তখন অবশ্য আজকের এমন অনেক তথ্যই জানা ছিল না যার সাহায্যে শরীরকে শুধু যে সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তাই নয়, দেহের বেঁচে থাকবার ক্ষমতাও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

তাহলেও ফ. আ. আন্দ্রেয়েভের এই সব এক্সপেরিমেণ্টগুলি মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার আশা তুলে ধরে।

এক এক সময় তর্ক ওঠে যে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার সমস্যাটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন উঠেছে না এ নিয়ে অনেকদিন ধরেই কাজ চলছিল? দুরকম ভাবে এই প্রশ্নটির জবাব

দেওয়া যায়। এটা পুরন সমস্যা তার কারণ কবে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা খুঁজতে গেলে অতি পুরাকালে ফিরে যেতে হয়। আবার এটা নতুন সমস্যাও বটে তার কারণ এর সম্বন্ধে সর্বদিক থেকে সমস্ত উপায়ে সত্যিকারের অনুসন্ধান কার্য চালানর সুযোগ উপস্থিত হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রগতি তার বর্তমান উন্নত স্তরে পৌঁছবার পর। তাই মোটেই আকস্মিক নয় যে গত ২০—৩০ বছরে এ সম্বন্ধে যত পরিমাণ কাজ হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গোটা ইতিহাসেও এ সম্বন্ধে তত কাজ হয়নি।

পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নটিকে বাস্তব সমস্যায় পরিণত করাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উচ্চ মানের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দেহের পুনরুজ্জীবনের সমস্যাটি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বায়োলজিক্যাল বিজ্ঞানের এক নতুন শাখায় পরিণত হয়েছে। শাখাটির উদ্দেশ্য হল দেহের মৃত্যু বা মৃত্যুর ঠিক পূর্বে অবস্থার গোটা প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুনগুলি বিষদভাবে অনুসন্ধান করে দেখা। তা করতে পারলে এর সাহায্যে মৃত্যুপূর্ব অবস্থায় রোগীর আরও গভীর ও দৃঢ় ভিত্তিক চিকিৎসা সম্ভব হবে। এবং যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় যাতে সমস্ত টিসু ও অঙ্গের জীবনী শক্তি পুরোপুরি বজায় থাকা সত্ত্বেও মানুষ মরে যায় তাতে নির্ভরযোগ্য উপায়ে চিকিৎসা করে সর্বদাই প্রাণ ফিরান সম্ভব হবে, আকস্মিক মৃত্যুর কোন প্রশ্নই থাকবে না।

ক্লিনিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল মৃত্যু

দেহের পুনরুজ্জীবন নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ চালাতে চালাতেই ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বলে একটা ধারণা জন্ম নিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে হৃৎপিন্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মানুষের দেহের সমস্ত টিসু বা অঙ্গ মরে যায় না। সকলেই জানে যে অনেক ঘন্টা ধরে হৃৎপিন্ডে রক্ত না পৌঁছানর পরও তাকে পুনরুজ্জীবিত করা চলে। একথাও আমরা জানি যে মৃত্যুর পরও মৃতের চুল ও আঙ্গুলের নখ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সব টিসুর পাশাপাশি আবার এমন সহনশক্তি বিহীন টিসুও আছে যা হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার ৫—৭ মিনিটের মধ্যেই মরে যায়। এইরকম টিসুর মধ্যে সর্বাগ্রেই মস্তিষ্ক কর্টেক্সের নাম করতে হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রক্ত চলাচল বিহীন অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা দেহের বিভিন্ন টিসুর বিভিন্ন রকম। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আমরা যখন দেহের পুনরুজ্জীবনের কথা বলি তার দ্বারা বোঝাই গোটা দেহের ক্রিয়ার পুনরুদ্ধার, তার সমস্ত টিসুকে বাঁচিয়ে তোলা, এমনকি সহনশক্তি বিহীন মস্তিষ্ক কর্টেক্সেরও পুনরুজ্জীবন।

বর্তমানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবেশে মস্তিষ্ক কর্টেক্স ৫—৬ মিনিটের বেশী রক্ত চলাচল বিহীন অবস্থা সহ্য করতে পারে না।

মানুষকে অবশ্য ৫—৬ মিনিটের জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার পরও পুনরুজ্জীবিত করা যায়, কিন্তু সে পূর্ণাঙ্গ পুনরুজ্জীবন নয়। তাতে তার চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন দাঁড়ায় মৃত্যুর ফিজিওলজি তাহলে কী ? হৃৎপিন্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রথম কয়েক মিনিটে দেহের ভিতরকার সমস্ত রকমের মেটাবলিজম বা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, রক্ত চলাচল থেমে যায়, কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দূর হয় — অর্থাৎ যাকে বলে জীবনের আর কোন লক্ষণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহলেও কোষ, টিসু বা দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে ছাড়া ছাড়া কি রকম যেন অদ্ভুত এক রকমের প্রাণস্পন্দন তখনও থেকে যায় যদিও গোটাভাবে দেহ সে সময় আর কাজ করছে না। বলাই বাহুল্য যে এই সমস্ত দুর্বলতর প্রাণ-স্পন্দন প্রক্রিয়া ধরা নেহাত সহজ নয় এর জন্য বিশেষ উপায়ে অনুসন্ধানের সাহায্য নিতে হয়।

মৃত্যুপূর্ব অবস্থার ঠিক পরই আসে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু। অর্থাৎ তখনও জীবন ফেরান সম্ভব। অবস্থা তখন এই, যে হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক কর্টেক্স তখনও মরেনি, অর্থাৎ তখনও শরীরকে সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত করে গোটা দেহের পূর্ণাঙ্গ জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অপূর্ণ রয়ে যাবে, যদি আমরা এ সম্বন্ধে উপরে যা বলা হয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। মৃত্যুপূর্ব অবস্থায় মরার প্রক্রিয়াটিকে হিসাবের মধ্যে না ধরে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর কথা কখন উল্লেখ করা চলে না। কখনো কখনো মৃত্যুপূর্ব অবস্থা এত দীর্ঘস্থায়ী ও শরীরের পক্ষে এতই শক্তি ক্ষয়কারক হয় যে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দিকে মরার প্রক্রিয়ায় শরীরের মূল্যবান অঙ্গগুলি যদি কাজ করার ক্ষমতা না হারায় ও সেই অঙ্গগুলির টিসুতে যদি এমন কোন পরিবর্তন না হয় যা থেকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরান অসম্ভব, তাহলে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর, এমনকি ৭—৮ মিনিট পার হয়ে গেলেও সে দেহে জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। প্রাণী দেহের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করা গেছে, যে বেশী রকম রক্তপাত হয়ে ১০—১২ মিনিটের মধ্যে যদি সেই প্রাণী প্রাণ হারায় তাহলে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর, এমনকি ৫—৬ মিনিট পার হয়ে গেলেও তাকে

সাধারণ তাপমাত্রার পরিবেশে মস্তিষ্ক কর্টেক্স শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার পর ৫—৬ মিনিটের মধ্যে মরে যায়। (ক) স্বাভাবিক নার্ভ কোষ (খ) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন নার্ভ কোষ।

সহজেই পুনরুজ্জীবিত করা যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে রক্তপাত হতে হতে যদি দীর্ঘ ৩০—৪০ মিনিট পর সে প্রাণীর মৃত্যু হয়, তাহলে পর মাত্র ৩—৪ মিনিট পার হলেই তাকে আর বাঁচান যায় না।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর এই যে আয়ুষ্কাল, তা আরও অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে যেমন শরীরের সাধারণ অবস্থা, পরিবেশের তাপমাত্রা ইত্যাদি।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যু, খাঁটি মৃত্যু বা বায়োলজিক্যাল মৃত্যুতে পরিণত হয় ঠিক তখন যখন দেহকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় পার হয়ে যায়।

বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গগুলির বায়োলজিক্যাল মৃত্যু হতে বিভিন্ন রকম সময় লাগে। যখন আমরা গোটা দেহকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলি তখন স্বভাবতই আমরা মনে করি শরীরের সবচেয়ে আঘাতকাতর অঙ্গ মস্তিষ্ক কর্টেক্সের ক্রিয়া পুনরুদ্ধারের কথা, যাকে ছাড়া দেহের পূর্ণাঙ্গ জীবন অসম্ভব।

সে যাই হোক দেহ পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে আসল প্রশ্ন তাহলে দাঁড়ায় এই, কী করে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর আয়ুষ্কাল বাড়ান যায়। তা যদি কোন প্রকারে করা যায় তাহলে ত শুধু ৫—৬ মিনিট নয়, হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরও প্রাণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। স্বভাবতই এ প্রশ্ন সমাধান করতে হলে প্রথমে আমাদের এমন ওষুধ ও এমন উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের নার্ভ কোষের তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হওয়া ঠেকিয়ে রাখা যায়।

এ বিষয় নিয়ে অনেক লেবরেটারিতে নানান রকমের এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে। আশা করা যায় যে কিছুদিনের মধ্যেই ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রশ্নটি, শুধু এক্সপেরিমেণ্টে নয় ক্লিনিকেও অনেক পরিমাণে সমাধানের পথে এগিয়ে যাবে।

দেহের জীবনী শক্তি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন উপায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীতে পরীক্ষামূলক ফিজিওলজি বিভাগে দেহ পুনরুজ্জীবিত করার এক লেবরেটারি আছে। ঐ লেবরেটারি পশুদের উপর এক্সপেরিমেণ্টের মধ্য দিয়ে দেহের জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এবং সেই সব প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী অধ্যয়ন করে এবং তাছাড়া ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয় নিয়েও অধ্যয়ন করে থাকে।

১৯৬০ সালে ঐ লেবরেটারির ২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে। তাঁরা এখন জীবনী শক্তি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন উপায় বের করেছেন। সে উপায়গুলি এখন সাফল্যের সঙ্গে ক্লিনিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সবের মারফৎ কতগুলি প্রশ্নের আজ এমন পরিষ্কার উত্তর

পাওয়া গেছে যার সাহায্যে দেহের জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি আরও গভীরভাবে বুঝতে পারা যায়।

ঐ লেবরেটারি কর্তৃক নির্ধারিত সেই উপায়গুলিকে চারটি মূল অংশে ভাগ করা চলে।

১। আর্টারির মধ্য দিয়ে সেণ্ট্রিপিটালভাবে (centripetal) অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে অক্সিজেন স্যাচুরেটেড্ রক্ত বারে বারে সজোরে পরিসঞ্চালন করা।

২। যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসে বাতাস ঢুকিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা।

৩। ইলেকট্রিক কারেণ্টের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ডিফিব্রিলেশন (defibrillation)।

৪। হৃৎপিণ্ড মালিশ করা।

আর্টারির মধ্যে সজোরে রক্ত পরিসঞ্চালন করবার জন্য সংরক্ষিত রক্তের সাধারণ এম্পুলই ব্যবহার করা হয়, তবে তাতে থাকে অক্সিজেন স্যাচুরেটেড্ (saturated) রক্ত। তাছাড়াও হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর আরও ভাল পুষ্টির জন্য তাতে ৪০% গ্লুকোজ সলিউশনের ১০ সিঃ সিঃ এবং হৃৎপিণ্ডের স্টিমুলেশনের জন্য আধ বা এক সিঃ সিঃ এড্রিন্যালিন যুক্ত করা হয়। এম্পুলের নীচের মুখটি রক্ত পরিসঞ্চালনের সাধারণ টিউব সিস্টেমের সাথে যুক্ত করা হয়, আর উপরের মুখটি টিউবের সাহায্যে কণ্ট্রোল ম্যানোমিটার যুক্ত একটি রবারের ব্লাডারের সাথে সংযুক্ত করা হয় যার সাহায্যে এম্পুলে চাপ সৃষ্টি করে কী চাপে সেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা মাপা যায়।

পূর্ব নির্ধারিত চাপ মাত্রায় শরীরের যে-কোন আর্টারিতেই রক্ত পরিসঞ্চালন করা চলে, তবে ব্রেকিয়াল (brachial) বা রেডিয়াল (radial) আর্টারির মতো পেরিফেরাল আর্টারিতেই রক্ত পরিসঞ্চালন করা ভালো। আগেই বলা হয়েছে যে, আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালন করতে ছুঁচটা ঢোকান হয় হৃৎপিণ্ডমুখী যাতে খুবই তাড়াতাড়ি সেই রক্ত জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দেহাংশগুলির রক্তের শিরায় প্রবাহিত হতে পারে। যখন হৃৎপিণ্ডের প্রথম সংকোচন শুরু হয় (তা অবশ্য নাড়ী ধরলে সহজেই বোঝা যায়), অমনি আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালনা করা বন্ধ করে ভেনে রক্ত দিতে শুরু করা হয় (এর উদ্দেশ্য, যে পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিপূরণ করা)।

প্রশ্ন জাগে আর্টারিতে পরিসঞ্চালন করা রক্ত কী ভাবে কাজ করে? রক্ত দেওয়া আরম্ভ করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে রক্ত হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব রক্তের শিরায় গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে সেই রক্ত হৃৎপিণ্ডকে অক্সিজেন ও অন্যান্য পুষ্টিকারক দ্রব্য যোগায়। তাছাড়াও উচ্চ চাপে আর্টারিতে ঠেলে দেওয়া রক্ত, সেই আর্টারি ও হৃৎপিণ্ডের গায়ে অবস্থিত নার্ভের অগ্রভাগগুলির ইরিটেশন সৃষ্টি করে তাদের টোন বাড়ায় ও হৃৎপিণ্ডের সংকোচন সৃষ্টি করে। এই সমস্তই একত্রে হৃৎপিণ্ডের কাজ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে।

রোগীর হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়েছে... দেহ পুনরুজ্জীবনকারী লেবরেটারির একটি দল সেই রোগীর জীবন বাঁচানর প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেছে।

কয়েক বছর আগে এই ছেলেটির ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হয়েছিল। অবশ্য ভলোদিয়া প... এর এখন তা মনেই নেই, অথবা বোধ হয় ও নিজে সে কথা জানেই না।

যাতে করে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কাজ পুনরুজ্জীবনের উপায় ক্রমাগত উন্নত করা যায় তার জন্য শত শত এক্সপেরিমেণ্ট চলছে পশুর উপর।

মৃত্যুর প্রথম অবস্থায়, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু হৃৎপিন্ডের কাজ তখনও চলছে, সে অবস্থা থেকে রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে হাতে করে সিল্‌ভেস্তার বা শেফারের উপায়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করাই যথেষ্ট।

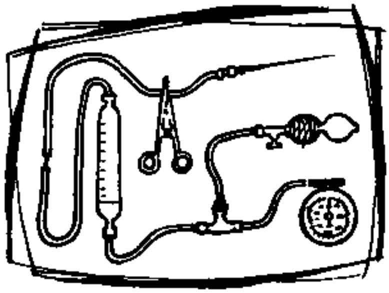

ধমনীর মধ্যে উচ্চ চাপে সংরক্ষিত রক্ত ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে হৃৎপিন্ডের কাজও বন্ধ হয়ে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু এসে গিয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে হাতে করে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা যথেষ্ট নয়, কেননা এতে করে ফুসফুসের মাত্র সামান্য একটু ভেণ্টিলেশন (ventilation) হয়।

সে ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস পরিচালনার জন্য এমন বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যার সাহায্যে হাওয়া ঢুকিয়ে ফুসফুসকে ফোলান যায়। তাতে মুখের উপর পরান মুখোসের মধ্য দিয়ে, অথবা বিশেষ রবার টিউবের মধ্য দিয়ে (যে রবারের টিউব মুখের ভেতর দিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়) ফুসফুসে সোজাসুজি হাওয়া ঠেলে দেওয়া হয়। হাতে করে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার তুলনায় এ উপায়ে ফুসফুসে ঢের বেশী হাওয়া পৌঁছয় ও অনেক ভালভাবে চলে গ্যাসের আদানপ্রদান। তাছাড়াও এলভিওলাসগুলি হাওয়ায় ফুলে ওঠবার ফলে সেখানকার ভেগাস নার্ভের (vagus nerve) অগ্রভাগগুলির ইরিটেশন হয়ে তার থেকে যে ইম্পাল্‌স তৈরী হয় তা চলে যায় ব্রেন ষ্টেমের শ্বাস কেন্দ্রতে এবং সেই কেন্দ্রের কার্যশক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। কামারের হাপরের মতো সাধারণ যন্ত্র থেকে শুরু করে সোভিয়েতের DP-2'এর মতো জটিল শ্বাস যন্ত্র পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রই এই মূলনীতির ভিত্তিতে তৈরী। সিলিন্ডারে চাপে আবদ্ধ অক্সিজেনের শক্তিতেই DP-2 যন্ত্রটির কাজ শুরু হয়। ঐ যন্ত্র থেকে অক্সিজেন সহ হাওয়া ফুসফুসে প্রবেশ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফুসফুসে এক বিশেষ চাপ মাত্রা সৃষ্টি হয়। তারপর ঐ যন্ত্রটি আপনা থেকেই আবার ফুসফুস থেকে গ্যাস শুষে নিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেখানে সৃষ্টি হয় মাইনাস চাপ মাত্রা। এমনি করেই ফুসফুসের ভিতরকার চাপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ যন্ত্রটি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কখন শ্বাস কখনও বা প্রশ্বাসের কাজে নিযুক্ত হয়। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রোগীকে যেমন অক্সিজেন সরবরাহ করা যায় তেমনি আবার রোগীর শ্বাসনালীর ভেতর থেকে জল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি টেনে বের করে নেওয়া চলে।

ফুসফুসের টিসু জখম হলে বা ফুসফুসে জল জমলে (oedema) (যেমন হয়ে থাকে ডুবে যাওয়া বা বিষক্রিয়া প্রভৃতি কেসে), তখন আর ফুসফুসে হাওয়া ঠেলে দেওয়ার ভিত্তিতে

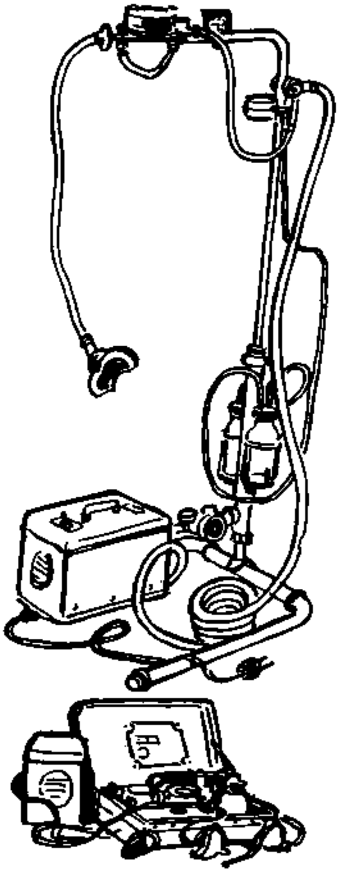

সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরী কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস পরিচালনের যন্ত্র (DP—1 ও DP—2)।

কাজ করে এমন যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা হয়, হাওয়া ভরা যায়, এমন বাইন্ডার সম্বলিত যন্ত্র দিয়ে, যেমন AM-1। এতে বাইন্ডারের মধ্যে হাওয়া ঢোকানো ও তা বের করা হয় একটি রবারের হাপরের সাহায্যে। হাপরটিকে চালু করা হয় রেডাক্টারের মারফৎ অল্টারনেটিং কারেণ্টের এক মনফেজড্ এসিংক্রোনাস ইলেক্ট্রো-মোটরের সাহায্যে। ইলেকট্রিক কারেন্ট যদি না থাকে তাহলে হাতে করেই এই যন্ত্রটি পরিচালনা করা চলে।

ঐ যন্ত্রের কাজ করার মূলনীতি হল এই, যে রোগীর বুকে প্রথমে ঐ ব্যাগ বা বাইন্ডারটি জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর হাপর থেকে হাওয়া এসে বাইন্ডারটি ফুলোলে পর সেই বাইন্ডার শক্ত করে চেপে ধরে রোগীর বুক, — বুক থেকে তাতে হাওয়া বেরিয়ে যায়, সৃষ্টি হয় রোগীর প্রশ্বাস। সেই বাইন্ডার থেকে হাওয়া আবার হাপরে টেনে নেওয়া হলে বুক ফুলে ওঠে — বুকের মধ্যে তাতে বাইরের হাওয়া ঢোকে, সৃষ্টি হয় রোগীর নিশ্বাস।

অনেক সময় পুনরুজ্জীবনের কাজে কেবল মাত্র কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থাকেই কাজে লাগান হয়, যেমন অজ্ঞান করানোর সময় নিশ্বাসের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে, ডুবে যাওয়া কেসে, বিষক্রিয়া কেসে বা পলিওমায়েলাইটিস প্রভৃতি কেসে। এক কথায়, সেই সমস্ত কেসেই একমাত্রভাবে এই উপায়টি ব্যবহার করা হয় যাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও হৃৎপিন্ডের কাজ চলতে থাকে। পলিওমায়েলাইটিস হল একরকমের রোগ যাতে প্রধানত নার্ভাস সিস্টেমই আক্রান্ত হয়। এতে রোগীর ভীষণ নিশ্বাসের কষ্ট হয় এমনকি এক এক সময় তাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্বাসের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সেই অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ পরিচালনা করাই রোগীকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় (অবশ্য সাথে সাথে রোগীকে

ওষুধ দিয়ে সেই রোগ সারাবার চেষ্টাও করা উচিত)। খুবই স্বাভাবিক যে কাল বিলম্ব না করেই এই রোগের চিকিৎসা শুরু করা দরকার, কেননা একটু দেরী হয়ে গেলেই মৃত্যু।

আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে এই রোগের ফলাফল নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি রোগীর আপনা থেকে নিশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসে তার উপর। যদি তাড়াতাড়ি সেই ক্ষমতা ফিরে আসে রোগী বেঁচে যায়। কিন্তু দেরী হলেই মৃত্যু। তাড়াতাড়ি স্বতঃপ্রবৃত্ত নিশ্বাস চালু হওয়ার মানেই হল এই যে ব্রেন স্টেম স্টিমুলেটেড্ হয়েছে। মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির ক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তা অপরিহার্য। তাই যত আগে ফিরে আসে রোগীর নিজস্ব নিশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা তত আগে পুনরুজ্জীবিত হয় মস্তিষ্ক কর্টেক্স ও ততই বেশী রোগীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব অবস্থায় বা দেহ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময় কখন কখন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী ঠিকমত তালে তালে কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার বিভিন্ন অংশ বা ফাইবারের সমষ্টি সামঞ্জস্য বিহীনভাবে সঙ্কোচন শুরু করে দেয়। এই রকমের সঙ্কোচন হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্তের সেই চাপ সৃষ্টি করতে অপারগ যাতে রক্তের শিরায় রক্ত ছুটে শরীরে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ শুরু হয়। কদাচিৎ এক আধটা কেস ছাড়া এরকম সামঞ্জস্য বিহীন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে হার্টের ফিব্রিলেশন) কখন আপনা থেকে স্বাভাবিক সংকোচনে পরিবর্তিত হয় না। তাই এতে দেখা দেয় অবশ্য মৃত্যুর সম্ভাবনা। হৃৎপিণ্ডের জটিল অপারেশনে, সাঙ্ঘাতিক বিদ্যুতের আঘাতে, যাতে কারেণ্ট গিয়ে সোজাসুজি হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাত করে বা নানা রকমের দুরারোগ্য রোগে ঐ রকম ফিব্রিলেশন হয়ে থাকে। ফিব্রিলেশন হয়েছে কিনা তা ধরা যায় এক বিশেষ যন্ত্র — ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে, হৃৎপিণ্ডের বায়োইলেকট্রিক কর্মতৎপরতা কাগজে লিপিবদ্ধ করে। সকলেই জানে যে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের সংকোচনে বিশেষ ছন্দ বজায় রেখে তার মাংসপেশীতে বৈদ্যুতিক পটেনশিয়ালের পরিবর্তন হয়। সেই সব বৈদ্যুতিক কারেণ্টের ছবিই হল ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সংকোচন চলা কালে এই ছবি তৈরী হয় কতগুলি বিশেষ আকারের খোঁচা খোঁচা দাগের সমষ্টি নিয়ে। এই রকম দাগের সমষ্টিগুলি আসে একের পর এক নির্দিষ্ট সময় পর পর। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই যে ফাঁক সেটাই হল হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের সময় বা পজ (pause)। ফিব্রিলেশন শুরু হলে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রামের ছবি হবে ঢেউ-এর পর ঢেউ, ঢেউগুলি ঘন ঘন অসমান ও তাদের মাঝখানে কোন বিশ্রাম বা ফাঁক নেই।

হৃৎপিণ্ডের ফিব্রিলেশন যাতে বন্ধ হয় ও তার স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা বা স্বাভাবিক সংকোচন ফিরে আসে তার জন্য হৃৎপিণ্ডের উপর বিদ্যুতের ক্রিয়া বা বিদ্যুতের সাহায্যে আঘাত করা হয়। সেই ক্রিয়ার ফলে একই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সমস্ত ফাইবারগুলি স্টিমুলেটেড্ হয়। শুরু হয় হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকোচন। আমাদের

লেবরেটারিতে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে ফিব্রিলেশন বন্ধ করতে হলে ব্যবহার করা দরকার ছাড়া ছাড়া অল্প সময় ব্যাপী (এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ) বৈদ্যুতিক ইম্পাল্স। সেই রকম ইম্পাল্স সৃষ্টির যন্ত্র প্রথম তৈরী হয় ভ. ই. লেনিন সর্ব ইউনিয়ন ইলেকট্রোটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে। যন্ত্রের স্কিম তৈরী করেন উপরি উক্ত ইনস্টিটিউটের কর্মী ন. ইয়া. গুরভিচ অন্যান্য কর্মিবৃন্দের সহযোগে।

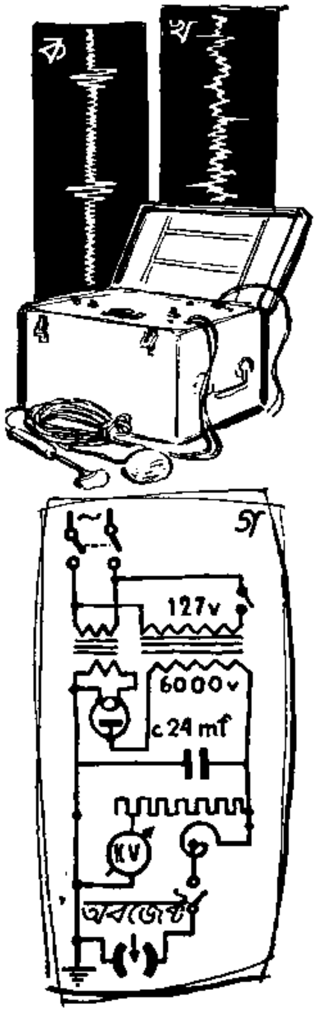

হৃৎপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার যন্ত্র — ডিফিব্রিলেটারের চেহারা ও ইলেকট্রিক নক্সা।

যন্ত্রটিতে থাকে একটি ধাতু নির্মিত বাক্স ও তাতে বিশেষ স্কিম অনুযায়ী সাজানো হয় এর প্রধান অংশ: কারেণ্ট উঁচু করার ট্রান্সফরমার, তাছাড়া তাতে থাকে রেক্টিফাইয়ার, ২৪ মাইক্রোফ্যারাডে ক্যাপ্যাসিটির কতগুলি কণ্ডেন্সার ও ইণ্ডাকশন স্পিণ্ডল। বাক্সের ডালার উপর বসানো থাকে কতগুলি কণ্ট্রোল ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, কিলোভোল্টমিটার ও কতগুলি সুইচ। কয়েকটি সুইচ দিয়ে যন্ত্রটিকে বৈদ্যুতিক কারেণ্টের সাথে যুক্ত করা ও কণ্ডেন্সার চার্জ করা হয় এবং অন্য একটি সুইচ দিয়ে ইলেকট্রোডে কারেণ্ট দেওয়া হয়। ইলেকট্রোডগুলি দেখতে ধাতু নির্মিত থালার মতো, ভিজে গজ দিয়ে জড়ানো, তাদের ব্যাস ৮ থেকে ১৬ সেণ্টিমিটার তারা তার দিয়ে মূল যন্ত্রের সাথে যুক্ত। রোগীর বুক ও পিঠে হৃৎপিণ্ডের জায়গা বরাবর এদের বেঁধে দেওয়া হয়। অপারেশনের সময় বুক কাটা অবস্থায় যদি এ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তাহলে একটা ইলেকট্রোডকে একেবারে হৃৎপিণ্ডের গায়ে স্পর্শ করান হয়।

যন্ত্রটিকে যখন শহরের সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহে যোগ করা হয় তখন কারেণ্ট পরিচালনা করা হয় কারেণ্ট উঁচু করার ট্রান্সফরমার ও রেক্টিফাইয়ারের মধ্য দিয়ে যন্ত্রের কণ্ডেন্সারগুলিতে। সেই কণ্ডেন্সারগুলিকে চার্জ করা হয় প্রয়োজনীয় টেনসন পর্যন্ত। সুইচ টিপলেই কণ্ডেন্সার কারেণ্ট ডিসচার্জ করে ও হাই টেনসন কারেণ্ট, ইণ্ডাকশন স্পিণ্ডল ও ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে হাজির হয়।

বিদ্যুতের আঘাতে হৃৎপিন্ডের ফিব্রিলেশন হয়ে মৃত্যু হলে পুনরুজ্জীবনের জন্য কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডের ডিফিব্রিলেশন ব্যবহার করতে হয়।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর্যায়ে আলাদাভাবে শুধুই উচ্চ চাপে আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালন বা শুধু রক্ত পরিসঞ্চালন ও তার সাথে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা, ইত্যাদি সবসময় ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু যদি মনে হয় যে তখনও দেহকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে এমন সব অন্য উপায়ের সাহায্য নেওয়া দরকার যা হৃৎপিন্ডের কাজ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে।

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রমাণিত হয়, যে হৃৎপিন্ডের কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুক কেটে তালে তালে হৃৎপিন্ডকে চেপে ধরলে (হার্ট ম্যাসাজ) কোন কোন ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত হয়, ফিরে আসে সমস্ত দেহের কার্যক্ষমতা। যেহেতু এতে বুক কাটতে হয় তাই অতি শক্ত উপায় হিসাবে তা চিকিৎসায় তেমন বেশী প্রচলিত হতে পারেনি। তাছাড়াও মালিশ করতে করতে অনেক সময় হৃৎপিন্ডের ফিব্রিলেশন হত যাকে রোধ করার মত কোন উপায়ই তখন জানা ছিল না।

এখন যখন ডাক্তারেরা হৃৎপিন্ডের ফিব্রিলেশনের বিরুদ্ধে লড়তে শিখেছেন, যখন আর্টারির মধ্যে উচ্চ চাপে রক্ত পরিসঞ্চালন করে খুবই তাড়াতাড়ি হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত চলাচলের উন্নতি ঘটানো সম্ভব, যখন হৃৎপিন্ডের কাজ ও সমস্ত দেহের কাজ পুনরুজ্জীবিত করার অনেক মূল প্রশ্ন আজ পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে তখন হৃৎপিন্ড ম্যাসাজের প্রশ্নটা আবার নতুন করে এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারদের সামনে।

হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধের প্রথম দুই মিনিটের মধ্যে আর্টারিতে উচ্চ চাপে রক্ত পরিসঞ্চালন করে যদি কোন ফল না পাওয়া যায় তখন সোজাসুজি হৃৎপিন্ডের ম্যাসাজ শুরু করা হয়। অর্থাৎ এক হাত বা দুহাত দিয়ে হৃৎপিন্ডকে তালে তালে চেপে ধরা হয়। প্রত্যেক বার চেপে ধরার ফলে হৃৎপিন্ডের ভিতরকার রক্ত রক্তের শিরায় গিয়ে পড়ে ও এমনি করেই শুরু হয় কৃত্রিম রক্তপ্রবাহ। ফলে জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান অঙ্গগুলির, সর্বাগ্রে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কোষগুলির সেই সব পরিবর্তন সময় থাকতে রোধ করা সম্ভব হয় যে পরিবর্তন একবার হলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভব।

ঠিকভাবে, সময়মত হৃৎপিন্ড ম্যাসাজের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য দেহের রক্তপ্রবাহ ভালভাবেই চালু রাখা চলে। তাছাড়াও, তালে তালে চেপে ধরবার ফলে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীতে অবস্থিত নার্ভের অগ্রভাগগুলির মেকানিক্যাল ইরিটেশন হয় এবং তা হৃৎপিন্ডের স্বতঃপ্রবৃত্ত সংকোচন শুরু হওয়ার দিকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

কয়েক বছর হল বুকের সার্জারীর প্রভূত উন্নতির ফলে হৃৎপিন্ডের ম্যাসাজের মতো প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে।

হৃৎপিণ্ডের ম্যাসাজ তখনই কাজে লাগে যদি তা করতে গিয়ে সর্বদা স্মরণ রাখা হয় মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের অন্তর্নিহিত সমস্ত নিয়মাবলী। হৃৎপিণ্ডের ম্যাসাজের মতো প্রক্রিয়াটি কখনই ফলপ্রসূ হত না, যদি না স্মরণ রাখা হত যে মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশের কাজ পুনরুজ্জীবিত করতে হলে এক বিশেষ পরিমাণের ঊর্ধ্বে রক্তের চাপ সৃষ্টি করা দরকার। রক্তের চাপ সেই পরিমাণের চেয়ে কম হলে মস্তিষ্ক কর্টেক্স কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত হয় না, যদিও সেই অল্প চাপেই মস্তিষ্কের নিম্নতর অংশ ও হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে তাদের নিজ কাজ শুরু করে দেয়।

গোটা দেহকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাই হৃৎপিণ্ডের ম্যাসাজের সাথে সাথে উচ্চ চাপে আর্টারিতে রক্ত ঠেলে দেওয়ার মূল্য খুবই বেশী।

দেহের জীবনী শক্তি স্তিমিত ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার নিয়মনীতি

এক্সপেরিমেণ্টে (এই যেমন অতি মাত্রায় রক্তপাতের ফলেই ধরা যাক না কেন) কুকুর কী ভাবে মরে তা লক্ষ্য করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পশুটির অসম্ভব ছটফটানি। দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করে সে আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়ে। তারপর সেই ছটফটানি থেমে গিয়ে তার শরীরে নেমে আসে অবসন্নতা। অবসন্নতার কারণ হল এই যে তার গোটা মস্তিষ্ক কর্টেক্স তখন ছেয়ে যায় অবসন্নতায় (depression) ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে বাইরে থেকে দেখে ঘুম বলে মনে হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি প্রথমে কিছুটা বেড়ে গিয়ে পরক্ষণেই কমের দিকে যেতে থাকে, দেখা দেয় শেষ অবস্থার ঝাঁকুনি নিশ্বাস। মনে হয় পশুটি যেন হাওয়া গিলছে — দেখা দেয় নাভিশ্বাস। তারপর নিশ্বাস নেওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি কিছুক্ষণ চলতে পারে কিন্তু তারপর সেই দুর্বল ধুকধুকানিটুকুও বন্ধ হয়ে যায়। পশুটি তখন আর কোন ইরিটেশনেই সাড়া দেয় না, চোখের মণি বড় হয়ে ওঠে, আসে মৃত্যু — ক্লিনিক্যাল মৃত্যু।

পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয় ঠিক উল্টো পথে। সেই সমস্ত অঙ্গের কাজ প্রথম পুনরুজ্জীবিত হয় যার কাজ স্তিমিত হয়েছিল সবচেয়ে পরে, বা প্রথমে পুনরুজ্জীবিত হয় সেই সব অঙ্গের কাজ বিবর্তনের দিক থেকে যারা আবির্ভূত হয়েছিল সবচেয়ে আগে। সকলেই জানে যে পশুদের হৃৎপিণ্ড ও রক্তের শিরা দেখা দেয় মস্তিষ্কের অঙ্কুর দেখা দেওয়ার অনেক আগে। তাই দেহের পুনরুজ্জীবনের পর্যায়ে হৃৎপিণ্ড, যার কাজ সবচেয়ে শেষে স্তিমিত হয়েছিল, তার কার্যক্ষমতাই ফিরে আসে সবচেয়ে আগে। মাংসপেশীর টোন (tone) বা শক্তি তখনও ফেরেনি, চোখের মণি সরু হওয়া শুরু হয়নি, বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রিফ্লেক্স ফেরেনি, কিন্তু পুনরুজ্জীবন শুরু করার ২০ থেকে ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফিরে এল হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা।

কিছুক্ষণের মধ্যে, সাধারণত হৃৎপিণ্ডের কাজ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্বাসের কাজ ফিরে আসতে থাকে। প্রথমে শ্বাসটা দেখতে হয় ঠিক সেই মৃত্যুপূর্ব শেষ সময়ের নিশ্বাসের মতো। তারপর নিঃশ্বাস ক্রমেই ঘন হয়ে আসে ও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। নিশ্বাসের কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের মণিও আস্তে আস্তে ছোট হতে আরম্ভ করে, দেখা দেয় কর্নিয়ার রিফ্লেক্স — চোখের কর্নিয়া ছুঁলে পরেই চোখের পাতা বুজে আসে। তারপর ফিরে আসে মাংসপেশী ও টেণ্ডন (tendon) রিফ্লেক্স। তখনও বাইরে

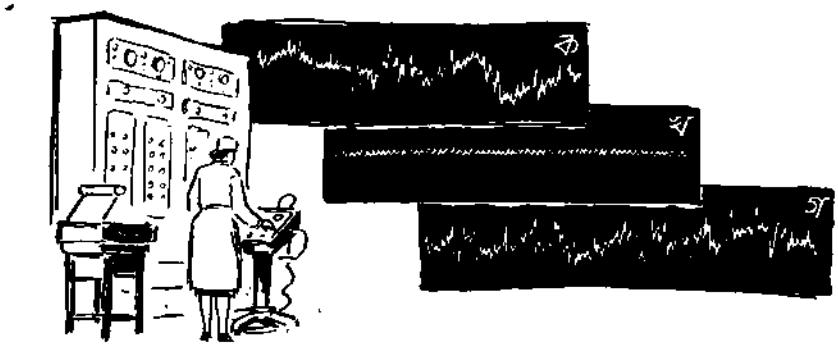

চিত্রে দেখানো হচ্ছে কুকুরের মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা। (ক) স্বাভাবিক অবস্থা, (খ) মৃতাবস্থা ও (গ) পুনরুজ্জীবনের পর।

থেকে দেখে কিন্তু মনে হয় যে পশুটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন; কেননা মস্তিষ্কের উর্ধ্বতন অঞ্চল, বিশেষ করে মস্তিষ্ক কর্টেক্স তখনও সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত হয়নি। এই অবস্থা ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা চলার পর ফিরে আসে প্রথম হুঁশ, কেটে যেতে আরম্ভ করে মৃত্যুপূর্ব, ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বা পুনরুদ্ধারের প্রথম পর্যায়ের মস্তিষ্ক কর্টেক্সের সেই অবসন্নতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কাজ সবচেয়ে আগে স্তিমিত হয় ও পুনরুদ্ধারের সময় ফিরে আসে সবচেয়ে পরে।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের জীবনী শক্তি সংরক্ষণের বাস্তব ভিত্তিটা তাহলে কী?

মৃত্যুপূর্ব অবস্থা, ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বা পুনরুজ্জীবনের প্রথম অবস্থায় দেহের মধ্যে দেখা দেয় ভীষণ অক্সিজেনের অভাব। তার কারণ শুধু এই নয় যে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। নানা রকমের ফার্মেণ্ট (ferment) যারা স্বাভাবিক সময় টিসুর মধ্যে অর্গানিক পদার্থের আদান-প্রদান চালু রেখে টিসু রেস্পিরেশনে (respiration) সাহায্য করে তাদের কাজ দুর্বল হয়ে যাওয়াও এর অন্যতম কারণ।

টিস্যু রেস্পিরেশনে টিস্যু সাধারণত যে ইন্ধন ব্যবহার করে থাকে তা হল কার্বোহাইড্রেট বিশেষ করে গ্লুকোজ। গ্লুকোজের রাসায়নিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে এনার্জি তৈরী হয় জীবনী শক্তি বজায় রাখার জন্য কোষগুলি তাকেই ব্যবহার করে থাকে। অক্সিজেন কম হয়ে গেলে পর টিস্যু রেস্পিরেশন খুবই ব্যাহত হয়, তখন অক্সিজেন ছাড়াই চলে কার্বোহাইড্রেটের ভাঙ্গন। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে গ্লাইকোলিসিস (glycolysis)।

গ্লাইকোলিসিস শরীরের পক্ষে ঢের বেশী খরচসাপেক্ষ প্রক্রিয়া, কেননা এতে স্বাভাবিক টিস্যু রেস্পিরেশনের তুলনায় ১৬ ভাগের এক ভাগ এনার্জি তৈরী হয়। গ্লাইকোলিসিসে রক্ত ও টিস্যুর মধ্যে তৈরী হয়ে জমে ওঠে মেটাবলিজমের আধা অক্সিডাইজড্ প্রোডাক্ট (oxydised product), ল্যাকটিক এসিড প্রভৃতি নানা রকমের এসিড।

বহু ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেটের রূপান্তরে ফসফরিক এসিডকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই রূপান্তরে ফসফরিক এসিড যুক্ত কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ মূল্য আছে, কেননা এতে অনেক পরিমাণ এনার্জি তৈরী হয় যা সহজে ব্যবহার করে কোষগুলি তাদের করণীয় কর্তব্য পালন করে যেতে পারে। এই রকমের রাসায়নিক পদার্থের উদাহরণস্বরূপ এডিনোসিন-ট্রাইফসফরিক এসিডের (adenosin triphosphoric acid) নাম করা যায় (A.T.F.)। মৃত্যু পূর্বক্ষণে ও ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় মস্তিষ্কে অনেক পরিমাণ ল্যাকটিক এসিড জমে ওঠে ও সেই সঙ্গে কমে যায় এনার্জি সৃষ্টির মূল উপাদান — কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ।

মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে তখন বেশী করে দেখা দেয় গ্লাইকোলিসিস; কমে আসে ফসফরাস যুক্ত পদার্থের পরিমাণ, কার্বোহাইড্রেট ভাঙ্গনের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যার মূল্য খুবই বেশী। শুধু মরে যাওয়ার সময়েতেই নয়, পুনরুজ্জীবনের প্রারম্ভেও, যখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নিশ্বাস নেওয়ার কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখনও গ্লাইকোলিসিসই রয়ে যায় এনার্জি সংগ্রহের মূল পথ। চোখের রিফ্লেক্স ফিরে আসার মুহূর্ত থেকেই বাড়তে থাকে টিস্যুর অক্সিজেন ব্যবহারের পরিমাণ। গ্লাইকোলিসিস তখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে ও তার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই টিস্যু এনার্জি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে স্বাভাবিক টিস্যু রেস্পিরেশনের মাধ্যমে।

দেহের স্বাভাবিক অর্গানিক পদার্থের বিনিময় শুরু হয় মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কাজ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর থেকে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে গোটা দেহ, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম, ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় তার নিজের জীবনী শক্তি বজায় রাখে মূলতঃ গ্লাইকোলিসিসের মাধ্যমে। কিন্তু স্বাভাবিক টিস্যু রেস্পিরেশনের তুলনায় গ্লাইকোলিসিস বেশী হলে মস্তিষ্ক কর্টেক্স কখনই স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। সে অবস্থায় কর্টেক্সের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তা আবার ফিরে আসে টিস্যু রেস্পিরেশন জোরদার হওয়ার সাথে সাথে। অন্যান্য টিস্যুর অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা বেশীক্ষণ বজায় থাকে বলেই গ্লাইকোলিসিস তাদের উপর কম রেখাপাত করে।

মৃত্যু পূর্বক্ষণ, মৃত্যু ও মৃতের পুনরুজ্জীবনের সময় মস্তিষ্কের কী অবস্থা হয় তা আরও এক উপায়ে বিচার করা যায়। সে হল ইলেক্‌ট্রো-এনসেফালোগ্রাফি (EEG) যার সাহায্যে মাপা যায় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কর্মতৎপরতা। ব্যাপার হল এই যে মস্তিষ্কের নার্ভ কোষগুলি কাজ করতে করতে অনবরত নিজেদের বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবর্তন করতে থাকে। যদিও মস্তিষ্ক কোষের ইলেক্‌ট্রিক পটেনশিয়ালের পরিবর্তন খুব বেশী নয়, তাহলেও বিশেষ অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সেই পোটেনশিয়ালের পরিবর্তন ধরা সম্ভব কেননা সেই যন্ত্রে বিশেষ ল্যাম্পের সাহায্যে অসিলেশনকে (oscillation) লক্ষ লক্ষ গুণ বর্ধিত করার ব্যবস্থা আছে।

বর্তমানে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ইলেক্‌ট্রিক অসিলেশনের চিত্র খুব ভাল করে অধ্যয়ন করা হয়ে গেছে।

মৃত্যু যখন আসছে তখন ইলেকট্রিক অসিলেশন চলে ধীরে ধীরে, তার এম্‌প্লিটুড (amplitude) কমে যায় এবং মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অসিলেশন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় মস্তিষ্ক কর্টেক্সের বৈদ্যুতিক পটেনশিয়ালের কোন পরিবর্তনই ধরা পড়ে না, তার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মস্তিষ্ক তার কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেছে।

যদি মৃত্যুর পর জীবন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হওয়ার পর থেকে তখনও ৫—৬ মিনিটের বেশী সময় পার হয়ে না থাকে তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কোষের জীবনী শক্তি ফিরে আসার সাথে সাথে তাতে বৈদ্যুতিক পটেনশিয়ালের অসিলেশন শুরু হয় এবং ইলেক্‌ট্রো-এনসেফালোগ্রামে তা ধরা পড়ে। প্রথমে এই গ্রাফের সঙ্গে স্বাভাবিক গ্রাফের অসিলেশনের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, স্বাভাবিক ওয়েভের তুলনায় তার ওয়েভগুলি ঢের নীচু। স্বাভাবিক অসিলেশন কখন ফিরে আসবে, কয়েক ঘণ্টা না কয়েক দিন লাগবে তাতে, তা নির্ভর করে কী ভাবে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হয়েছিল তার উপর।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর, জ্ঞান ফিরে এলে, অনেকে অনেক সময় তাদের সেই মৃত অবস্থার বিবরণ দিয়ে থাকে। কেউ বলে, 'মৃত্যুর এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠলাম।' কেউ বা তাকে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানর পর জ্ঞান ফিরে এলে বলে, 'জোর তন্দ্রা এসেছিল।' মনে হয় এই সব উক্তির মধ্যে বিশেষ বায়োলজিভিত্তিক সত্যতা অন্তর্নিহিত আছে, যা তৈরী হয়েছে যুগ যুগ ধরে প্রাণী জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। জীবনী শক্তি নিভে যাওয়ার সময় সেই মৃত্যু প্রক্রিয়ার বিশেষ মুহূর্তে, মস্তিষ্কের মতো দেহের সবচেয়ে সহন শক্তিবিহীন অঙ্গের উপর যখন এমন চাপ এসে পড়ে যা পালন করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় মস্তিষ্কের ডিপ্রেশন। অন্য কথায় বলতে গেলে দেহের সবচেয়ে কঠিন অবস্থার সময় মস্তিষ্ক কর্টেক্স রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজেকে বাঁচায়।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বা পুনরুজ্জীবনের গোড়ার দিকে জীবনের জন্য লড়াই চালায় কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের সেই সব কেন্দ্র বিবর্তনের দিক থেকে যারা প্রাচীন ও যারা সহজে

নষ্ট হয় না। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া চলতে চলতে মস্তিষ্ক কর্টেক্স যখন অবসন্নতার অবস্থা থেকে বেরিয়ে পড়ে তখন তারই জোরে খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায় দেহের সেই সব সাংঘাতিক পরিবর্তন যা দেখা দিয়েছিল মরে যাবার সময় ও ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর্যায়ে।

অনেকক্ষণ ধরে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বা লম্বা মৃত্যুপূর্ব অবস্থা, এই রকম প্রতিকূল উপায়ে যদি মৃত্যু হয়, তাহলে যেমন আগেই বলা হয়েছে হৃৎপিণ্ডের কাজ ফিরে আসে, শ্বাসপ্রশ্বাস চালু হয়, বা মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত হয়, কিন্তু মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কাজ সম্পূর্ণভাবে কখন ফেরান যায় না।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় মস্তিষ্কে কী কী পরিবর্তন হয় তা ধরবার জন্য বিশেষ উপায়ে মস্তিষ্ক টিস্যুর স্লাইড তৈরী করে তা রং করে মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করা হয়। পশুর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পরে ও পুনরুজ্জীবনের পর নানা মেয়াদের ব্যবধানে সোজাসুজি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এতে গোটা মস্তিষ্কের সমস্ত অংশেই স্ট্রাক্চারের পরিবর্তন হয়। তবে সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় মস্তিষ্ক কর্টেক্স ও সেরিবেলামে। এই সব পরিবর্তনের এক অংশকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে তোলা যায়। ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর যত বেশী সময় অতিবাহিত হয় মস্তিষ্কে তত কম পরিবর্তিত, রুগ্ন কোষ পরিলক্ষিত হয়। এক্সপেরিমেন্টে যে পশুটির ২—৩ মিনিটের জন্য ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হয়েছিল পুনরুদ্ধারের ৩০ দিন পর সে পশুর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে কোন প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন পাওয়া যায়নি। কিন্তু যে পশুর ৬—৭ মিনিট ধরে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হয়েছিল পুনরুদ্ধারের ৩০ দিন পর সে পশুর মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কোষে যথেষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২—৩ মিনিটের মত অল্প সময়ের জন্য ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হলেও অন্তত কিছু পরিমাণ নার্ভ কোষ তাতে মরে যায়, কিন্তু যত বেশীক্ষণ সময় ধরে চলে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বা যত দীর্ঘস্থায়ী হয় মৃত্যুপূর্ব অবস্থা তত বেশী পরিমাণে নষ্ট হয় নার্ভ কোষ। কাজেই কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের উপর প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তনের ধাক্কা শুধু যে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর দৈর্ঘ্যের উপরই নির্ভর করে তা নয়, মৃত্যুপূর্ব অবস্থার সময়কালের উপরও তা নির্ভরশীল। মৃত্যুপূর্ব অবস্থায় পশু দেহে যত বেশীক্ষণ ধরে নীচু রক্তের চাপ পরিলক্ষিত হয় অতি কম সময়ের জন্য স্থায়ী হলেও ক্লিনিক্যাল মৃত্যু পর্যায়ে তার মস্তিষ্ক কর্টেক্সে তত বেশী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের মধ্যেও লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে যখন ক্লিনিক্যাল মৃত্যু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় তখন তাকে সে অবস্থা থেকে পুরোপুরি উদ্ধার করা কষ্টকর। সে সব লোকের প্রায়ই সাংঘাতিক স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ আস্তে আস্তে কেটে যায়, তখন পুরোপুরি ফিরে আসে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মৃত্যুপূর্ব অবস্থা যখন বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, তখন মস্তিষ্ক কর্টেক্সের সে পরিবর্তন আর ফেরানো যায় না। দেহ তখন আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি

একেবারেই সাড়া দেয় না, অর্থাৎ মানুষটির জ্ঞান আর ফেরে না, এবং সাধারণত অনতিবিলম্বে মৃত্যু তার হয়। এই কারণেই ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হওয়ার আগে বা হৃৎপিন্ড ও শ্বাসের কাজ বন্ধ হওয়ার প্রথম কয়েক মিনিটেই ক্লিনিসিস্ট বা চিকিৎসকেরা পুনরুদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা করে থাকেন, কেননা তখনও দেহের, বিশেষ করে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের জীবনী শক্তি, ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ই. প. পাভলভ দেখান যে মস্তিষ্কের বৃহত্তর গোলার্ধের কাজ হল সেই সব রিফ্লেক্স তৈরী করা যাকে বলা হয় কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স (conditioned reflex)।

ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্সের সাথে কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্সের তফাৎ এই যে কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স মানুষ বা পশুর নিজের জীবন কালে তৈরী হয়। ই. প. পাভলভ ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্সকে বাইরের ইরিটেশনের প্রতি দেহের জন্মগত প্রতিক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করেছেন (লালা নিঃসরন, গেলা, হাঁচি, কাশি, চোখের মণি সংকোচন প্রভৃতি ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স)। মানুষ বা পশুর মধ্যে জন্মের পর থেকেই ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স দেখা দেয়। কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স হল সাময়িক নার্ভ কানেকশন যা তৈরী হয় দেহের বাইরের প্রকৃতির অসংখ্য স্টিমুলাসের শুধু সেই সব স্টিমুলাসের উত্তরে যারা ননকন্ডিশন্ড্ স্টিমুলাসের সঙ্গে একত্রে দেহের উপর কাজ করে।

ই. প. পাভলভ কর্তৃক কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স আবিষ্কারের পরই বিজ্ঞানীদের হাতে আসে মস্তিষ্কের বৃহত্তর গোলার্ধের কাজ পরীক্ষা করে দেখার বাস্তব উপায়।

মরে যাওয়ার সময় সর্বপ্রথম নষ্ট হয় মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কাজ অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন স্নায়বিক কর্মতৎপরতা। তাই কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স তখন নষ্ট হয় ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্সের আগে। পুনরুদ্ধারের সময় কিন্তু ঠিক তার উল্টো — ননকন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স ফিরে আসে আগে ও তার পর কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স।

পুনরুজ্জীবিত পশুদের কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু, মস্তিষ্ক কর্টেক্সের কাজে গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে এই সব পরিবর্তন চলে গেলে কন্ডিশন্ড্ স্টিমুলাসের প্রতি মস্তিষ্কের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আবার পুরোপুরি ফিরে আসতে পারে।

পুনরুজ্জীবনের পর কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স ফিরে আসা বিশেষ করে নির্ভর করে কতক্ষণ ক্লিনিক্যাল মৃত্যু স্থায়ী হয়েছিল তার উপর তবে পশুটির নিজস্ব বিশেষত্বও তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোন কোন পশুর ৩—৪ মিনিট ধরে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পরও আগেকার তৈরী কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স পুনরুজ্জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুরোপুরি ফিরে আসে। কিন্তু সেই পশুর উপর যদি নার্ভাস স্ট্রেইন সৃষ্টি করা যায় তাহলে কন্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স ফিরে আসতে লাগে কয়েক মাস।

কুকুরদের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের গোড়ার দিকে পুনরুদ্ধার কৃত কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স ও পূর্বতন কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্সে যে তফাৎ দেখা যায় তা কিছুকাল পরে চলে যায় এবং তাদের হায়ার নার্ভাস একটিভিটি হয়ে দাঁড়ায় সুস্থ কুকুরের মতো।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পাভলভের কণ্ডিশণ্ড্ রিফ্লেক্স তৈরীর উপায় ব্যবহার করে বের করা যায় পুনরুজ্জীবিত পশুর মস্তিষ্ক কর্টেক্সে কী পরিবর্তন হয় এবং কখন ও কেমন করে কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলির কাজ সম্পূর্ণ রূপে ফিরে আসে।

মানুষের সেনায় পুনরুজ্জীবনের চিকিৎসা

মানুষের জীবন পুনরুদ্ধারের এই চিকিৎসা প্রথম ব্যবহার করা হয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়।

তারপর যুদ্ধের পরবর্তীকালে এই উপায়টিকে আরও উন্নত করে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ক্লিনিকে সার্জারী, গাইনেকলজি ও অবস্‌টেট্রিক্সের বিভিন্ন ইমার্জেন্সি কেসে। স্বভাবতই, কার্যত সুস্থ মানুষের হঠাৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রেই এই উপায়টি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভীষণ রক্তপাত, নানা দুর্ঘটনা, এসফিক্‌সিয়া, বৈদ্যুতিক সক, ডুবে যাওয়া বা অনুরূপ অন্য কোন কারণবশত সুস্থ লোকের হঠাৎ মৃত্যু হলেই এই চিকিৎসা ব্যবহার করা হয়।

১৯৫২ সালে মস্কোতে বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে ব্যবহৃত পুনরুজ্জীবনের উপায়গুলি বিচার ও বিশ্লেষণ করার জন্য এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে পুনরুজ্জীবনের সমস্যা নিয়ে সে বিষয়ে কার্যরত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীরা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন শহরের ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পুনরুজ্জীবনের বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ সম্বন্ধে ঐ সময়ের মধ্যেই যে সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ডাক্তারি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে যে তখন পর্যন্ত এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়েছিল প্রায় দু-হাজার মুমূর্ষু লোকের উপর। ১৯৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে এই উপায়ে চিকিৎসাকৃত ৩,০০০ মুমূর্ষু রোগীর অবস্থার কথা প্রকাশিত হয়। হিসেব করে দেখা যায় যে সকের চরম অবস্থা ও মৃত্যুপূর্বক্ষণে উপস্থিত রোগীদের প্রায় ৭০%-এর মতো লোককে ঐ সব উপায়ে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু সে জায়গায় ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবন ফেরান সম্ভব হয় মাত্র ১০—২০%-এর মতো রোগীর ক্ষেত্রে।

কয়েক বছর হল বুকের সার্জিক্যাল অপারেশনের সময় মৃত রোগীদের প্রাণ পুনরুদ্ধারের কথা শোনা যাচ্ছে। পুনরুজ্জীবনের উপায় আজকাল শুধু যে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালেই

ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, এমনকি মফস্বলের ডাক্তাররাও তাঁদের হাসপাতালে ক্রমশ তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করছেন।

আমরা এখন এখানে এমন তিনটি কেসের উদাহরণ দেব যাতে সময়মত পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার ফলে রোগীর জীবন বাঁচান সম্ভব হয়।

ল্যারিসা ম., ৭ বছর মাত্র বয়স, রাস্তা পার হবার সময় ও ট্রামের তলায় চাপা পড়ে। দুটো পাই ওর থেঁৎলে যায়, মরণাপন্ন অবস্থায় ওকে তখন মস্কোর রুসাকভ শিশু হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা করে ধরা পড়ে ভীষণ রক্তাল্পতা, চরম সকের অবস্থা, হৃৎপিন্ড অতিশয় দুর্বল ও ভীষণ নীচু রক্তের চাপ। রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য তখন তাড়াতাড়ি অপারেশনের প্রয়োজন হয়। অপারেশনের সময় ওর ভেনের মধ্য দিয়ে রক্ত, প্লাজমা বা রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমন সব পদার্থ ক্রমাগত পরিসঞ্চালন করা হয় ও মাঝে মাঝে দেওয়া হয় হৃৎপিন্ডের স্টিমুল্যাণ্ট। এই সব করা সত্ত্বেও মেয়েটির অবস্থা ক্রমশই আরও খারাপ হতে থাকে চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঠোঁট ও নখ নীল রঙ ধারণ করে। চোখের মণি স্ফীত হয়। তারপর ওর নাড়ী একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, থেকে থেকে অগভীর নিশ্বাস পড়তে থাকে এবং হৃৎপিন্ডের স্টিমুল্যাণ্ট ও অক্সিজেন দেওয়া সত্ত্বেও রোগিনীর অবস্থার কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। তারপর নিশ্বাসের কাজ ও হৃৎপিন্ডের সংকোচন বন্ধ হয়ে ওর ক্লিনিক্যাল মৃত্যু শুরু হয়।

নিশ্বাস ও হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার দুই তিন মিনিট পর ডাক্তার ক. ভ. কনস্তানতিনভা মেয়েটির আর্টারিতে উচ্চ চাপে রক্ত পরিসঞ্চালন করলেন, তাতে ওর হৃৎপিন্ডের সংকোচন আবার শুরু হল, শরীরের বিভিন্ন পেরিফেরাল আর্টারিতে নাড়ী পাওয়া গেল, ঠোঁট ও চামড়া গোলাপী রং ধারণ করল এবং তার কিছুক্ষণ পরই নিশ্বাস পড়তে শুরু করল।

অপারেশন চলাকালীন ওর ভেনের ভিতর অনবরত রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়। তারপর অপারেশনের শেষে আবার উচ্চ চাপে আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়, কেননা তখন রক্তের চাপ কমে যেতে আরম্ভ করেছিল। এমনি ভাবে অপারেশন ভালয় ভালয় শেষ করে মেয়েটির জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। লারিসা এখন সুস্থ ও ইস্কুলে পড়ছে।

রোগী স., ৪৫ বছর বয়স, মস্কোর বতকিন হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। গলায় তার মস্ত বড় ক্ষত; অনেক রক্তের শিরা কাটা পড়ায় রোগী হাসপাতালের পথে প্রচুর রক্ত হারায় এবং তার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আশংকাজনক। যেমন দেহের চামড়া রঙ তেমনি তার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। তারপরই রোগী সংজ্ঞা হারায়, থেকে থেকে তার টানের মতো নিশ্বাস পড়তে থাকে, নাড়ী এত দ্রুত হয় যে গোনা যায় না এবং রক্তের চাপ এত কমে যায় যে তা মাপা অসম্ভব। কাল বিলম্ব না করে আহতের আর্টারিতে ৪৫০ সিঃ সিঃ রক্ত পরিসঞ্চালন করা হল। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। মুখের চেহারায়

লালচে ভাব ফিরে এল, নাড়ী রিথমিক হয়ে উঠল, হৃৎপিন্ডের টোন ফিরে এল, রক্তের চাপ দাঁড়াল ১৪০/৮০ মিলিমিটার।

তারপর সে অবস্থায় শুরু করা হল অপারেশন ও একই সঙ্গে চলল ভেনের মধ্যে রক্ত পরিসঞ্চালন। ভালয় ভালয় অপারেশন শেষ হল, অপারেশনের পরবর্তীকালটাও তার কাটল ভালই। তারপর শেষে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় কেস: একটি মেয়েকে ভর্তি করা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর নিউরোলজি ইনস্টিটিউটে। মেয়েটির পলিওমায়েলাইটিস, হাত পা অবশ হয়ে গেছে, ডায়াফ্রাম অবশ হয়ে গিয়ে দুই ফুসফুসে তার নিউমোনিয়া হয়। প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা, গলায় আওয়াজ নেই, কাশি দেবার ক্ষমতা নেই, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার ইয়ে ভ. গতোভৎসেভা যেমনি নিউম্যাটিক বাইন্ডার দিয়ে মেয়েটির কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ করলেন অমনি ওর জ্ঞান ফিরে এল। ২—৩ দিনের মধ্যেই মেয়েটির প্রায় নিজে নিজে নিশ্বাস নেওয়ার মতো ক্ষমতা ফিরে আসে। তাই যখনই ওর নিশ্বাসের কষ্ট হত ও হাত দিয়ে ইসারা করতেই কৃত্রিম নিশ্বাসের যন্ত্রটি চালু করে কষ্ট লাঘব করা হত। মেয়েটি হাত দিয়ে ইসারা করত তার কারণ তখনও ও কথা বলতে পারত না। এমনি করেই আস্তে আস্তে ভাল হতে হতে মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

হাইপোথার্মি ও দেহের পুনরুজ্জীবন সমস্যা

কোন কোন পশুদের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবেশে শীতকালে হাইবারনেশন **(hibernation)** বা জড়ত্বের যে অবস্থা সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই রুশ বিজ্ঞানী প. ই. বাখমেতিয়েভ দেখতে পান যে সে সময় তাদের দেহের সমস্ত অঙ্গের জীবনী তৎপরতা ভীষণভাবে কমে যায়, ও তাদের জীবনের গতি সে সময় যেন 'খুবই ধীরে' চলে। প. ই. বাখমেতিয়েভ তারপর অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করে প্রমাণ করেন যে, সেই সব গরম রক্ত পশু যাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে আপনা থেকে কখনই জড়ত্বের অবস্থা সৃষ্টি হয় না তাদের মধ্যেও এনাবায়োসিস বা কৃত্রিম উপায়ে জীবনের গতি মন্থর করা সম্ভব। তিনি পশুদের কার্বনিক এসিড গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করে ঠান্ডা কামরায় বা বরফ চাপা দিয়ে রেখে দেখেন যে এতে করে তাদের দেহের তাপ শীতকালীন জড়ত্বের তাপের তুলনায় আরও ঢের নীচে নেমে আসে। প. ই. বাখমেতিয়েভ এই উপায়ে বাদুরের গায়ের তাপ ৯° ডিগ্রীতে নামিয়ে অজ্ঞান করে তারপর তাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে বিজ্ঞানের উন্নতি হলে এমন একদিন আসবে যখন বানর এমনকি মানুষের মতো উচ্চসংগঠিত

প্রাণীর দেহেও নিশ্চয়ই এনাবায়োসিস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

হাইপোথার্মি এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাকাপাকিভাবে নিজের স্থান করে নিয়েছে। হাইপোথার্মি হল কৃত্রিম উপায়ে মানুষের শরীরের তাপ কমানর উপায় যাতে করে টিস্যুর সমস্ত জীবনী প্রক্রিয়া কমান যায়, কমে যায় দেহের অক্সিজেন চাহিদা ও মন্থর করা যায় কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের কাজ। হাইপোথার্মির ফলে দেহের সমস্ত টিস্যু ও কোষ সাময়িকভাবে নিজেদের স্পেসিফিক কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলে, তবে সে অবস্থায় তাদের জীবনী শক্তি বজায় থাকে বলেই শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসে তাদের ফাংশন ও স্পেসিফিক কর্মক্ষমতা। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে দেহের তাপমাত্রা কমানোর ফলে দেহের এনার্জি খরচ করা অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং তা এমন ভাবে কমে যে সাময়িকভাবে শরীরের সমস্ত টিস্যুতে, এমনকি সবচেয়ে অক্সিজেনকাতর মস্তিষ্ক কর্টেক্সের টিস্যুতেও অক্সিজেন যাওয়া বন্ধ হলে সে টিস্যু নষ্ট হয় না। দেহের তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিক হত তাহলে অবশ্যই এতে তা নষ্ট হয়ে যেত।

হাইপোথার্মিকে যে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব এই ধারণার সমর্থনে গত ১৫—২০ বছর ধরে অনেক দেশে ব্যাপক আকারে গবেষণা চলেছে, ও আজ পর্যন্ত সে বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক দেশের বড় বড় সার্জেনরা এখন অপারেশনের সক নিবারণ বা ভাল এনেস্থেসিয়ার উদ্দেশ্যে এই উপায়টি ব্যবহার করে থাকেন।

হৃৎপিণ্ডের যে সব জটিল রোগে, রোগীর খারাপ অবস্থা জনিত সাধারণ এনেস্থেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা চলে না, সে সব রোগে হাইপোথার্মি ব্যবহার করে আজ অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, যে সব অপারেশন অত্যন্ত জটিল ও যাতে অনেকক্ষণ ধরে এনেস্থেসিয়া চললে নার্ভাস সিস্টেমের এক্সাইটমেণ্টের ফলে সক হতে পারে সে সব ক্ষেত্রেও হাইপোথার্মি ব্যবহার করে সহজে অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। মেটাবলিজম কমে যাওয়া, শ্বাসের ও হৃৎপিণ্ডের কাজ মন্থর হওয়া, শরীরের স্পর্শকাতরতা কমে যাওয়া, প্রভৃতি—হাইপোথার্মির এই সব গুণগুলি অপারেশনে খুবই সাহায্য করে থাকে।

আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা করা বা হাইপোথার্মি সার্জারীতে তার নিজস্ব স্থান দখল করে ফেলেছে। স. স. গিরগলাভ, প. আ. কুপ্রিয়ানভ, আ. ন. বাকুলেভ, আ. আ. ভিশ্নেভস্কি, আ. ভ. গুলিয়ায়েভ, ব. ভ. পেত্রভস্কি প্রভৃতি নাম করা সোভিয়েত সার্জেনেরা শুধু যে এই উপায়টিকে মেনে নিয়েছেন তাই নয় তাঁরা এখন হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে কঠিন অপারেশনগুলি এর সাহায্যে করে থাকেন।

যাতে তাপমাত্রা হ্রাস করে দেহের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কর্মতৎপরতা অনেক পরিমাণে কমিয়ে আনা যায় তার জন্য রোগীর শরীরের চারদিকে বরফ রাখা হয় বা তাকে এমন ঠান্ডা জলের বাথটবে শুইয়ে রাখা হয় যার তাপমাত্রা মাত্র ৪°—৫° ডিগ্রী। কোন কোন সার্জেন রোগীর জন্য এমন এক বিশেষ ধরনের কম্বল ব্যবহার করে থাকেন যার ভিতর ঠান্ডা জলের নল বসান থাকে।

সকলেই জানে যে ভীষণ তাড়াতাড়ি খুব বেশী রকম ঠান্ডা করে ফেললে তাতে শরীরে আঘাত লাগে। তাই ঠান্ডা করবার আগে যে মানুষ বা এক্সপেরিমেন্টের পশুর উপর কঠিন অপারেশন করা হবে তাকে জোরাল ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। এতে ঠান্ডার জন্য শরীরের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

হাইপোথার্মিতে শরীরের ভিতর কি কি পরিবর্তন হয় তা অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীরা এই উপায়টিকে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময়কাল বৃদ্ধির কাজে লাগাতে মনস্থ করেন। গত ১০—১৫ বছরে এদিক থেকে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা গেছে।

এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিওলজির হাইপোথার্মি লেবরেটারিতে ১৯৫৪ সাল থেকে এ সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। এঁদের উদ্দেশ্য হাইপোথার্মির সাহায্যে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময়কাল বৃদ্ধি করা। কৃত্রিম উপায়ে দেহের তাপমাত্রা ১৩°—১০° ডিগ্রীতে নামিয়ে তারপর রক্তপাত ঘটিয়ে এক্সপেরিমেন্টে একটি পশুর ক্লিনিক্যাল মৃত্যু ঘটান হয় এবং তার দু ঘণ্টা পরে তাকে বিভিন্ন উপায়ে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়। দেখা যায় যে মৃত্যুর পর এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও পশুটিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিন্ডের কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ঠান্ডার পরিবেশে পুনরুজ্জীবনের সময় অনেক কেসে হৃৎপিন্ড তার ছন্দ বা তালে তালে সংকোচনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সৃষ্টি হয় হৃৎপিন্ডের ফিব্রিলেশন। ফিব্রিলেশন রোধ না করতে পারলে সাধারণ তাপমাত্রার পরিবেশের মতই ঠান্ডার পরিবেশেও দেহকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় না। তাই পুনরুজ্জীবিত করার সময় ফিব্রিলেশন দূর করার জন্য ডিফিব্রিলেটার ব্যবহার করা হয়।

পূর্বকথিত পুনরুজ্জীবনের সমস্ত উপায় অবলম্বন করে দেখা যায় যে তাতে পশুটির দেহের জীবনী শক্তি সম্পূর্ণ ফিরে আসে, এমনকি মস্তিষ্ক কর্টেক্সের ফাংশনও সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ঘুমের ওষুধ বা ন্যার্কোটিক আচ্ছন্ন পশুর দেহ কৃত্রিম উপায়ে ঠান্ডা করে তার ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময়কাল, অর্থাৎ মৃত্যুর পর যে সময়ের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সেই সময়কাল, ৫—৬ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ান যায়।

হাইপোথার্মির পরিবেশে জোর রক্তপাতের ফলে পশুর জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তাকে ১ ঘণ্টা ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করায় তার দেহে যে ডিনামিক বা ক্রমপরিবর্তন হয় তা দেখানর জন্য এখানে ১৯৫৫ সালের ১৬ই মার্চের একটা এক্সপেরিমেণ্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যাতে ১ ঘণ্টা ধরে চলে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর সময় কাল।

১১ কিলোগ্রাম ওজনের একটি কুকুর নেওয়া হয়, এক্সপেরিমেণ্টের আগে তার নাড়ীর গতি ছিল মিনিটে ৮৮, শ্বাস মিনিটে ৩৬, রেক্টামের তাপমাত্রা ৩৮·৯° ডিগ্রী।

৯টা বেজে ৩৩ মিনিটের সময় নোভোকেইন দিয়ে অবশ করে তার দুই পায়েরই ফিমোরাল আর্টারি (femoral artery) ও ভেন কেটে উন্মুক্ত করে রাখা হয়। ডান ফিমোরাল ভেনে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে হেপারিন দেওয়া হয় — হেপারিন হল রক্ত যাতে জমে না যায় তারই ওষুধ।

৯টা বেজে ৪০ মিনিটের সময় তার বাঁয়ের ফিমোরাল আর্টারিতে হৃৎপিণ্ড মুখী একটা কাচের টিউব পড়িয়ে তাকে হেপারিন সলিউশনপূর্ণ এক রবার টিউবের মাধ্যমে পারদের ম্যানোমিটারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। পারদের উপর ভাসছে একটি কাচের টুকরো যার সঙ্গে যুক্ত এক ধাতব পিভট। পিভটের শেষ অংশের সাথে যুক্ত কলমের নিবের মতই একরকম নিব। এই নিবটি ম্যানোমিটারের পারদের সমস্ত ভাইব্রেশন, অসিলেশন আকারে কিমোগ্রাফের ফিতের উপর এঁকে ফেলে। এই গ্রাফটি হল সেই পশুর রক্তের চাপের গ্রাফ। পশুটির শ্বাসের কাজ কেমন চলছে তা দেখবার জন্য তার বুক হাওয়া ভর্তি এক রবারের বাইণ্ডার দিয়ে বাঁধা হয়, তার সঙ্গে পরান হয় এক বিশেষ ক্যাপসুল যার একদিকে এক রবারের মেম্ব্রেন রয়েছে। সেই মেম্ব্রেনের সাথে আবার আটকান এক কলম যা দিয়ে শ্বাসের জন্য বুকের যে ওঠা নামার গতি তা কাগজে আঁকা হয়ে যায়। এক্সপেরিমেণ্টের শুরুতে কুকুরটির আর্টারির রক্তের চাপ ছিল ১৪০ মিলিমিটার ও শ্বাসের গতি মিনিটে তখন ৩৪। তারপর ভেনের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে পেণ্টোথ্যাল দেওয়া শুরু করা হল। পেণ্টোথ্যাল ঘুমের ওষুধ, যদিও তাতে ঘুম সেরকম গভীর হয় না।

৯টা ৫৭ মিনিট, পশুটি তখনও ঘুমচ্ছে, তাকে ঠাণ্ডা করা শুরু করা হল। বরফের ছোট ছোট টুকরোর উপর অয়েল ক্লথ চাপা দিয়ে তার উপর কুকুরটিকে শুইয়ে তাকে চারদিক থেকে খণ্ড খণ্ড বরফ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

১২টা বেজে ৫২ মিনিট, রক্তের চাপ ৯৭ মিলিমিটার, নাড়ীর গতি মিনিটে ৪৬, শ্বাস পড়ছে মিনিটে মাত্র ৪ বার, শরীরের তাপমাত্রা ২৫·২° ডিগ্রী; রক্তপাত করানো শুরু করা হল।

১২টা বেজে ৫৬ মিনিট ১০ সেকেন্ড, দেখা দিল মৃত্যুপূর্ব অবস্থার সূচনা। রক্তের চাপ ৩০ মিলিমিটার, স্বাভাবিক শ্বাসের পরিবর্তে থেকে থেকে অনেকক্ষণ পর পর ঝাঁকি দেওয়া এক আধটা শ্বাস পড়ছে।

দুপুর ১টা বেজে ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। শরীরের তাপমাত্রা ২৪·৫° ডিগ্রী, শুরু হল ক্লিনিক্যাল মৃত্যু। ঠাণ্ডা করা চলতে থাকল।

দুপুর ১টা বেজে ৪৪ মিনিট, আরও বেশী ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা বন্ধ করা হল। শরীরের তাপ পৌঁছল তার সবচেয়ে নীচু তাপমাত্রায় — ১৯·৯° ডিগ্রীতে। তখন ক্লিনিক্যাল মৃত্যু শুরু হওয়ার পর ৫২ মিনিট কেটে গেছে।

দুপুর ২টো বেজে ১ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা শুরু করা হল। ডান ফিমোরাল আর্টারিতে উচ্চ চাপে রক্ত পরিসঞ্চালন আরম্ভ করা হল। সে রক্তের তাপমাত্রা ৩৭° ডিগ্রী। একই সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসে হাওয়া ঠেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ পরিচালনা করা আরম্ভ হল। ৫৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড ধরে চলে তার ক্লিনিক্যাল মৃত্যু।

দুপুর ২টো বেজে ৬ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালন ও ডিফিব্রিলেটারের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের ফিব্রিলেশন বন্ধ করতেই ফিরে এল হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ। রক্তের চাপ তখন ১০০ মিলিমিটার ও শরীরের তাপ ২০° ডিগ্রী। পুনরুজ্জীবন শুরু করার পর তখন মাত্র সাড়ে পাঁচ মিনিট পার হয়েছে।

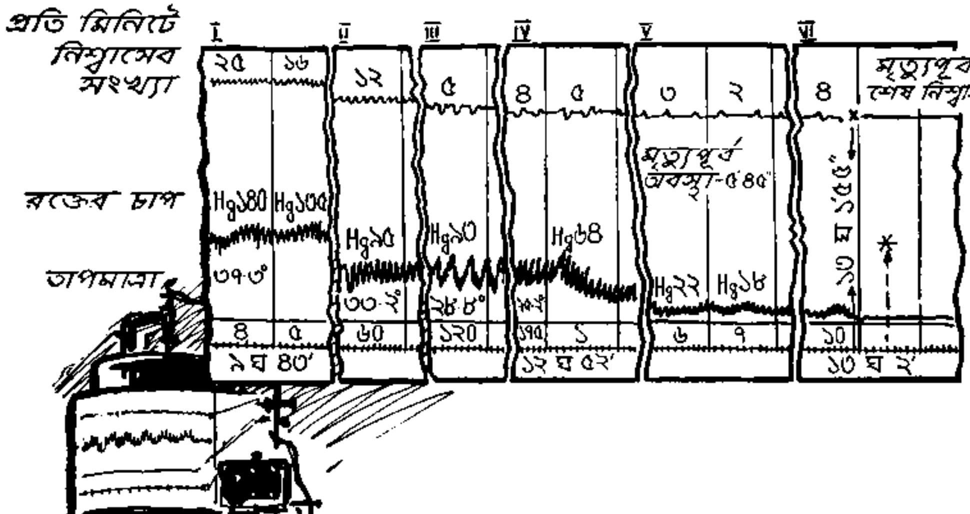

দ্বপ্বর ২টো বেজে ৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। তার দেহের তাপমাত্রা বাড়াতে শ্বর্ব করা হল। কুকুরটিকে গরম জলের বাথটবে শোয়ানো হল, জলের উত্তাপ ৪৫° ডিগ্রী। প্বনর্ব্জ্জীবন শ্বর্ব করার পর তখন সাড়ে সাত মিনিট পার হয়েছে।

দ্বপ্বর ২টো বেজে ৩৭ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। দেখা দিল প্রথম অগভীর স্বতঃপ্রবৃত্ত নিশ্বাস। পশ্বটির শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে তখন দাঁড়িয়েছে ২২° ডিগ্রীতে রক্তের চাপ ১৫৪ মিলিমিটার। প্বনর্ব্জ্জীবন শ্বর্ব করার পর তখন পার হয়েছে মাত্র ৩৬ মিনিট।

দ্বপ্বর ২টো বেজে ৫৪ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। কর্নিয়ার রিফ্লেক্স দেখা দিল। শরীরের উত্তাপ ২৫° ডিগ্রী, তখনও নিজে নিজে শ্বাস নেওয়া চলছিল, তবে তা অনেকক্ষণ পর পর মিনিটে দ্ববার মাত্র। সাময়িকভাবে কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনা বন্ধ করা হল।

দ্বপ্বর ২টো বেজে ৫৫ মিনিট। স্পাইন্যাল রিফ্লেক্স ফিরে এল। পায়েতে ব্যথার স্টিম্বলাস দিলে কুকুরটি সামান্য একটু পা নড়ায় মাত্র। প্বনর্ব্জ্জীবন শ্বর্ব করার পর তখন পার হয়েছে ৫৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড।

দ্বপ্বর ৩টে বেজে ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড। স্বতঃপ্রবৃত্ত নিশ্বাস নেওয়া তখনও অনেকক্ষণ পর পর চলছে — মিনিটে মাত্র দ্ববার; জিব ও মিউকাস মেম্ব্রেন (mucous membrane) তখনও নীল, রক্তের চাপ ১২৬ মিলিমিটার, নতুন করে আবার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ চালান শ্বর্ব করা হল। প্বনর্ব্জ্জীবন শ্বর্ব করার পর তখন ৭২ মিনিট পার হয়েছে।

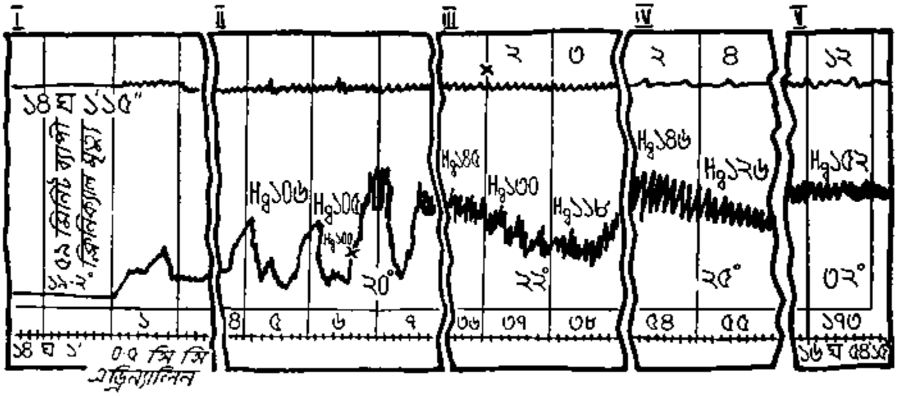

দ্বপ্বর ৩টে বেজে ৫৬ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। উত্তাপ দেওয়া বন্ধ করে কুকুরটিকে গরম জলের বাথটব থেকে তোলা হল।

দ্বপ্বর ৪টে বেজে ৩৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। রক্তের চাপ ১৫০ মিলিমিটার, দেহের তাপ বাড়ছে ৩২° ডিগ্রী। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ চালান বন্ধ করা হল।

দুপুর ৪টে বেজে ৫৪ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড। রক্তের চাপ ১৫২ মিলিমিটার, স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্বাস নিচ্ছে কুকুরটি মিনিটে ১২ বার, দেহের তাপ ৩২° ডিগ্রী। পুনরুজ্জীবন শুরু করার পর তখন পার হয়েছে ১৭২ মিনিট। কুকুরটিকে তখন ২০০ হাজার ইউনিট পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন করা হল। পুনরুজ্জীবন শুরু করার ৭ ঘণ্টা পর কুকুরটির দেহের তাপ স্বাভাবিক হল, অর্থাৎ ৩৮° ডিগ্রী। ১৭ ঘণ্টা পর ফিরে এল শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি। এই সময় প্লেটেতে মুখ লাগিয়ে দেওয়ার পর কুকুরটি প্রথম গিলে খেতে পারল তরল খাবার জিনিস। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে কুকুরটির চলার শক্তি ফিরে এল। ৬ দিনের দিন কুকুরটি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠল।

পশুদের উপর হাইপোথার্মির সাহায্যে জীবনী শক্তি পুনরুজ্জীবনের যে সমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে তার থেকে এই ধারণা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে হাসপাতালে অপারেশন করার সময় রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রক্তপ্রবাহ থেমে গেলে, কৃত্রিম উপায়ে সেই রোগীর দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে শুধু ৫—৬ মিনিট নয় মৃত্যুর পর আরও ঢের বেশী সময় পার হয়ে গেলেও তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে।

জীবন পুনরুজ্জীবিত করার সমস্যা বিকাশের পথ

বর্তমানে দেহের জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তাকে পুনরুদ্ধারের সম্বন্ধে এমন কতগুলি মূল তত্ত্ব জানা গেছে যা আমাদের দেহের এই সমস্ত প্রক্রিয়া বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু তাহলেও সমস্যাটি এত গভীর ও এতই জটিল যে সত্যি কথা বলতে গেলে এর সমাধানের পথে আমরা এখনও বেশী দূর এগুতে পারিনি।

তবে একটা জিনিস এর থেকে পরিষ্কার হয়েছে, সে হল এই যে এই সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হল এক্সপেরিমেণ্ট ও ক্লিনিকের মাধ্যমে সমস্যাটিকে ভাল করে অধ্যয়ন করা। যত গভীরভাবে আমরা জীবনী শক্তি নিভে যাওয়া ও তাকে পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে পারব ততই সাফল্যের সঙ্গে আমরা অকাল মৃত্যু ও 'উপযুক্ত কারণবিহীন' মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হব।

উপরে আমরা কৃত্রিম হাইপোথার্মির প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি ও দেখিয়েছি ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কতখানি সাফল্য লাভ করা গেছে। আমাদের এখনও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে বিভিন্ন ওষুধ কী করে মানুষের মধ্যে শীতকালীন ঘুম বা সমাধির মতো অবস্থা সৃষ্টি করে, অথচ মানুষের কেন্দ্রীয় ও পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে তাতে এমন কোন গভীর অবসন্নতা আসে না, যা এলে পর তার পুনরুজ্জীবন ব্যাহত হয় বা পুনরুজ্জীবন একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একটা খুবই বড় কাজ করা হবে যদি আমরা এই সব ওষুধের

সাহায্যে মরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটির উপর বাধা সৃষ্টি করে ঐ পর্যায়টিকে অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর্যায়টিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারি। কেননা হাতে তাহলে অনেক সময় পাওয়া যাবে যার মধ্যে পুনরুজ্জীবনের দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে মানুষের জীবনী শক্তি পুরোপুরি ও পাকাপাকিভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আমরা এখন মানুষের মধ্যে ওষুধ দিয়ে এমন গভীর ঘুম সৃষ্টি করতে পারি যার পর সে মানুষটি জীবিত আছে কিনা বলা অসম্ভব। এর গুরুত্ব এই যে এর ফলে সে তার জীবনের সবচেয়ে ভীষণ বিপজ্জনক মুহূর্তে অনায়াসে পার হয়ে যায়।

বৈদ্যুতিক স্টিমুলেশন ব্যবহার করে বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের কাজ ফিরিয়ে আনার প্রশ্নটি কমই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সে দিক থেকেও এখনও আমাদের আরও বহু পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। এতে ভাল ফল পাওয়ার আশা আছে।

মৃত্যুর সময় বা পুনরুজ্জীবনের গোড়ার দিকে ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া টিস্যুতে অক্সিডেশন প্রক্রিয়া আবার কী ভাবে জোরদার করা যায় সে প্রশ্নেরও এখনও পর্যন্ত তেমন কোন সমাধান পাওয়া যায়নি।

কোন সন্দেহ নেই যে হার্ট ম্যাসাজ, আর্টারিতে উচ্চ চাপে রক্ত পরিসঞ্চালন, ডিফিব্রিলেশন ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসের কাজ চালিয়েই পরবর্তীকালে ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর পর্যায়ে চিকিৎসা চলবে।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বৈজ্ঞানিক ব্রাউন-সেক্কার যখন পশুর ছিন্ন মস্তক পুনরুদ্ধারের এক্সপেরিমেণ্ট করেন তিনি তখন সাধারণ সিরিঞ্জের সাহায্যে মস্তিষ্কে যাওয়ার আর্টারিতে রক্ত পরিসঞ্চালন করেন। পশুটির মস্তিষ্ক থেকে ভেন দিয়ে সেই রক্ত আপনা থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। ভেন থেকে সেই রক্ত আবার সংগ্রহ করে জমা করার মত তার কোন যন্ত্র ছিল না। তারপর মাথায় আসে হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমন যন্ত্র তৈরীর ধারণা, যার সাহায্যে কোন অঙ্গে রক্ত পরিসঞ্চালন করে অনায়াসে আবার সে রক্ত টেনে নেওয়া যায়। এইভাবেই ১৮৬৮ সালে তৈরী হয় লুদভিগ ও স্মিতের যন্ত্র, ১৮৮৫ সালে ফ্রেইস ও হুবের্গের যন্ত্র, ১৮৯৫ সালে ইয়াকবির যন্ত্র ও ১৯০৩ সালে ব্রডির যন্ত্র।

স্তন্যপায়ী পশুর হৃৎপিণ্ডের কাজ পরীক্ষা করবার জন্যই ১৯২৮ সালে তৈরী হয় দেল শুস্তারের যন্ত্র। ঐ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের স. স. ব্রুখোনেঙ্কো এক যন্ত্র তৈরী করেন যার নাম দেওয়া হয় অটোজেক্টর। এই সমস্ত যন্ত্রের গঠন বিভিন্ন প্রকৃতির হলেও কাজের পদ্ধতি এদের সকলেরই এক। পাম্প, রবারের বেলুন বা মেম্ব্রেনের সাহায্যে এরা কৃত্রিম রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কোন বিশেষ অঙ্গে এরা রক্ত ঠেলে দেয় ও তারপর সেখান থেকেই আবার সে রক্ত শোষণ করে নেয়।

এই রকম আধুনিক যে সব যন্ত্র বেরিয়েছে তাদের বলা হয় পার্ফিউশন যন্ত্র বা 'কৃত্রিম ফুসফুস যুক্ত হৃৎপিণ্ড'। আগেকার যন্ত্রগুলির তুলনায় টেকনিকের দিক থেকে এ যন্ত্রগুলি অনেক উন্নত। শুধু রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করাই এই জটিল যন্ত্রগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। রক্তকে অক্সিজেন স্যাচুরেট করাও এর আর এক বড় কাজ। এতে যন্ত্রের মধ্যে রক্ত নষ্ট হয় না। এই রকম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রাণী দেহে, প্রায় তার আসল হৃৎপিণ্ডের মতই রক্তপ্রবাহের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

এই রকম আধুনিক যন্ত্রের মধ্যে ফরাসী দেশের টম ও বদউইনের যন্ত্র এবং মেলরোজ ও হিবনের যন্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন হল মস্কোর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এই রকম এক প্রকারের অটোমেটিক ইলেকট্রো-নিউম্যাটিক যন্ত্র বেরিয়েছে।

আধুনিক পার্ফিউশন যন্ত্র প্রধানত হৃৎপিণ্ডের অপারেশনের সময়েতেই ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে সার্জেন কিছুক্ষণের জন্য রোগীর নিজস্ব হৃৎপিণ্ডকে রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উপর অপারেশন চালিয়ে যেতে পারেন। আসল হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে পাম্প যুক্ত পার্ফিউশন যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে প্রতি মিনিটে সেই যন্ত্রের সাহায্যে ঠেলে দেওয়া রক্তের পরিমাণ আসল হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক আউটপুটের সমপরিমাণ হওয়া দরকার, যাতে করে রক্তের শিরায় সেই রক্তের চাপ ও উত্তাপ তার পূর্ববর্তী মাত্রা বজায় রাখে (হৃৎপিণ্ড কর্তৃক প্রতি মিনিটে ঠেলে দেওয়া রক্তের পরিমাণকে কার্ডিয়াক আউটপুট বলে)। সে পাম্পকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে হৃৎপিণ্ডের আসল রিথম (rhythm) বা ছন্দগতি বজায় থাকে। দেখা গেছে যে ঐ রকম যন্ত্রের সাহায্যে এই সবই সম্পাদন করা সম্ভব।

সবচেয়ে কঠিন কাজ যেটা, যার এখনও পুরোপুরি সমাধান হয়নি, সে হল যন্ত্রের সাহায্যে রক্তকে অক্সিজেন স্যাচুরেট করা। অর্থাৎ পার্ফিউশন যন্ত্রের যে অংশকে অক্সিজেনেটার বলে সে অংশ এখনও সেরকম ভাল তৈরী হয়নি।

ইয়ংব্রেড নামে আজকাল পার্ফিউশন যন্ত্রের এক নতুন মডেল বেরিয়েছে। সে যন্ত্রটিকে অবশ্য সবচেয়ে উন্নত মডেল বলা যায় না। মোটামুটিভাবে যন্ত্রটির কাজের পদ্ধতি এই রকম: রোগীর ভেন থেকে যন্ত্রের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে রবার টিউবের মাধ্যমে ছয়টি আঙ্গুলাকৃতি পাম্পের সাহায্যে; রক্ত চলার পথে সেই রবার টিউবগুলির মধ্যে কমপ্রেসার থেকে হাওয়া প্রবেশ করে, যন্ত্র মুখী রক্তের গতি চালিত করে পাম্পের ভিতরকার দুটি ভাল্‌ভ; পাম্পগুলির ঠিক অগ্রভাগে থাকে একটি মিটার (রোটামিটার) যার সাহায্যে নির্ণয় করা হয় মিনিটে কত রক্ত রোগীর দেহ থেকে যন্ত্রে এসে পড়ছে। পাম্পগুলি থেকে সরাসরি রক্ত চলে যায় ছয়টা অক্সিজেনেটারে। অক্সিজেনেটারগুলি কতগুলি প্লাস্টিকের স্পাইরাল টিউব দিয়ে তৈরী, যাতে অক্সিজেন প্রবেশ করানর ব্যবস্থা আছে। অক্সিজেনেটারগুলি সবসময় বেগে ঘুরছে, তাই রক্ত যখন টিউবগুলির দেয়াল বেয়ে তাতে প্রবেশ করে তখন তাতে রক্তের একটা পাতলা লেয়ার

(layer) তৈরী হয় এই রকম পাতলা লেয়ার তৈরী হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা এতে করে একদিকে যেমন রক্তের যতদূর সম্ভব পুরো অক্সিজেন স্যাচুরেশন সম্ভব হয়, তেমনি রক্ত থেকে সহজে বেরিয়ে যায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড। অক্সিজেনেটেড রক্ত তারপর জমা হয় একটি পাত্রে ও সেখান থেকে সেই রক্ত আবার কতগুলি পাম্পের সাহায্যে রবার টিউবের মাধ্যমে ফিরে আসে রোগীর দেহে, কিন্তু এবারে রোগীর আর্টারির মধ্য দিয়ে। তাই রক্ত চলার পথে টিউবগুলির মধ্যে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করা হয়, যে চাপ টোনমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। শরীরে প্রবেশ করা রক্তে উপযুক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করার জন্য ঐ যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটি অটোমেটিক হিট রেগুলেটিং ইলেকট্রিক হিটার।

ঐ পার্ফিউশন যন্ত্রের সাহায্যে দেহে স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ অক্সিজেন স্যাচুরেটেড রক্ত দেওয়া সম্ভব হয়; অর্থাৎ মিনিটে প্রায় ৪ থেকে সাড়ে চার লিটার। পশুদের উপর এক্সপেরিমেন্টে ঐ যন্ত্র ব্যবহার করে যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া গেছে।

১৯২৮ সালেই স. স. ব্রুখোনেঙ্কো বলেন যে কৃত্রিম রক্তপ্রবাহ ব্যবহার করে শুধু যে কোন এক বিশেষ অঙ্গের রক্তপ্রবাহই সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় তা নয়, পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সমস্ত শরীরে এর দ্বারা রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়।

স. স. ব্রুখোনেঙ্কো এবং স. ই. চেচুলিন ঐ সময় হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখান যে রক্ত ক্ষয় করে পশুকে মেরে তারপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় যদি সেই উদ্দেশ্যে পার্ফিউশন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এও দেখাতে সক্ষম হন যে রক্তক্ষয় জনিত মৃত্যুর পর ১০ মিনিট ধরে ক্লিনিক্যাল মৃত্যু চলার পরও পশুকে পার্ফিউশন যন্ত্র ব্যবহার করে বাঁচানো যায়।

পুনরুজ্জীবনের জন্য এই রকম যন্ত্র ব্যবহার করে সুফল পেয়ে শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্রের সমর্থক দল এমন কথাও বলতে শুরু করেন যার সঙ্গে কিছুতেই একমত হওয়া যায় না। তাঁরা বলতে শুরু করেন যে পার্ফিউশন যন্ত্র উন্নত করতে করতে এমন যন্ত্র তৈরী হবে যার দ্বারা ক্লিনিক্যাল মৃত্যুর অনেক পরেও মানুষ ও পশুকে বাঁচান সম্ভব হবে। তাঁরা অবশ্য অনেক পরে বলতে কয়েক মিনিট নয় কয়েক ঘণ্টার কথাই বোঝাতে চাইতেন। পুনরুজ্জীবনের কথা বলতে তাঁরা মরে যাচ্ছে এমন দেহের পুনরুজ্জীবনের কথা বোঝাতেন না; মরে গেছে এমন দেহের পুনরুজ্জীবনের কথাই বলতেন।

মরা মানুষ বাঁচানো যে বস্তুবাদ সম্মত কথা নয়, একথা প্রমাণ করবার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? মৃতকে যে বাঁচানো যায় না, একথা প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদের পিতা ডেমক্রিট নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। যে সব বিজ্ঞানীরা বলেন, 'মরা মানুষ বাঁচান যায়', তাঁরা সে কথা বলেন এই ভিত্তিতে যে মরা মানুষ বাঁচাবার চেষ্টা করে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের হৃৎপিণ্ড চালু করতে সমর্থ হন। এমন ঘটনাও আমাদের জানা আছে যাতে মৃতের দেহে শ্বাস

নেওয়ার আভাস পাওয়া যায়; একজনের ত এমনকি কর্নিয়ার সংকোচনও পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও এর সঙ্গে গোটা দেহের পুনরুজ্জীবনের সম্বন্ধটা কোথায়? সকলেই জানে যে মৃতের দেহ থেকে কেটে নেওয়া হৃৎপিণ্ডে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেও সংকোচন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এমনও দেখা গেছে যে ব্রেন স্টেমের যেখানে রেস্পিরেটারি কোষ থাকে সেখানে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পরও জীবিত কোষ রয়েছে। নবজাত শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর এমনকি আড়াই ঘণ্টা পরেও এইরকম জীবিত কোষ দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত মেলেনি যেখানে মৃত্যুর ৫ থেকে ৬ মিনিট পার হয়ে যাওয়ার পর মানুষের মস্তিষ্ক কর্টেক্স পুনরুজ্জীবিত করে তার কাজ পুরোপুরিভাবে ফেরান গেছে। পুনরুজ্জীবন বলতে আমরা বুঝি গোটা দেহের সমস্ত কাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কাজেই মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর হৃৎপিণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করা গেলেও এর থেকে বলা যায় না যে গোটা দেহের পুনরুজ্জীবনের সমস্যা মিটেছে।

এই সমস্যার প্রতি আমাদের আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুনো দরকার। আমরা যখন জানি যে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবেশে মানুষের মস্তিষ্ক, মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মিনিট বাঁচে এবং তারপর তাতে শুরু হয় অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন, তখন সেই সময় কালের মধ্যেই আমাদের পার্ফিউশন যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। এর জন্যে আগে থেকেই পার্ফিউশন যন্ত্রকে রক্তে পরিপূর্ণ করে তৈরী রাখা দরকার যে রোগীর উপর অপারেশন হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হলে, যাতে সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্র কাজে লাগান যায়; তার জন্য রোগীর রক্তের শিরা আগে থেকে কেটে বের করে রাখা দরকার; অর্থাৎ দেখা দরকার সব যেন আগে থেকে তৈরী থাকে।

দেহ পুনরুজ্জীবনের সমস্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অসম্ভব রকমের কঠিন সমস্যা। ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানে সাফল্য আশা করা যায় কঠোর পরিশ্রম করে এবিষয়ে হাজার হাজার এক্সপেরিমেণ্ট করবার পর। যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কাজ করছেন তাঁদের এখনও এই মানবতাপূর্ণ কর্তব্যটি পালন করতে অনেক পরিশ্রম করে যেতে হবে। মৃত্যুর পর রোগীর জীবন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় সে রোগীর হৃৎপিণ্ডের প্রথম সংকোচন, প্রথম নিশ্বাস ও তার মুখ নিসৃত প্রথম শব্দ বিজ্ঞানীর পক্ষে এত বড় পুরস্কার যে তার কোন তুলনা হয় না— তাই নয় কি!

ভ. প. দেমিখভ
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্যান্ডিডেট

দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড

ভাবুন তো একবার, সার্জেনরা যদি রোগগ্রস্ত বা একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশের জায়গায় নতুন সুস্থ দেহাংশ এনে বসিয়ে দিতে পারতেন তাহলে মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাকে বাঁচান বা তার জীবন দীর্ঘায়ু করার কতই না নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে যেত!

একের দেহ থেকে অন্যের দেহে দেহাংশ স্থানান্তরিত করা কি সম্ভব? দেখা গেছে যে গাছ গাছড়া বা নিম্ন স্তরের জন্তুদের মধ্যে অনায়াসে দেহাংশ চালান করা যায়। গাছপালার ক্ষেত্রে কলম করা বা এক গাছের অংশ অন্য গাছে জুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ আজ বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং তার ব্যবহারিক গুরুত্বও যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত বাগান করা সম্বন্ধে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যাকিছু প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রায় ১৫০ রকমে কলম করার উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

ই. ভ. মিচুরিন নতুন জাতের ফলের গাছ সৃষ্টি করতে গিয়ে বিভিন্ন গাছের সংযোগে কলম তৈরী করার পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। তা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন যে চালান করা গাছের অংশটি, যে গাছের সাথে তাকে যোগ করা হয়, সেই গোটা গাছটির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একটি পাতিলেবু গাছের ডালের সাথে পিয়ার্সের চারা গাছের ডাল যুক্ত করে এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেন। রং বদল করে পিয়ার্সের পাতাগুলি খানিকটা কালচে রং ধারণ করল, পাতাগুলি পুরু হয়ে উঠল ও তাতে গালিচা ভাব দেখা দিল। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে হেমন্তে সেই নতুন চারা গাছের পাতা আর ঝরে পড়ল না, বছরের পর বছর ধরে লেবুপাতার মতই নির্ঝর ও সজীব হয়ে রইল। আইভা ও পাতিলেবুর সংযোগে কলম করেও ই. ভ. মিচুরিন একই ফল পেলেন।

দুই জীবিত দেহের সংযোগে সংযুক্ত দেহের এক অংশ যে অন্য সংযুক্ত অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এটা শুধু গাছপালারই বিশেষত্ব নয় প্রাণী জগতেও তা পরিলক্ষিত হয়। নীচে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

নিম্ন স্তরের প্রাণী দেহের সংযোগ ও তাদের দেহাংশ পরিরোপণ

মেরুদন্ড বিহীন নিম্ন স্তরের জীবদের ক্ষেত্রেও সহজেই দেহ সংযোগ ও দেহাংশ বিনিময় করা সম্ভব। সোভিয়েত বিজ্ঞানী ড. ইসায়েভ অসংখ্য এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়েছেন যে পাকযন্ত্রযুক্ত নিম্ন স্তরের জীব, হাইড্রাদের মধ্যে বিনা বাধায় দেহ সংযোগ বা দেহাংশ বিনিময় করানো যায়। তিনি দুটি হাইড্রা নিয়ে লম্বালম্বিভাবে গোটা সামনের দিকটা কেটে বই-এর পাতার মতো খুলে ফেলে সে দুটিকে পিন দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুটো হাইড্রা জুড়ে এক হয়ে যায়। ইসায়েভ লিখেছেন যে 'প্রথমে কিছু সময়ের জন্য দুটোর প্রত্যেকটিই কিছু পরিমাণ আত্মসত্তা বজায় রাখে। সেট্য বোঝা যায় এই থেকে যে তাদের শরীরের শুঁড়গুলি তখনও স্বাধীনভাবে সংকুচিত হতে থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যে সম্ভবত যখন দুই অর্ধেক এক হয়ে পুরোপুরি জুড়ে যায় ও তাদের নার্ভের সংযোগ ঘটে তখন দুই অর্ধেকের শরীরের শুঁড়গুলিকে একত্রে একইভাবে আন্দোলিত হতে দেখা যায়। সাধারণত তখন সংযুক্ত হাইড্রা ও স্বাভাবিক হাইড্রার মধ্যে কোন পার্থক্যই আর পরিলক্ষিত হয় না। একটি মাত্র পার্থক্য থেকে যায় — সে হল সংযুক্ত হাইড্রাটি আকারে বড়। খাদ্য আহরণ করা, গেলা, হজম করা, আঘাতের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া, সিষ্ট (cyst) অবস্থা ধারণ করা, ডিম পাড়া সমস্তই তার আগের মতই চলতে থাকে। মনে হয় ওটা যেন একটা হাইড্রা দুই হাইড্রার যোগ ফল নয়।'

ড. ইসায়েভ এমনি করেই বিভিন্ন গায়ের রঙ যুক্ত দুই ভিন্ন জাতের হাইড্রাকে সংযুক্ত করে তার থেকে বিভিন্ন রঙের শিশু হাইড্রা প্রজনন করাতে সমর্থ হন।

কেঁচোদেরও অতি সহজেই সংযুক্ত করা সম্ভব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী করসেল্ট বিভিন্ন কেঁচোর বিভিন্ন অংশ কেটে নিয়ে একত্র জুড়ে এক জীবন্ত নতুন কেঁচো সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। সেই কেঁচোটি তার স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

ঠাণ্ডারক্তি প্রাণীর দেহাংশ ও টিস্যু পরিরোপণ

আজ পর্যন্ত বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উভয়চর (একাধারে ভূচর ও জলচর) প্রাণী নিয়ে প্রচুর এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়েছে। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত গবেষণার পর বর্ন দেখাতে সমর্থ হন যে বেঙ ও কোলা বেঙ জাতীয় প্রাণীর ভ্রূণের বিভিন্ন অংশ একত্রে সংযুক্ত করে তাই থেকে বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষমতা যুক্ত একটা গোটা প্রাণীর জন্ম দেওয়া যায়। বর্ন আধখানা বেঙের ভ্রূণের সঙ্গে আধখানা কোলা বেঙের ভ্রূণ সংযুক্ত করে সৃষ্টি করেন এক নতুন প্রাণী যার এক অর্ধেক এক প্রাণীর অন্য অর্ধেক অন্য প্রাণীর।

দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত উভয়চর প্রাণীর লার্ভার পা গজানর অঙ্কুর কেটে নিয়ে অন্য প্রাণীর দেহে বসিয়ে দেওয়ার অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। দেখা গেছে যে রোপণ করা ঐ অংশ থেকে তাদের স্বাভাবিক নতুন পা গজায় ও কিছু পরে তাতে নার্ভের আবির্ভাব হয়। অঙ্কুরটিকে যদি সামনের পায়ের অঙ্কুরের জায়গায় বসান হয় ত তার থেকে জন্মায় অতিরিক্ত সামনের পা। চলবার সময় প্রাণীটির নিজস্ব পায়ের তালে তাল রেখেই সেই অতিরিক্ত পা সামনের দিকে এগুতে থাকে। পিছনের পায়ের জায়গায় অঙ্কুরটি বসিয়ে, তাতেও একই রকম ফল পাওয়া গেছে, জন্মেছে অতিরিক্ত পিছনের পা।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নানা পরীক্ষার পর ব. দ. মরোজভ এক ব্যাঙাচির হৃৎপিন্ড কেটে নিয়ে অন্য ব্যাঙাচির পেটের মাংসপেশীর মধ্যে তা পরিরোপণ করতে সমর্থ হন। পরিরোপিত হৃৎপিন্ডটি প্রাণশক্তি বজায় রাখে, স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে তার ধুকধুকানি।

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত গবেষণার পর কোপেনহেভের বিভিন্ন জাতের ব্যাঙাচির মধ্যে একের হৃৎপিন্ড অপরে পরিরোপণ করেন। প্রাপ্ত বয়সে বেঙ হয়ে ব্যাঙাচিগুলির কোনটি হয় আকারে ছোট কোনটি বড়। আশ্রয়দাতার শরীরের আকার অনুযায়ী পরিরোপিত হৃৎপিন্ডগুলিও যথোপযুক্ত পরিমাপ গ্রহণ করে।

১৯৪১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ন. প. সিনিৎসিন তাঁর এক চমকপ্রদ এক্সপেরিমেণ্টের বিবরণ প্রকাশ করেন। অভিনব উপায়ে অপারেশন করে তিনি এক ব্যাঙ থেকে নেওয়া হৃৎপিন্ড অন্য ব্যাঙের দেহে পরিরোপণ করেন, হৃৎপিন্ডটি নতুন আশ্রয়দাতার দেহে বহুদিন ধরে বেঁচে থাকে। তিন মাস পর পরিরোপিত হৃৎপিন্ডটির গায়ে নার্ভ জন্মায় ও আশ্রয়দাতার দেহের নার্ভের নিয়ন্ত্রণ অনুসারেই তালে তালে চলতে থাকে সেই হৃৎপিন্ডের ধুকধুকি।

উচ্চস্তরের প্রাণী ও মানবদেহে দেহাঙ্গ পরিরোপণ

একজনের চামড়া অন্যের শরীরে পরিরোপণের প্রচেষ্টা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল, কিন্তু আগেকার চিকিৎসার অনুন্নত অবস্থায় সে সব প্রচেষ্টায় সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। ইনফেকশন রোধ করার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে অবধারিতভাবে ক্ষতের গায়ে ইনফেকশন পড়ে ঘা হয়ে ক্ষত পেকে উঠত ও তাতে পরিরোপিত চামড়াটি আলগা হয়ে মরে যেত। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের আবিষ্কারের পরই প্রথম জানা গেল যে এমন সব বীজাণু আছে যা ঘায়ের উপর পড়লে ঘা পেকে ওঠে।

১৭৪২ সালে প্যারিসের চিকিৎসা বিভাগ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রখ্যাত ইতালীয় সার্জেন তালিইয়াকোচি প্রবর্তিত চামড়া পরিরোপণের অপারেশন যেন আর করা না

হয়। কারণ, ধারণা জন্মেছিল যে, যার শরীর থেকে চামড়া কেটে নেওয়া হয় তার যদি মৃত্যু হয় ত পরিরোপিত চামড়ার খণ্ডটিও মরে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করাও প্রসার লাভ করতে থাকে। সার্জেনরা চামড়া পরিরোপণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে একই ব্যক্তির শরীরের এক অঙ্গের উপরকার চামড়া অন্যত্র ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করলে সেখানে চামড়া অনেক সহজে জুড়ে যায়, কিন্তু অন্য লোকের শরীর থেকে চামড়া সংগ্রহ করলে তেমন ফল পাওয়া যায় না।

এক ব্যক্তির রক্ত অন্য ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালনের প্রচেষ্টাও প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। রক্ত মানে কী? রক্ত হল দেহের তরল টিস্যু যা অন্য টিস্যুর মধ্যে প্রবাহিত হয়। তাতে থাকে রক্তের লোহিত ও শ্বেত কণিকা, প্রোটীন ও অন্যান্য পদার্থ যা দিয়ে মানুষের দেহ তৈরী হয়। রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রচেষ্টাও প্রথম প্রথম তেমন সফল হয়নি। তার কারণ, রক্ত ট্রান্সফিউশন সুরু করার কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এমন সাঙ্ঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিত যে তাতে করে এক এক সময় মানুষ মরেও যেত। গত শতকের শেষে ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রথম জানা যায় যে রক্তের চরিত্র হিসাবে সমস্ত মানুষকে চারটি দল বা গ্রুপে ভাগ করা যায়। রক্তের এই গ্রুপগত চরিত্রকে হিসেবের মধ্যে ধরে তারপর যদি রক্ত ট্রান্সফিউশন করা যায় তাহলে তাতে কখনই কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম রক্ত পরিসঞ্চালন করেন বর্তমানে সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর পূর্ণ সদস্য, ভ. ন. শামভ।

১৯২০—১৯২১ সালেই ভ. ন. শামভ ও ন. ন. ইয়েলানস্কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে মানুষের চামড়া পরিরোপণ অপারেশন অনেক সহজ ও সফল হতে পারে যদি তাতে ডোনার (যে চামড়া দেবে) ও রিসিপিয়েণ্টকে (যার শরীরে চামড়া পরিরোপণ করা হবে) রক্তের গ্রুপ হিসাবে বাছাই করা হয়। যদিও এই নিয়মের কার্যকারণ সম্বন্ধটি এখনও পর্যন্ত সে রকম গভীরভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা যায়নি তাহলেও কার্যত দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে সফলভাবে টিস্যু বা দেহাংশ পরিরোপণ করতে হলে এই নিয়মটি মানা খুবই প্রয়োজন। নীতির দিক থেকে নিয়মটা যে সঠিক তা যথেষ্ট ভালভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। কয়েক বছর হল সোভিয়েত ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে প্রমাণ হয়ে গেছে যে শুধু রক্তই নয় মানুষের অন্যান্য টিস্যুকেও চরিত্রগতভাবে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা যায় এবং রক্তের গ্রুপ বিভাগ ও টিস্যুর গ্রুপ বিভাগ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। টিস্যুর গ্রুপ সম্বন্ধীয় গবেষণায় সোভিয়েত বিজ্ঞানী ই. ল. ক্রিচেভস্কি, ন. ন. জুকভ-ভেরেজনিকভ, প. ন. কসিয়াকভ, জ. ই. রভ্‌নভা প্রভৃতি প্রচুর অবদান করেছেন।

কয়েক বছর হল জন্তুদের মধ্যে চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন বিষয়ে বহু বিচিত্র গবেষণা হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ম. ই. ইয়েফিমভ ও ত. ভ. মুসিনা ধেড়ে ইঁদুরের গায়ে চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করে

বড় সাফল্য অর্জন করেন। অন্য ইঁদুর থেকে নেওয়া পরিরোপিত চামড়া রোপণের ১৬ মাস পরেও তা নষ্ট হয়নি, চমৎকারভাবে তা জুড়ে গিয়েছিল আশ্রয়দাতার গায়ে।

১৯৫৪ সালে বিদেশী বিজ্ঞানী শেফার—নেংটি ইঁদুর ও ধেড়ে ইঁদুরের গায়ে চামড়া পরিরোপণের কয়েকটি অতি চমৎকার এক্সপেরিমেণ্টের বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি দেখান যে যদি একই লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক জীবের মধ্যে চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা হয় ত ৮% ক্ষেত্রে চামড়া ভালভাবে জুড়ে যায়; আর যদি একই বয়সের ও একই পরিবারে একসঙ্গে জন্ম গ্রহণ করা জন্তুদের মধ্যে চামড়া পরিরোপণ করা হয় ত ভাল ফল পাওয়া যায় ১৪% ক্ষেত্রে। প্রত্যেক প্রাণী দেহের যে নিজস্ব বিশেষত্ব তার জন্য নাকি দায়ী হরমোন। (হরমোন হল একপ্রকারের জোরাল রাসায়নিক বস্তু, দেহের বিভিন্ন এণ্ডোক্রীন গ্ল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ রস।) শেফার এই ধারণা থেকেই চামড়া ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের উপর যৌন হরমোনের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার এক সিরিজে তিনি সদ্য জাত ধেড়ে ইঁদুরের পুরুষ বাচ্চা নিয়ে ক্যাস্ট্রেট করে তার তিন মাসের মধ্যে তাদের গায়ে চামড়া পরিরোপণ করে দেখেন যে ৪২% ক্ষেত্রে চামড়া জুড়ে যাচ্ছে। যাদের ক্যাস্ট্রেট করা হয়নি তাদের মধ্যে চামড়া পরিরোপণ করে তিনি সুফল পান মাত্র ১৪% ক্ষেত্রে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর এক্সপেরিমেণ্টাল বায়োলজি ইনস্টিটিউটের ইয়ে. আ. জতিকভ ১৯৫৯ সালে ধেড়ে ইঁদুরের গায়ে চামড়া পরিরোপণের ফলাফল সম্বন্ধে একটি অতি উপভোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি এক্সপেরিমেণ্ট করেন দুই সিরিজে। প্রথম সিরিজে এক ধেড়ে ইঁদুর থেকে অন্য ধেড়ে ইঁদুরের গায়ে তিনি শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ার টুকরো পরিরোপণের চেষ্টা করেন। সে সিরিজে তিনি একবারের জন্যও চামড়া জোড়া লাগাতে পারেননি। প্রত্যেক বার চামড়া শেষ পর্যন্ত ঝরে গেছে। অন্য সিরিজে ঠিক তার উল্টো। বড় বড় চামড়ার ছিলা পরিরোপণ করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি দেখেন যে তা জুড়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, এখানেই বলে রাখা দরকার যে পুরো অঙ্গ বা পুরো একটা দেহাংশ পরিরোপণের ব্যাপারে উপরোক্ত ঘটনাটির যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে।

সোভিয়েত অনুসন্ধানী ই. স. কগান ৩০ বার খরগোসের গায়ে ফাসা (fascia) পরিরোপণ করে (ফাসা—মাংসপেশীর আবরণী) ৬ মাস পর্যন্ত ঐসব খরগোসগুলিকে নজরে রাখেন। ৩০ বারের মধ্যে ১৭ বার তিনি সুফল পান, অর্থাৎ পরিরোপিত ফাসা শক্ত হয়ে জুড়ে যায়। তিনি লিখেছেন যে 'যদি হোমপ্লাস্টিক (একই উপজাত ভুক্ত বিভিন্ন জন্তুর দেহে) ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন করা হয় ত খুবই বড় পার্সেণ্ট ক্ষেত্রে সেই পরিরোপিত ফাসা সম্পূর্ণ জুড়ে যায়'।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত বিশ্বে অনেকেই আজ শুনেছেন আকাদেমিশিয়ন ফিলাতভ প্রবর্তিত মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া নিয়ে রোগীর চোখে কর্নিয়াল গ্রাফ্ট অপারেশনের কথা। বিখ্যাত

বিজ্ঞানী ফিলাতভ ও তাঁর শিষ্যেরা মৃতের কর্নিয়া নিয়ে সফলভাবে কর্নিয়াল গ্রাফ্ট করে আজ পর্যন্ত কয়েক হাজার অন্ধকে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের দেহে মৃত দেহের উপাস্থি পরিরোপণ করলে তাও অপেক্ষাকৃত সহজেই জুড়ে যায়। ত. প. ভিনোগ্রাদভা বহু ক্ষেত্রে এইভাবে সম্পূর্ণরূপে উপাস্থি জুড়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছেন এবং পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পরিরোপণের ৩ বছর পরও সেই পরিরোপিত উপাস্থি ভালো অবস্থাতেই রয়েছে।

গত কয়েক বছর হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে মৃত ব্যক্তির চামড়া, হাড়, রক্তের শিরা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পরিরোপণ কার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঐ সমস্ত টিসুকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার জন্য প্রথমে শুকিয়ে তারপর ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা হয়। এই অবস্থায় টিসুগুলিকে বহুদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর পূর্ণ সদস্য ন. ন. পেত্রভের নেতৃত্বে আজ পর্যন্ত ঐরকম অপারেশন প্রচুর হয়েছে। তিনি মনে করেন যে (এক মাত্র চামড়া ছাড়া) যে কোন টিসু, তা সে রোগীর নিজ দেহের টিসুই হোক বা মৃতদেহ থেকে নেওয়া টিসুই হোক না কেন, পরিরোপণের পর জুড়ে যাওয়ায় এই দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না।

বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী যৌন গ্ল্যাণ্ড ও অন্যান্য এণ্ডোক্রীন গ্ল্যাণ্ডের (থাইরয়ড, সুপ্রারেনাল প্রভৃতি) গ্রাফ্টিং নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী বিজ্ঞানী ব্রাউন-সেক্কার দেখান যে যৌন গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্ট করলে তাতে করে মানুষের দেহে যেন যৌবনসুলভ শক্তি ফিরে আসে। এই ধারণার উপর নির্ভর করে ডাক্তার সের্গেই ভরোনভ, যিনি তখন ফ্রান্সে কাজ ও বসবাস করতেন, তিনি বৃদ্ধের যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য যুবকের যৌন গ্ল্যাণ্ড নিয়ে বৃদ্ধের দেহে গ্রাফ্ট করতে সুরু করেন। (এই সব এক্সপেরিমেণ্ট তিনি সুরু করেন ১৯২০ সালের কাছাকাছি)। তার বিশ্বাস ছিল যে পরিরোপিত যৌন গ্ল্যাণ্ড বহু বছর ধরে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত আভ্যন্তরীণ রস বা হরমোন তৈরী করে রক্তে সরবরাহ করে যাবে ও তারই ফলে বৃদ্ধের দেহে জীবনী শক্তি বাড়বে। শেষে মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয় যে এই ধারণা সত্যি। বৃদ্ধের দেহে যুবকের যৌন গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্ট করে দেখা যায়, যে তাদের যৌবন ফিরে আসছে (যেমন কার্যক্ষমতা তেমনি দেহের তৎপরতাও বাড়ছে)। ভরোনভের পর যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন দেশের বহু সার্জেন আগ্রহের সঙ্গে গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্টিং অপারেশন সুরু করেন। কিন্তু দেখা যায় যে গ্রাফ্টিং-এর পর যে যৌবনসুলভ শক্তি ফিরে আসে তা ১—২ বছরের বেশী স্থায়ী হয় না, তারপর আবার যে কে সেই। ফল ক্ষণস্থায়ী বলে আস্তে আস্তে ডাক্তারদের মধ্যে এই অপারেশনের উৎসাহ কমে এসেছে।

কিন্তু এণ্ডোক্রীন গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্‌টিং-এর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ক্ষণস্থায়ী হলেও এতে করে যে দেহে যৌবনসুলভ শক্তি ফিরে আসে তাতে তর্কের স্থান নেই।

তাত্ত্বিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বহু বিজ্ঞানী আজ মনে করেন যে বার্ধক্য হল বয়সের রোগ এবং অন্যান্য অসুখের মতই এই অসুখেরও চিকিৎসা হওয়া সম্ভব।

১৮৮৫ সালে রুশ বিজ্ঞানী ই. প. স্ক্‌ভরৎসভের এক্সপেরিমেণ্টের পর থেকে যেমন আমাদের দেশে তেমনি বিদেশে দেহ থেকে নিয়ে দেহের বাইরে কৃত্রিম পুষ্টি মিডিয়ামে টিসুর কালচার পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন জীবন্ত টিসু সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন্ত টিসু দেহের চেয়ে দেহের বাইরে কালচারেতেই অনেক বেশী দিন ধরে বাঁচে। কালচারেতেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টিসু বৃদ্ধ হয়, কিন্তু সে বার্ধক্য হ্রাস করে তার আয়ু বৃদ্ধি করা সম্ভব। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকান বায়োলজিস্ট আ. কারেল মুর্গীর ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর যে টুকরোটি পুষ্টি মিডিয়ামে রাখেন সে টুকরোটি তার কৃত্রিম অবস্থার পরিবেশে বেঁচেছিল ৪৫ বছরেরও বেশী। কিন্তু একই সঙ্গে পাড়া ঐ মুর্গীর ডিম থেকে যে সব বাচ্চা হয়েছিল সেগুলি বহুদিন আগেই বৃদ্ধ হয়ে তারপর মরে যায়। কাচের টিউবে রাখা ভ্রূণ হৃৎপিণ্ডটি কিন্তু কয়েক দশ বছর ধরে বেঁচে থাকে।

দেহের বাইরে টিসুকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার প্রধান উপায় হল, যে পুষ্টি মিডিয়ামটিতে বৃদ্ধির জন্য তাকে রাখা হয়েছে তা ঘন ঘন বদল করা। কোন কোন ক্ষেত্রে টিসু কালচারেও টিসু 'বুড়ো হতে' সুরু করে। তখন টিসুর কোষগুলির মেটাবলিজম ব্যাহত হয় ও ক্ষীণ হয়ে আসে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ হিসাবে কোষগুলির মধ্যে বেশী বেশী সংখ্যায় জমে ওঠে ড্রপলেট (droplet) ও গ্র্যানুল (granule) যাকে বলা যায় কোষের উচ্ছিষ্ট। কোষগুলির নিউক্লিয়াসে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে — সেগুলি কুঁচকে যায় এবং গোলাকার আকৃতির পরিবর্তে কোণযুক্ত আকৃতি ধারণ করে। তখন কোষের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নষ্ট হয়। এখানে সেখানে একটা দুটো কোষে অবশ্য তখনও ভাগ হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আরও কয়েকটা দিন গেলে পর কোষগুলি গলে যেতে থাকে, তখন টিসুর মৃত্যু হয়। কালচার টিসুতে বার্ধক্য দেখা দিলে সে টিসুকে যদি তার পুরন কালচার টিউব থেকে বের করে নিয়ে, আগে ব্যবহার হয়নি, এমন পুষ্টি মিডিয়ামের টিউবে রাখা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে বার্ধক্য হ্রাসের লক্ষণ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন করে তাতে বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়, কোষগুলির চেহারায় পরিবর্তন ঘটে, তাদের প্রোটপ্লাজম আবার ক্রমে ক্রমে ফরসা হতে থাকে, সুরু হয় কোষ ডিভিসন বা কোষের বংশবৃদ্ধি।

অর্থাৎ কালচার টিসুতে নবীনতা ফিরিয়ে আনতে হলে পুষ্টি মিডিয়ামের পরিবর্তনই তার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক বিজ্ঞানী ঠিক এইভাবেই টিসু কালচারে টিসুর 'কচি ভাব' ফিরিয়ে আনার কথা সুপারিশ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেহের বাইরে টিসুর বার্ধক্য হ্রাস করা সম্ভব।

যুবক দেহের এণ্ডোক্রীন গ্ল্যান্ড গ্রাফ্‌ট করেও বৃদ্ধের গোটা দেহে বার্ধক্যের চিহ্ন হ্রাস করা যায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। আশা করা যায় যে যদি কাঁচ দেহ বৃদ্ধের দেহের উপর দীর্ঘ সময় ব্যাপী সক্রিয় প্রক্রিয়া চালাতে পারে (যেমন ক্রশ রক্ত সংবহন যার সম্বন্ধে নীচে উল্লেখ করা হবে) তাহলে হয়ত অনেক স্থায়ীভাবে বৃদ্ধের বার্ধক্য হ্রাস করা সম্ভব হবে।

পূর্ব চিহ্নিত পরমাণুর সাহায্যে আজ নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, যে উদ্ভিদ জন্তু বা মানুষের দেহের গঠন (composition) সমস্ত জীবন ভোর অনবরত বদলে চলেছে কখনও তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত হয় সেই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মলিকিউল সর্বদা ভাঙ্গছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থান পূরণ হচ্ছে সিন্থিসিসের সাহায্যে নতুন মলিকিউল গঠনের মধ্য দিয়ে। এই নাম মেটাবলিজম। জীবন ও মেটাবলিজম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। এইভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে ভাঙ্গছে ও গড়ছে দেহের সমস্ত অংশ। এমনকি হাড়, দাঁত, টেন্ডন প্রভৃতি দেহাংশ, যাদের বাইরে থেকে মনে হয় অপরিবর্তনীয় তাদের মধ্যেও সর্বদা এই ভাঙ্গা গড়ার পরিবর্তন চলেছে। বর্তমানে রেডিওএকটিভ আইসোটোপের সাহায্যে দেহের ভিতরকার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ভাঙ্গন গড়নের ক্ষিপ্রতা ও তাদের স্থায়িত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

ধরে নেওয়া যায় যে দেহের ভিতরকার রাসায়নিক পদার্থের ভাঙ্গনের পর পুনর্গঠনের কাজ বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসে, ভাঙ্গনের পর গঠন থেকে যায় অপূর্ণ। কিন্তু বার্ধক্য যুক্ত দেহের সাথে যুব দেহ ক্রশ রক্ত সংবহনে যুক্ত হওয়ার ফলে সেই পুনর্গঠনের কাজ আবার প্রবল হয়ে উঠতে পারে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে এক্সপেরিমেণ্ট করতে হয়। কাজেই সত্যের কাছাকাছি একমাত্র সেই পৌঁছতে পারবে যে এবিষয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করবে প্রত্যক্ষ ফলের অনুসন্ধানে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে ভরোনভের এক্সপেরিমেণ্টে বার্ধক্য হ্রাসের ক্ষণস্থায়িতার দুটি প্রধান কারণ পরিস্কার ধরা পড়ে। প্রথমটি হল এই যে গ্ল্যান্ড গ্রাফ্‌টে গ্ল্যান্ড সংগ্রহ করার সময় তিনি রক্ত ও টিস্যুর গ্রুপ বিচার করেননি। আর দ্বিতীয় কারণ, গ্রাফ্‌ট করতে গিয়ে তিনি পরিরোপিত গ্ল্যান্ডের রক্তের শিরাগুলি, যার দেহে সেই গ্ল্যান্ড গ্রাফ্‌ট করা হল তার দেহের সেই সেই রক্তের শিরার সাথে সেলাই করে যুক্ত করেননি। পরিরোপিত গ্ল্যান্ডটি নতুন জায়গায় মরে শুকিয়ে গলে যাওয়ার পক্ষে এই দুটি কারণই যথেষ্ট।

পুরুষের যৌন গ্ল্যান্ডের চেয়ে মেয়েদের ওভারি পরিরোপণ করা যথেষ্ট সহজ।

১৯৩৯ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ম. ক. ক্রিমস্কায়া ও আ. ই. লপিরিন ৮টি মেয়ে খরগোসের দেহে ওভারি পরিরোপণ করেন। অতিরিক্ত পরিরোপিত ওভারি যুক্ত সেই খরগোসগুলি প্রতি বারে ১ থেকে ৪টি করে এক বছরে এক থেকে চারবার পর্যন্ত বাচ্চা দেয়।

এই কুকুরটির দিকে তাকিয়ে মনে করা কঠিন যে ওর দেহে দুইটি হৃৎপিণ্ড রয়েছে। অথচ আসলে কিন্তু সত্যিই তাই। ডাক্তার ভ. প. দেমিখভ মনোযোগের সঙ্গে স্টেথস্কোপ দিয়ে শুনছেন ঐ হৃৎপিণ্ড দুটি কেমন কাজ করছে ।

কুকুরছানার পরিরোপিত মাথা শুধু যে বেঁচে
থাকার সমস্ত লক্ষণ বজায় রাখে তাই নয়,
এমনকি খিদের সঙ্গে চেটে চেটে দুধ খায়

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বড় কুকুরের গায়ে সামনের দুটো পা যুক্ত কুকুরছানার মাথা পরিরোপিত হয়েছে। সংযুক্ত ঐ দুটি মাথাই কিন্তু এখন এক হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

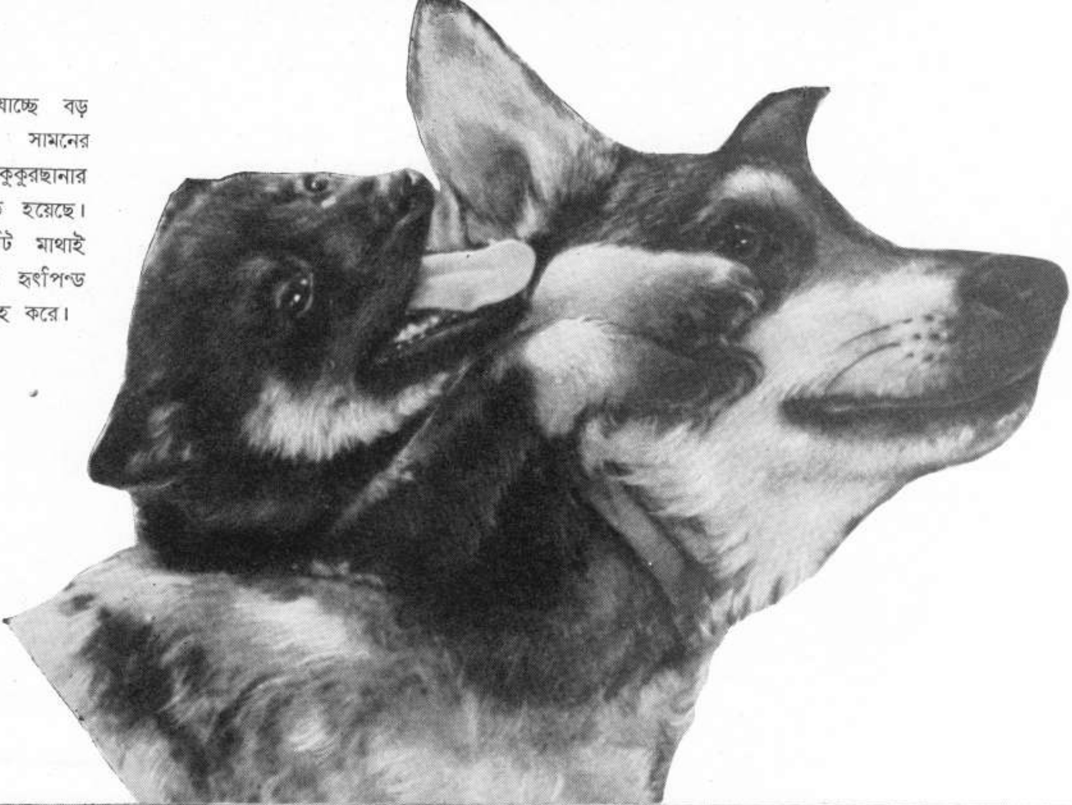

আ. এ. ম্যাণ্ডেলস্টাম এবং আ. আ. কুলিকভস্কায়া ধেড়ে ইঁদুরের দেহে ঠাণ্ডায় সংরক্ষিত ওভারি পরিরোপণ করে লক্ষ্য করেন যে সেই ওভারি অনেক কেসে জুড়ে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সুরু করেছে।

পরিরোপণের পর পুরুষের যৌন গ্ল্যাণ্ডের তুলনায় ওভারিই বেশী সহজে জুড়ে যায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে ওভারির সবচেয়ে কার্যক্ষম কোষগুলি থাকে ওভারির সার্ফেসের কাছাকাছি যেখানে পরিরোপণের পর পরিরোপিত স্থানের চারপাশের টিসু থেকে অতি সহজেই রক্তের শিরা গজিয়ে উঠে।

আজ পর্যন্ত মেয়েদের শরীরে সফলভাবে ওভারি পরিরোপণের দুই একটা মাত্র উদাহরণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি থাইরয়ড ও অন্যান্য এণ্ডোক্রীন গ্ল্যাণ্ড পরিরোপণেও আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। এতে আশ্রয়দাতার দেহের রক্তের শিরার সাথে গ্ল্যাণ্ডের শিরা সেলাই করে দেওয়া হয়।

কী করলে বিভিন্ন টিসু ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সফলভাবে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা যায় তাই নিয়ে আজ ফিজিওলজিস্ট, সার্জেন, ইমিউনলজিস্ট ও আরও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের বায়োলজিক্যাল বিশেষত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তার নিয়ম নির্ধারণে নিযুক্ত হয়েছেন।

আজ এই সব সমস্যা সমাধানেই আত্মনিয়োগ করেছে মস্কোর ১ নং মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগের ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন বিষয়ক পরীক্ষাগারে কর্মিবৃন্দ।

জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ ও দেহাংশ পরিরোপণের এক্সপেরিমেণ্ট

মস্কোর ১ নং মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগের ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন বিষয়ক পরীক্ষাগারে আজ অনেক বছর ধরে কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য অঙ্গ পরিরোপণের এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে। আমাদের এক্সপেরিমেণ্টের মূল উদ্দেশ্য — মানুষের দেহেও যাতে হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা চলে।

হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশন

এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সার্জিক্যাল ও ফিজিওলজিক্যাল দিক থেকে কুকুরের বুকে হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের উপায়টি যতদূর সম্ভব উন্নত করা যায় আমরা তার চেষ্টা করি। আমাদের এক্সপেরিমেণ্টের আগে উচ্চতর প্রাণীদের বুকে হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের উপায় কারোই জানা ছিল না — না আমাদের দেশে না বিদেশে। কয়েকজন বিজ্ঞানী ঘাড়ের উপর

বা কুচ্‌কির কাছে হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার দুই একটা এক্সপেরিমেণ্ট করেন বটে কিন্তু তাতে কি আর ফল হয়? সেই হৃৎপিণ্ডের সাথে ফুসফুসের কোনই যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। তাই রক্ত চলাচলে সক্রিয় অংশ নিতে না পেরে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা হৃৎপিণ্ড চারপাশে গজান টিস্যুর চাপে পড়ে নিজের কাজ বন্ধ করত।

এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে আমরা বুঝলাম যে বুকের ভিতর, একমাত্র যেখানে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করতে পারলে তবে হৃৎপিণ্ড কাজ করতে পারে, সেখানে তাকে পরিরোপণ করা সহজ ব্যাপার নয়, খুবই কঠিন। বহু বছর ধরে আমরা এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর বুকের খাঁচায় শুধু হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস সহ হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি, সে অপারেশনে ২০ রকমেরও বেশী, বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই অপারেশনের পর কম হোক বেশী হোক, কিছু সময়ের জন্য কুকুরটির জীবন ও পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। অপারেশনের কায়দাগুলি সবই যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই; তাই উন্নততর অপারেশনের উপায় উদ্ভব করার চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হয়। মনে হয় বর্তমানে আমরা অভীষ্টের খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছি।

নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার এক্সপেরিমেণ্ট করি: এক্সপেরিমেণ্টের এক সিরিজে কুকুরের বুকে তাদের নিজ হৃৎপিণ্ডের পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হয় অন্য কুকুর থেকে নেওয়া দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ড সহ ফুসফুস।

অপারেশনের পর দিন এনেস্থেসিয়ার ক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর দুই হৃৎপিণ্ড যুক্ত কুকুরটি জেগে ওঠে, তার পায়ের নাড়ী স্পর্শ করলে ধরা পড়ে দুই রকমের নাড়ী। যে নাড়ী খুবই দুর্বল ও দ্রুত সেই নাড়ীটিই হল তার নিজস্ব হৃৎপিণ্ড উদ্ভূত কিন্তু যে নাড়ী অধিকতর পূর্ণ ও মন্থর গতি সেটা হল পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। স্বভাবতই মনে হয় যে অপারেশনের পর মূলত রক্তপ্রবাহের কাজ চলে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে। কুকুরটি যত সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে ততই তার নিজস্ব হৃৎপিণ্ডের নাড়ীও স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং শেষে তার ছন্দগতি পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের ছন্দগতির সঙ্গে মিলে যায়।

১৯৫৬ সালে ৪ঠা অক্টোবর বরজায়া নামে একটি কুকুরের বুকে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড পরিরোপণ করা হয়। অপারেশনের পর কয়েক দিন ধরে তার বুকের মধ্যে বেশী ডোজে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন করে প্লুরিসি (pleurisey) বা পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের চারপাশের টিস্যুতে ইনফেকশন হওয়া বন্ধ করা হয়। তাই যেখানে যেখানে বরজায়ার রক্তের শিরা দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ডের শিরার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল সে জায়গাগুলি শক্তভাবে জুড়ে যায়। দুই হৃৎপিণ্ড যুক্ত জীবিত কুকুরটিকে চেকোস্লোভাক, আমেরিকান ও ইংরেজ সার্জেনদের দেখানো হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু অপারেশনটা করা হয়েছিল খুবই জটিল একটা কায়দা অবলম্বন করে যার ফলে অন্য রকম খারাপ উপসর্গ দেখা দেওয়ার ভয় থেকে যায়। এই অপারেশনে পাঁচটি বড় বড় রক্তের

শিরা কেটে পরস্পর যুক্ত করা হয়। যুক্ত করায় একটু ব্যতিক্রম হলেই সেলাই-এর জায়গায় শিরার মধ্যে রক্ত জমে যেতে পারত। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। অপারেশনের ৩২ দিন পর তার ভেণ্ট্রিক্লের ফিব্রিলেশন (বেতাল্য হৃৎপিণ্ডের সংকোচন) শুরু হয় যাতে সাধারণত শেষ পর্যন্ত ভেণ্ট্রিক্লের প্যারালিসিস হয়ে হৃৎপিণ্ডের কাজ থেমে যায়। ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম করে ধরা পড়ল হৃৎপিণ্ডের পেছনের দেওয়ালে ইনফার্কশন হয়েছে (infarction)*। তাই পক্ষাঘাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে হৃৎপিণ্ডে কী পরিবর্তন হয়েছে দেখার জন্য আমরা তখনই অজ্ঞান করিয়ে কুকুরটির বুক কাটি। দেখা গেল যে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের বেসের কাছে (যেখানে হৃৎপিণ্ডের সাথে এসে যুক্ত হয় দুই ভেনা কেভা) তালে তালে স্বাভাবিক সংকোচন চলছে, কিন্তু ডাইনের ভেণ্ট্রিক্লে সংকোচন সম্পূর্ণ বেতালা, তার এক এক জায়গায় চলছে এক এক রকম স্পন্দন। বাঁয়ের ভেণ্ট্রিক্লের দেয়াল কেটে দেখা গেল যে, যে রক্তের শিরা হৃৎপিণ্ডে পুষ্টি বহন করে সেই রক্তের শিরার যে জায়গাতে সেলাই দেওয়া হয়েছিল সে জায়গায় রক্তের ঢেলা তৈরী হয়ে শিরাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই ভেণ্ট্রিক্লের প্রশস্ত জায়গা জুড়ে ইনফার্কশন হয়েছে।

এরপর থেকে অনুরূপ জটিলতা নিবারণের জন্য আমরা দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের অপারেশনে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করি। ৫টি রক্তের শিরা কেটে যুক্ত করার পরিবর্তে আমরা উভয় হৃৎপিণ্ডের তিনটি রক্তের শিরা পরস্পর যুক্ত করে আশ্রয়দাতার দেহে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড পরিরোপণ করি। উদ্দেশ্য সেলাই-এর জায়গায় রক্তের ঢেলা তৈরী হলেও সে ঢেলা যাতে স্থান চ্যুত হয়ে হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব পুষ্টি বহনকারি শিরাগুলিতে না পড়ে পেছনের পায়ের শিরাগুলির দিকে ধাবিত হয়।

বর্তমানে আমরা রক্তের প্রবাহ পথে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডকে যুক্ত করার এমন এক নতুন স্কিম তৈরী করেছি যাতে করে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডে ইনফার্কশন হওয়া নিবারণ করা যায়।

৩২ দিন বেঁচে থাকা দুই হৃৎপিণ্ড যুক্ত কুকুরটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডটি তার চারপাশে অবস্থিত আশ্রয়দাতার দেহের টিসুর সাথে খুবই নির্ভরযোগ্যভাবে জুড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেলেও এতদিন ধরে যে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডটি বেঁচে ছিল বিজ্ঞানের দিক থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। দেশী ও বিদেশী বহু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে অন্য জীবের দেহ থেকে নেওয়া কোন টিসু বা দেহাংশ ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করলে আশ্রয়দাতার দেহে তার বিরুদ্ধে নাকি এণ্টিবডি** তৈরী হয়ে সেই পরিরোপিত টিসু বা দেহাংশ দুই এক সপ্তাহের মধ্যে মরে যায়।

---

* ইনফার্কশন হল রক্তপ্রবাহের ব্যাঘাত জনিত হৃৎপিণ্ডের কোন অংশের টিসু মৃত্যু, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের পুষ্টিবাহক আর্টারি রক্তের ঢেলা দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই ইনফার্কশন হয়। — সম্পাঃ

** এণ্টিবডি হল এক বিশেষ জাতীয় পদার্থ যা রক্তের ভেতর তৈরী হয় শরীরের মধ্যে ইনফেকশন বা দেহের তুলনায় ভিন্ন জাতীয় প্রোটীন ঢোকার পর। — সম্পাঃ

দেহাংশ পরিরোপণের বেশীর ভাগ এক্সপেরিমেণ্টে আমরা এণ্টিবডির কোন সন্ধান পাইনি।

এমনকি যে কুকুরটি হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের পর ৩২ দিন বেঁচে ছিল তার রক্তেও এণ্টিবডির কোন সন্ধান মেলেনি।

সমস্ত বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে একই শ্রেণীভুক্ত এক জীবের দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে দেহাংশ বা টিস্যু পরিরোপণ করলে আশ্রয়দাতার দেহে যে প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের মতে তার কারণ যতটা না বিশেষ বিনষ্টকারক শক্তি যুক্ত এণ্টিবডি (অনেক বিজ্ঞানী এই ধারণা পোষণ করেন) ততটা দুই টিস্যুর সংযোগ স্থলের ইনফ্লামেশন। কাজেই যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করলে ইনফ্লামেশন দূর হয় তার সাহায্যেই দেহাংশ পরিরোপণে সাফল্য লাভ করা চলে।

এক্সপেরিমেণ্ট করে করে আজ আমরা তাতে এমন উৎকর্ষ লাভ করেছি যে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার পর প্রাণীটির বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু হওয়াটাই ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনই সন্দেহ নেই যে রক্তের শিরা সেলাই করে পরস্পর যুক্ত করার কায়দা আরও উন্নত করে আমরা ভবিষ্যতে সেলাই-এর জায়গায় রক্তের ঢেলা বাঁধা সম্পূর্ণ নিবারণ করতে পারব।

ফুসফুস, মূত্রাশয়, সুপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেহাংশ পরিরোপণের ফলাফলের সাথে হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের ফলাফল তুলনা করে আমাদের ধারণা হয়েছে যে মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহাংশের তুলনায় পরিরোপিত হৃৎপিণ্ড অনেক ভালভাবে জোড়ে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের কায়দা ও অপারেশন টেকনিক আরও খানিকটা উন্নত করতে পারলে সে অপারেশন এতই সহজ ও বিপদবিহীন হবে যে প্রয়োজন বোধে তা মানুষের উপরও করা সম্ভব হবে।

আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে সে সময় আর তেমন দূরে নয় যখন প্রয়োজন বোধে সার্জেনরা মানুষের উপরও হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের অপারেশন করতে সমর্থ হবেন। পরিরোপিত হৃৎপিণ্ড তাতে রোগীর নিজস্ব পীড়িত হৃৎপিণ্ডের কাজ অনেক পরিমাণে লাঘব করে তার কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করবে। নিজস্ব হৃৎপিণ্ড বাদ দিয়ে সে জায়গায় অন্যের হৃৎপিণ্ড বসানর প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই কম দেখা দেবে।

তাছাড়াও এনাটমির দিক থেকে কুকুরের তুলনায় মানুষের বুকের গঠন ও বুকের ভেতরকার বড় বড় রক্তের শিরার অবস্থিতি দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের পক্ষে ঢের সুবিধেজনক।

এরকম অপারেশনের পর কুকুরের চেয়ে মানুষের সেবা যত্ন করা ঢের সহজ এই দিক থেকে যে অপারেশনের পর ১০—১২ দিন, অর্থাৎ যতদিন না সেলাই করা রক্তের শিরাগুলি জুড়ে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মানুষকে নড়াচড়া না করে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য করা যায়।

কুকুরকে কি সেভাবে শুইয়ে রাখা যায়? ওষুধ দিয়ে কুকুরকে দীর্ঘ দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।*

দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের যে সব এক্সপেরিমেণ্ট আমরা করি তার সাথে সাথে পুরোপুরি হৃৎপিণ্ড বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টাও করা হয়। অর্থাৎ কুকুরের নিজস্ব হৃৎপিণ্ড কেটে নিয়ে সে জায়গায় বসানো হয় অন্য কুকুরের হৃৎপিণ্ড। টেকনিকের দিক থেকে এই অপারেশন ভীষণ কঠিন, তাই প্রথম দিকে হৃৎপিণ্ডের জায়গায় আমরা ফুসফুস সহ হৃৎপিণ্ড ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার চেষ্টা করি, কেননা ফুসফুসের সাথে হৃৎপিণ্ড অনেক মোটা মোটা রক্তের শিরা দিয়ে যুক্ত। শুধুই হৃৎপিণ্ড পরিরোপণ করতে হলে ঐ সব শিরার প্রত্যেকটিকে কেটে তার সাথে পরিরোপিত হৃৎপিণ্ডের শিরা যুক্ত করতে হয়।

নিচে ফুসফুস সহ হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের শক্ত অপারেশনটির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে: প্রথমে পরিরোপণের জন্য নির্দিষ্ট দুই ফুসফুস যুক্ত হৃৎপিণ্ডটি কুকুরের বুকে এমন ভাবে যুক্ত করা হয় যে মিনিট দশেক তার বুকের মধ্যে একত্রে দুই হৃৎপিণ্ড ও দুই জোড়া ফুসফুস কাজ করে। তারপর যেমন যেমন সেই হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কুকুরের দেহের সাথে যোগ স্থাপন করে ঠিক ততটুকু করে কুকুরটির নিজস্ব হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কেটে আলগা করা হয়। এইভাবে অপারেশন করার অর্থ এই যাতে হৃৎপিণ্ড বদলের সময় সামান্যতম সময়ের জন্যও মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল ব্যাহত না হয়। সকলেই জানে যে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য কুকুরের ব্রেনে রক্ত চলাচল বন্ধ হলেই পশুটির মৃত্যু হয়, যদি না আগে থেকে কৃত্রিম উপায়ে তার দেহের উত্তাপ নীচু করার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের নিজস্ব রচিত উপায়টি অবলম্বনের ফলে এক কুকুরের বুক থেকে অন্য কুকুরের বুকে জুড়ে দেওয়া পর্যন্ত সেই ফুসফুস যুক্ত হৃৎপিণ্ডটির স্বাভাবিক সংকোচন চলতে থাকে।

অপারেশনের পরের দিন এনেস্থেসিয়ার ঘোর কেটে যাওয়ার পর কুকুরটি জেগে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে, নিজে নিজে জল খায় এবং এক এক সময় এমন ভাবে খাবার খায় যেন বেশ খিদে পেয়েছে বলে মনে হয়।

১৯৫১ সালে রিয়াজান শহরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর অধিবেশন চলছিল তখন প্রতিনিধিদের সামনে আমরা এই অপারেশন দেখাই। যে দালানে সম্মেলন হয়েছিল তার হলে বদল করা হৃৎপিণ্ড নিয়ে কুকুরটি ৬ দিন পর্যন্ত বেঁচেছিল। অপারেশনের সময় কুকুরটির ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভে (laryngial nerve) চোট লাগে ও সেই

* মানুষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সমস্ত বিজ্ঞানীই ভ. প. দেমিখভের মত এত উৎসাহ পোষণ করেন না, কিন্তু তাহলেও তিনি হৃৎপিণ্ড পরিরোপণ অপারেশনের যে টেকনিক বের করছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। — সম্পাঃ

আঘাত জনিত জটিলতার ফলেই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। অপরের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস নিয়ে কুকুরের দীর্ঘ ৬ দিন ধরে বেঁচে থাকা ইতিহাসে এই প্রথম।

ফুসফুস যুক্ত হৃৎপিণ্ড বদলের পর এক্সপেরিমেন্ট কৃত জন্তু শেষ পর্যন্ত কী কারণে মরে তা বিশ্লেষণ করলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মৃত্যুর কারণ ফুসফুসের জটিলতা (শ্বাসের রাস্তায় বেশী রকম শ্লেষ্মা জমা, নিউমোনিয়া হওয়া ইত্যাদি)। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তাই ফুসফুস বাদ দিয়ে শুধু হৃৎপিণ্ড পরিরোপণ করতে চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য যে ভবিষ্যতের জন্য এই সব প্রচেষ্টার ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই বেশী। কিন্তু ফুসফুস বাদ দিয়ে কেবল মাত্র হৃৎপিণ্ড বদল করা খুবই কঠিন, তার কারণ এই যে কম পক্ষে ৭—৮টি মোটা মোটা রক্তের শিরা কেটে তার সাথে সেই নতুন হৃৎপিণ্ডটিকে যুক্ত করতে হয়। আমরা এখনও ঐরকম অপারেশনের তেমন কোন ভাল উপায় বের করতে পারিনি। যে সব কুকুরের উপর এই অপারেশন করা হয়েছে তার একটিও এখনও পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার বেশী বাঁচেনি।

মূত্রাশয় ও দেহের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য দেহাংশ পরিরোপণ

আমরা মূত্রাশয় প্রভৃতি অন্যান্য দেহাংশ পরিরোপণেরও বহু এক্সপেরিমেন্ট করি। আমাদের আগেও বহু বিজ্ঞানী মূত্রাশয় ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। মৃতের মূত্রাশয় নিয়ে জীবিত মানুষের দেহে তা ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার প্রথম প্রচেষ্টা করেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী প্রফেসর ভ. ভ. ভরোনভ। কয়েক বছর হল জীবিতের দেহে মৃতের মূত্রাশয় পরিরোপণের বার দশেকের বেশী প্রচেষ্টা হয়েছে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়।

মানুষেই হোক বা জন্তুর মধ্যেই হোক মৃতের মূত্রাশয় জীবিতের দেহে পরিরোপণ করে দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশ্রয়দাতার দেহের রক্তপ্রবাহ চক্রের সাথে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মূত্রাশয় সজীব হয়ে কাজ করতে শুরু করে ও সেই মূত্রাশয় থেকে স্বাভাবিকভাবেই মূত্র তৈরী হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার কার্যক্ষমতা দুর্বল হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে তার কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিরোপণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই কুকুরের পরিরোপিত মূত্রাশয় অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের মধ্যে মৃতের মূত্রাশয় ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে দেখা গেছে যে তা ঢের দীর্ঘ দিন ধরে কাজ চালিয়ে যায় পরিরোপিত মূত্রাশয়ে শেষে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে গভীর ইনফ্লামেশন বলে বর্ণনা করা চলে। আমরা বিশ্বাস রাখি যে ইনফ্লামেশন কমিয়ে বা পুরোপুরিভাবে তা নিবারণ করে ভবিষ্যতে মূত্রাশয় পরিরোপণে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

মূত্রাশয় পরিরোপণের এক্সপেরিমেন্টগুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, শরীরের

যে কোন দেহাংশের তুলনায় মূত্রাশয় বিষক্রিয়া ও ইনফ্লামেশনের প্রতি অনেক বেশী স্পর্শকাতর। যে কোন সংক্রামক ব্যাধি হলে শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গের তুলনায় বেশী ভোগে মূত্রাশয় তাই মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে দেহের বায়োকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী পরিমাণে প্রতিফলিত হয় মূত্রাশয়ে। মূত্রাশয় পরিরোপণের সাফল্যের পথে শুধু এই যদি বাধা হয় তাহলে ত কথাই নেই সাময়িকভাবে ক্রশ রক্তপ্রবাহ করাতে পারলেই এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। (ক্রশ রক্তপ্রবাহ সম্বন্ধে নীচে বলা হবে)।

ভ. ম. গরিয়াইনভ গোটা খাদ্য নালী ও পেরিটোনিয়ামের ভিতরকার অন্যান্য সমস্ত দেহাংশ পরিরোপণের এক্সপেরিমেণ্ট করেন। আ. ব. স্ভেইকভস্কি নামে এক বিজ্ঞানী কুকুরের উপর যকৃৎ ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের প্রচেষ্টা করেন। এই সমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট এখনও তাদের প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে বিচার করলে এখনও যদিও এই সমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট তেমন উন্নতি লাভ করেনি তাহলেও দেখা গেছে যে অপারেশনের পর জন্তুগুলি ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচে।

সামনের বা পেছনের দেহার্ধ পরিরোপণ

ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা দেহাংশগুলির যাতে ক্ষতি কম হয় ও পরিরোপণের পর তাদের অবস্থা যাতে ভাল করে অধ্যয়ন করা চলে তার জন্য শুধু যে আমরা একসঙ্গে একাধিক দেহাংশ পরিরোপণ করি তাই নয় কুকুরের অর্ধেক দেহও পরিরোপণ করার প্রচেষ্টা করি। গোড়ার দিকের এক্সপেরিমেণ্ট থেকেই আমাদের ধারণা জন্মায় যে অপারেশনের দিক থেকে কুকুরের সামনের বা পিছনের অর্ধেক দেহ পরিরোপণ করা হৃৎপিণ্ড পরিরোপণের তুলনায় ঢের সহজ।

আমরা আগেই বলেছি যে এই সমস্ত অপারেশনের সবচেয়ে কঠিন জিনিস হল মোটা মোটা রক্তের শিরা একত্র যুক্ত করা ও পরিরোপিত দেহাংশটিকে তার নতুন জায়গায় ঠিকমত বসান।

শিরার সেলাই যদি ঠিকমত না হয় তাহলে সেলাই-এর জায়গায় রক্ত ঢেলা বেঁধে রক্তপ্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি হয়ে পরিরোপিত অংশটি মরে যায়। দেহাংশটিকে যদি তার নতুন জায়গায় ঠিকমত না বসান হয় তাহলেও তাই, সংযুক্ত করা রক্তের শিরাগুলি বেঁকে গিয়ে, ভাঁজ হয়ে, চাপে পড়ে বা ঘুরে গিয়ে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, এবং তার ফলে পরিরোপিত দেহাংশটি মরে যায়।

কুকুরের অর্ধেক দেহ (সামনের বা পেছনের অর্ধেক) পরিরোপণে কিন্তু এসব ঝুঁকি পোহাতে হয় না। তাতে ডায়াফ্রামের কাছে অবস্থিত মাত্র দুটি বড় রক্তের শিরা সেলাই করে সংযুক্ত করলেই যথেষ্ট। পেছনের দেহার্ধ যখন পরিরোপণ করা হয়, তাতে ক্ষতিহীন অবস্থায় রয়ে যায় পেটের ভিতরকার সমস্ত দেহাংশ এবং তারা তাদের পারস্পরিক স্বাভাবিক অবস্থান বজায়

রাখে। তাছাড়াও, এর আর একটা সুবিধা এই যে দেহার্ধ পরিরোপণ করলে এক এক্সপেরিমেণ্টে একসঙ্গে অনেক দেহাঙ্গের অবস্থা পরীক্ষা করা যায়।

এই সব বিচার করে আমরা কয়েক বার এক কুকুরের সামনের অর্ধেক অন্য কুকুরের পেছনের অর্ধেকের সাথে যুক্ত করার এক্সপেরিমেণ্ট করি। অপারেশনের দিক থেকে এই এক্সপেরিমেণ্ট করা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু স্পাইন্যাল কর্ড কাটার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপ ঝট্ করে এমন কমে আসে যে প্রথম প্রথম এক্সপেরিমেণ্টের সময় সব কুকুরই খুব তাড়াতাড়ি মরে যায়। এই উপসর্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের এক্সপেরিমেণ্ট কিছুটা বদলাই।

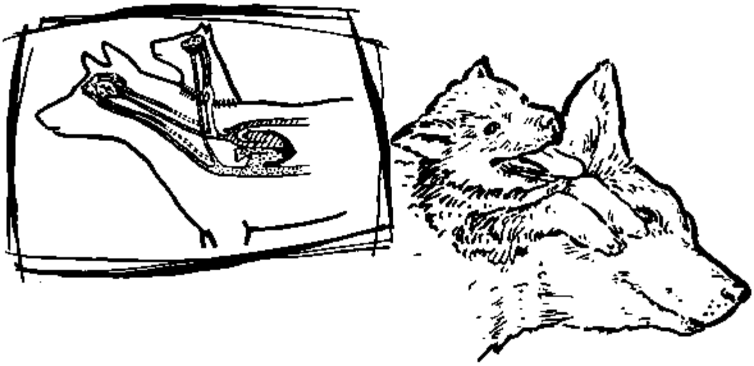

কুকুরে সামনের দেহার্ধ পরিরোপণের নক্সা।

এক কুকুরের দেহার্ধ অন্য এক গোটা কুকুরের দেহের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। গোটা কুকুরের দেহের সাথে বাচ্চা কুকুরের পেছনের বা সামনের অর্ধেক যুক্ত করে তার সাহায্যে পরিরোপণের পর বহুল পরিমাণে নার্ভের যোগাযোগ বজায় রেখে আমাদের পক্ষে দেহাংশগুলির অবস্থা ও কাজ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য যে পৃথক পৃথক ভাবে দেহাংশ পরিরোপণ করতে গেলে সেই দেহাংশের সমস্ত নার্ভ যোগাযোগ আগে কেটে ফেলতে হয়।

ঐ অপারেশন করা হয় এইভাবে। নেওয়া হয় একটি বড় কুকুরছানা ও দুটো বড় বড় কুকুর। অজ্ঞান করিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসের ক্রিয়া চালিয়ে কুকুরছানাটিকে কেটে অর্ধেক করা হয় বুকের মাঝখান থেকে। সামনের অর্ধেকে রাখা হয় মাথা, সামনের দুটো পা এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বাদ দেওয়া বুকের কিছুটা অংশ। অবশ্য তার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বাদ দেওয়ার আগে সেই দেহার্ধের রক্তের শিরা বড় কুকুরের গলার রক্তের শিরার সাথে যুক্ত করে নিতে হয়। কেটে নেওয়া কুকুরছানার সামনের অর্ধেক তখন যুক্ত করা হয় বড় কুকুরের কাঁধে।

কুকুরছানার পেছনের অর্ধেকে থাকে পেটের ভিতরকার সমস্ত দেহাংশ ও পিছনের দুটো পা। এই অর্ধেক অন্য বড় কুকুরটির সাথে যুক্ত করা হয় (তবে তার রক্তের শিরা আগে সেলাই করে নেওয়া হয় বড় কুকুরের গলার রক্তের শিরা বা কেটে বাদ দেওয়া মূত্রাশয়ের রক্তের শিরার সাথে)।

কুকুরছানার পেছনের দেহার্ধ আমরা মাত্র তিন বার পরিরোপণ করেছি। পরিরোপিত স্থানে ঐ দেহার্ধ কখনও ৬ দিনের বেশী বাঁচেনি, কিন্তু তার মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করতে সমর্থ হই যে পৃথক পৃথক ভাবে পরিরোপিত দেহাংশের চেয়ে ঐ দেহার্ধের দেহাংশগুলি পরিরোপণের পর অনেক ভাল অবস্থায় থাকে।

আগে আমরা নিজেরা যেমন এক কুকুরের পা নিয়ে অন্য কুকুরের দেহে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছি তেমনি কুকুরের পা পরিরোপণে প্রফেসর প. ন. মাজায়েভ ও প. ম. চেপভের এক্সপেরিমেণ্ট দেখেছি। সব কেসেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে পরিরোপিত পা ভীষণভাবে ফুলে গিয়ে ৩—৪ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। পেছনের দেহার্ধ পরিরোপণ করে আমরা ৬ দিনের মধ্যেও পা ফুলতে দেখিনি।

মূত্রাশয়ের বেলাতেও তাই। যখন পৃথকভাবে আমরা মূত্রাশয় পরিরোপণ করি তখন তাতে ভীষণ ইনফ্লামেশন দেখা দেয়, কিন্তু পিছনের দেহার্ধ পরিরোপণ করে সেই দেহার্ধের মূত্রাশয়ে আমরা কখনই অনুরূপ ইনফ্লামেশন হতে দেখিনি। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে বিভিন্ন দেহাংশ পরিরোপণ করতে যতদূর সম্ভব সেই দেহাংশের পরিচিত ফিজিওলজিক্যাল পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

মাথা ও সামনের পাদুটি যুক্ত কুকুরছানার সামনের দেহার্ধ পরিরোপণের এক্সপেরিমেণ্টগুলি খুবই কৌতূহল জাগায়। ভ. ম. গরিয়াইনভের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা এই অপারেশনের উপায় উদ্ভাবন করে হাতে কলমে তা প্রয়োগ করি। এতে কুকুরছানার সামনের দেহার্ধের এওর্টা ও ভেনা কেভা, হৃৎপিণ্ডের এই দুই মোটা রক্তের শিরা বড় কুকুরের গলার মোটা রক্তের শিরার সাথে এমন ভাবে যুক্ত করা হয় যাতে এক মিনিটের জন্যও পরিরোপিত কুকুরের মাথায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ না হয়। শিরা যুক্ত করা হলে পর কুকুরছানার সামনের দেহার্ধ থেকে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কেটে বাদ দেওয়া হয়। পরিরোপিত মাথায় ও দেহার্ধে রক্তপ্রবাহ চলতে থাকে বড় কুকুরের হৃৎপিণ্ড মারফৎ।

বহু বছর ধরে ব্রাউন-সেক্কার, হেইম্যান্স, স. স. ব্রুখোনেঙ্কো, স. ই. চেচুলিন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা কুকুরের গলা কেটে সেই কাটা মাথা কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। আমাদের তুলনায় তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাঁরা সেই কাটা মাথা এক কুকুর থেকে অন্য কুকুরে পরিরোপণ করার কোন চেষ্টা করেননি। কৃত্রিম পুষ্টি যুগিয়ে তাঁরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য সেই কাটা মাথা বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হন। তাও সেই জীবিত কাটা মাথা একমাত্র

জোরদার স্টিমুলেশনেই সাড়া দেয়। কৃত্রিম পুষ্টি যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখা কাটা মাথার উপর ওষুধের ক্রিয়া পরখ করার জন্য ন. প. সিনিৎসিনকে সেই কাটা মাথার সাড়া পাবার জন্য তার কানে বিদ্যুতের সক ও জিহ্বায় এসিডের ছে'কা লাগাতে হয়।

আমাদের এক্সপেরিমেণ্টে অন্য কুকুরের সামনের দেহার্ধে পরিরোপিত মাথায় আমরা সম্পূর্ণ অন্য চিত্র লক্ষ্য করি। অপারেশনের পর দিন এনেস্থেসিয়ার ঘোর কাটার পর সেই মাথায় জীবনের সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় — চোখে সচেতনতার ভাব নিয়ে সেই মাথা চারদিকে তাকায়, এদিকে ওদিকে মাথা ঘোরায়, প্লেটে দুধ দিলে তা জিব দিয়ে চেটে খায়, আগ্রহের সঙ্গে দুধ ও জল* চুমুক দেয়, আঙ্গুল দেখালে খেলতে চায় ও খোঁচা দিলে কামড়াবার চেষ্টা করে।

সমস্ত দেখে মনে হয় যে পরিরোপিত মাথা কুকুরছানার কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। কুকুরছানার রক্তপ্রবাহ চলতে থাকে এওর্টা ও ইনফিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে, যাদের আগেই যুক্ত করা হয়েছে বড় কুকুরের গলার মোটা আর্টারি ও ভেনের সাথে। ঐ সংযুক্ত রক্ত শিরার সাহায্যে মাথায় সাময়িকভাবে আর্টারির রক্তপ্রবাহ বন্ধ হলে তাতে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা আমাদের পরীক্ষা করার সুযোগ হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সামান্যতম সময়ের জন্য রক্ত চলাচলের আর্টারি চেপে ধরলে পরিরোপিত মাথাটি জীবনের সমস্ত চিহ্ন হারায়, এমনকি তার চোখের রিফ্লেক্স পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। সে সময় ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফি** করে দেখা গেছে যে তখন মস্তিষ্কের বায়োলজিক্যাল বিদ্যুৎ প্রবাহও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। মস্তিষ্কের বৃহত্তর গোলার্ধেও তখন আর কোনই বৈদ্যুতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আর্টারি চেপে ধরা আঙ্গুলটি সরানোর সঙ্গে সঙ্গে খুবই তাড়াতাড়ি আবার তাতে জীবিতের সমস্ত লক্ষণ ফিরে আসে। কুকুরছানার মাথাটি তখন আবার জিব দিয়ে চাটে ও আঙ্গুল চোষে।

আমাদের ২০টি এক্সপেরিমেণ্টের মধ্যে ৫টি কেসে সেই মাথা ৬ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত বাঁচে। শেষের একটি এক্সপেরিমেণ্টে মাথাটি বে'চে থাকে ২৯ দিন পর্যন্ত। ৭ দিনের দিন দেখা যায় যে পরিরোপিত দেহার্ধের চামড়া ও অন্যান্য সেলাই করা টিসু বড় কুকুরের গায়ে শক্ত হয়ে জুড়ে গেছে। বোঝা যায় যে মাথাটা বেশ খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে ও মাথার লোমগুলি লম্বায় প্রায় এক সেণ্টিমিটারের বেশী বেড়েছে।

বড় কুকুরটি ছিল জার্মান মর্দা কুকুর এলসেশিয়ান। তার কাঁধে জুড়ে দেওয়া মাথাটি নেওয়া হয় এক দেশী সাদা রঙের কুকুরছানার দেহ থেকে। পরিরোপিত মাথাটি যতদিন

* পান করার পর সমস্ত পানীয় তরল পদার্থ বেরিয়ে যায় কেননা তার খাদ্যনালী বাইরে বের করা ছিল। — সম্পাঃ

** মস্তিষ্কের বায়োইলেকট্রিক কারেণ্ট লিপিবদ্ধ করা হয় র. বাউমানের নেতৃত্বে (জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক)। — সম্পাঃ

বেঁচে ছিল ততদিন পর্যন্ত তা চমৎকার অবস্থায় ছিল। অপারেশনের পর প্রথম কদিন ধরে সেলাই করা চামড়ার ধারগুলি কিছুটা ফুলেছিল বটে কিন্তু তারপর সেই ফোলা একেবারে কমে যায়। দেহার্ধের সামনের পাদুটো কিন্তু একদিনের তরেও ফোলেনি। কুকুরছানা তার সামনের পাদুটো অনায়াসে নাড়াচাড়া করত; তার চরিত্রে ও চালচলনে স্বাভাবিক থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায়নি। কুকুরছানাটি সজ্ঞানে চোখ মেলে তাকাত ও আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখত, চমৎকার জল পান করত, কিন্তু সে জল অবশ্য তখনই তার কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেত, কেননা বড় কুকুরের চামড়া ছেঁদা করে তার ভিতর দিয়ে কণ্ঠনালীটিকে বাইরে বের করে রাখা হয়েছিল। অপারেশনের পর কণ্ঠনালীর ধারগুলি বড় কুকুরের চামড়ার সাথে চমৎকার জুড়ে যায়।

পরিরোপিত মাথাটি মরে যাওয়ার ঠিক দুই তিন দিন আগে তার চামড়ার তলাকার টিসু জলে ভারী হয়ে ভীষণভাবে ফুলে যায়। মনে হয় যে সামনের দেহার্ধের যে ভেনটি বড় কুকুরের গলার ভেনের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল, সেই ভেনটি তার চারপাশের নতুন গজান টিসুর চাপে পড়ে সরু হয়ে যাওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটে। কুকুরছানার দেহার্ধটিকে এই অবস্থায় অপারেশন করে কেটে ফেলে দিতে হয়। আশ্রয়দাতা বড় কুকুরটির তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। সে সবসময় সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব জীবনী শক্তি বজায় রাখে। বড় কুকুরের দেহে অন্য জাতের কুকুরছানার সামনের দেহার্ধ পরিরোপণ করা, নতুন জায়গায় জোড়া সেই পরিরোপিত মাথা লেগে গিয়ে তার একমাস ধরে বেঁচে থাকা — এই সমস্তই যে বিজ্ঞানের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীদের ধারণা যে এক দেহের টিসু বা দেহাংশ, যদি একই জাতের কিন্তু অন্য প্রাণীর দেহে পরিরোপণ করা যায় তাহলে ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়ে সে টিসু বা দেহাংশ মরে যাবেই। এই প্রতিক্রিয়াকে বলে বায়োলজিক্যাল অমিলের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এখনই আমরা কী দেখলাম? আমাদের এক্সপেরিমেণ্টে মাথা ও সামনের দুই পা যুক্ত কুকুরছানার সামনের দেহার্ধ ২৯ দিন ধরে স্বাভাবিক অবস্থায় চমৎকার বেঁচে রইল। সত্যিই যদি কোন প্রতিক্রিয়া হত তাহলে কুকুরছানার কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমে নিশ্চয়ই তার ছাপ পড়ত। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র আভাসও কি পাওয়া গেছে? না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক থেকে মাথা ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার এক্সপেরিমেণ্টগুলির যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সাথে সাথে সামনের দেহার্ধে চামড়া, সামনের দুটো পা, থাইরয়ড ও প্যারাথাইরয়ড গ্ল্যাণ্ড, হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus), পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড, মাংসপেশী, প্রভৃতি যে সব দেহাংশ ও টিসু থাকে — তাদের পরদেহে জুড়ে যাওয়ার ক্ষমতা বিচারের দিক থেকেও (যা আজকাল খুবই যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা হচ্ছে), এই এক্সপেরিমেণ্টের ব্যবহারিক মূল্য অতুলনীয়।

আমরা মনে করি যে মাথা পরিরোপণের এই সব এক্সপেরিমেণ্ট মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের মূল্যবান উপায় হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি আমরা এইসব এক্সপেরিমেণ্টের সাথে পাভলভের উপায়ে কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স পরীক্ষা করি ও এনসেফালোগ্রাফি করে, জুড়ে দেওয়া মাথার মস্তিষ্ক কর্টেক্সের বায়োইলেকট্রিক কর্মতৎপরতা অধ্যয়ন করি।

পরিরোপণ করা টিস্যু ও দেহাংশগুলির অবস্থা ও পরদেহে তাদের জুড়ে যাওয়ার ক্ষমতা গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্যই আমরা কুকুরের গায়ে কুকুরের সামনের ও পেছনের দেহার্ধ পরিরোপণের এক্সপেরিমেণ্ট করি। প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি সম্ভব নয়, কিন্তু পরে দেখা গেল, তা যে শুধু সম্ভব তাই নয় এর যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক মূল্যও রয়েছে।

আমরা যখন প্রমাণ পেলাম যে এক কুকুরের গায়ে সংযুক্ত হয়ে অন্য কুকুরের সামনের বা পিছনের দেহার্ধ বাঁচতে পারে — তখন এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখার চেষ্টা করা হল যে এক কুকুরের জীবন-ক্রিয়ার সাহায্যে অন্য একটা গোটা কুকুর বেঁচে থাকতে পারে কিনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অপারেশন করে একটি কম বয়সী ছোট কুকুরের মূল রক্তের শিরাগুলি এক বড় কুকুরের দেহের মূলে রক্তের শিরাগুলির সাথে সেলাই করে যুক্ত করে দিই। শিরাগুলিকে এমন ভাবে পরস্পর সংযুক্ত করা হয় যাতে করে বড় কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস একইসঙ্গে দুই দেহে রক্তপ্রবাহ ও অক্সিজেন যোগানর কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এমনি করে ছোট কুকুরটি যার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কেটে বের করে নেওয়া হয়েছিল সে বড় কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের জোরে বেঁচে থাকে। অপারেশনের পর দিন এনেস্থেসিয়ার ঘোর কেটে গেলে একই রক্তপ্রবাহে যুক্ত কুকুর দুটি জেগে ওঠে। তারা যে উভয়েই বেঁচে আছে তার সমস্ত লক্ষণ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে বড় কুকুরের মুখের সামনে খাবার ধরলে, খাবার দেওয়ার সাথে সাথে বড় কুকুরটি সেই খাবার চাটতে থাকে, এবং বাচ্চা কুকুরটিও যে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তারও লক্ষণ পাওয়া যায়।

এই এক্সপেরিমেণ্ট প্রমাণ করে যে এক প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সাহায্যে দুই প্রাণীর অনায়াসে বেঁচে থাকা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ই. প. পাভলভের কথা স্মরণ করা যায়। পাভলভ লিখেছিলেন যে দেহে মূত্রাশয় প্রভৃতি এমন বহু অঙ্গ আছে যারা দরকার হলে নিজের কাজ দশগুণ জোরদার করতে পারে। কে না জানে যে অসুখের জন্য সার্জেন এক ফুসফুস বা এক মূত্রাশয় কেটে বাদ দিলেও, রয়ে যাওয়া অন্য ফুসফুস বা অন্য মূত্রাশয়ের সাহায্যে মানুষ বেঁচে থাকে।

এখন আমরা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব যে ক্রশ রক্তপ্রবাহ যুক্ত যে অভাবনীয় অপারেশনের কথা বলা হল তার ব্যবহারিক তাৎপর্য কোথায়। আমরা যখন এই এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করি প্রায় একই সময় একটি বিদেশী ডাক্তারী মাসিক পত্রে একটি চমৎকার প্রবন্ধে বাবার শরীরের

সঙ্গে ক্রশ রক্তপ্রবাহে সংযুক্ত শিশুর হৃৎপিণ্ডের উপর খুবই কঠিন এক অপারেশনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশনের সময় শিশুর দেহে যাতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত না হয় তারই জন্য সার্জেন শিশুর হৃৎপিণ্ডে হাত দেওয়ার আগে তার বড় বড় রক্তের শিরা বাবার ফিমোরাল আর্টারি ও ফিমোরাল ভেনের সাথে যুক্ত করেন। শিশুর হৃৎপিণ্ডকে তখন রক্তপ্রবাহের চক্র থেকে সাময়িকভাবে বাদ দিয়ে তার উপর অপারেশন করা হয়। সে সময় তার শরীরে রক্তপ্রবাহ ও শ্বাসের কাজ চলতে থাকে তার বাবার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মারফৎ। অপারেশন শেষ হলে পর শিশু ও বাবার রক্তের শিরা সংযুক্ত অবস্থা থেকে আবার আলাদা করা হয়।

দেখা যাচ্ছে এই কেসে ক্রশ রক্তপ্রবাহ চলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য।

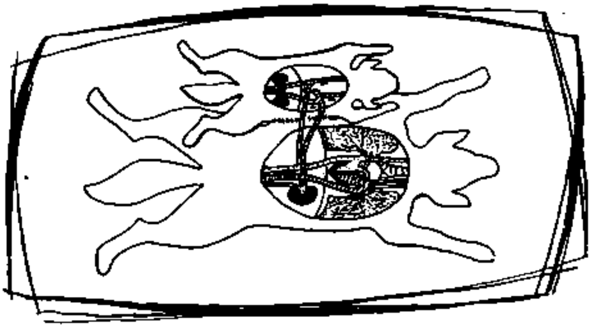

ক্রশ রক্তপ্রবাহের মূল নক্সা।

কিন্তু আমাদের নিজস্ব এক্সপেরিমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল এই যে এমন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যাতে এক আধ ঘণ্টা নয়, সাপ্তাহিক বা মাসিক কাল বা দরকার হলে আরও বেশী দিন ধরে ক্রশ রক্তপ্রবাহ চালান যায়।

ধরা যাক যে এক হাসপাতালে একই সঙ্গে দুই মুমূর্ষু রোগী ভর্তি হল। একজনের ভাল হওয়ার কোন আশা নেই এই রকম পেটের জখম (যকৃৎ, মূত্রাশয় বা পাকস্থলীর থেঁৎলান জখম), আর অন্য জনের মারাত্মক বুকের জখম (হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস থেঁৎলে গেছে)। এমন রোগীদের আজও পর্যন্ত কিছুতেই বাঁচান যায় না। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে যদি সময়মত ক্রশ রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করা যেত (অবশ্য দুজনের রক্তের গ্রুপ এক হওয়া চাই) তাহলে হয়ত ওদের ঢের বেশী সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যেত। প্রথম রোগীর অনাহত বুকের ভিতরকার অঙ্গগুলি চালিয়ে যেত একই সঙ্গে দুই দেহের রক্তপ্রবাহ ও শ্বাসের কাজ আর দ্বিতীয় রোগীর

অনাহত পেটের অঙ্গগুলি চালিয়ে যেত দুই দেহের পুষ্টি ও দুজনের শরীরের ক্লেদ নিষ্কাশনের কাজ।

সর্বদিক থেকে বেশ ভাল রকম প্রস্তুতি করা হলে এরকম অপারেশন করা নেহাৎ অসম্ভব নয়; বিশেষ টিউবের সাহায্যে দুই রোগীর এওর্টা ও ভেনা কেভা একত্র সংযুক্ত করতে পারলেই হল। প্লাস্টমাসের সেই রকম টিউব এখন রক্তের শিরার অস্ত্রচিকিৎসায় খুবই প্রচলিত হয়েছে। দুই রোগীকে সংযুক্ত করার জন্য ২—৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা টিউব ব্যবহার করা চলে এবং সেই টিউবের উপর ধাতব খোলসও ব্যবহার করা চলে যদি তা সহজে বাঁকান যায় ও সেই ধাতব খোলস প্লাস্টমাসের টিউবকে ঢেকে চেপটে না দেয়। ক্রশ রক্তপ্রবাহে যুক্ত রোগীদের মধ্যে যদি ২—৩ মিটার ব্যবধান সৃষ্টি করা যায় তাহলে পর তাদের ত দুই পাশাপাশি ঘরে রাখাও সম্ভব! এই অবস্থায় যদি জখম হওয়া দেহাঙ্গের জায়গায় অন্য দেহ থেকে নেওয়া নতুন দেহাংশ বসিয়ে দেওয়া যায়, ও তা যদি রোগীর দেহে ভালভাবে জুড়ে যায়, তাহলে তারপর ক্রশ রক্তপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তাও সেইখানেই শেষ হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা যদি তাদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে উদ্দীপনা সহকারে একত্র চেষ্টা করেন তাহলে হয়ত ভবিষ্যতে অনুরূপ অপারেশন কার্যত সম্পন্ন করে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে।

দুই কুকুরের মধ্যে এক কুকুরের জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বাদ দিয়ে তাদেরকে ক্রশ রক্তপ্রবাহে যুক্ত করার অপারেশনের কথা আমরা আগেই বলেছি, তারপর আমরা কারো কোন অঙ্গ বাদ না দিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য দুই কুকুরের মধ্যে ক্রশ রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যত কম জখম করে ক্রশ রক্তপ্রবাহ করান সম্ভব তাই আমরা করি।

মোটা আর্টারির সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত ঐ রকম এক জোড়া কুকুর আমাদের এক্সপেরিমেণ্টে ১০ দিন ধরে বেঁচে ছিল। সময়ের দিক থেকে দশটা দিন তেমন একটা বেশী সময় না হলেও ঐ সময়ের মধ্যে আমরা এক অতি মূল্যবান জিনিস লক্ষ্য করি। অপারেশনের আগে ঐ দুই কুকুরের মধ্যে যে রক্তের গ্রুপে অমিল ছিল তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে কুকুরদের মধ্যে রক্তের গ্রুপের অমিল সাধারণত খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ক্রশ রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করার পর তাদের রক্তের গ্রুপ গত অমিল দূর হয়ে যায়। কুকুর দুটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত অপারেশনের জখমের ফলে রক্তের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে মরে যায়*, কিন্তু তাহলেও সন্দেহের কোন অবকাশ না রেখে এই এক্সপেরিমেণ্ট আমাদের সেই ধারণাই সপ্রমাণ করে যে পরস্পর ক্রশ রক্তপ্রবাহে সংযুক্ত দুই জন্তুর টিস্যু ও রক্তে আগে গ্রুপগত অমিল থাকলেও কয়েক দিনের মধ্যে তা অন্তর্হিত হওয়া

* ইদানীং ক্রশ রক্তপ্রবাহের যে সব এক্সপেরিমেণ্ট আমরা করেছি তাতে ক্রশ রক্তপ্রবাহের স্কিম ও সে সময় পশুদের বেঁধে রাখার উপায়টি অনেক পরিমাণে উন্নত করা গেছে তাতে করে অপারেশনের পর রক্ত জমে গিয়ে রক্তের শিরা বন্ধ হওয়ার ভয়টাও অনেক পরিমাণে কমেছে। — সম্পাঃ

সম্ভব। বিজ্ঞানীদের বেশীর ভাগ অবশ্য এখনও মনে করেন যে এক দেহ থেকে অন্য দেহে টিস্যু বা দেহাংশ ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করার পর সেখানে তার জুড়ে যাওয়ায় প্রধান বাধা সৃষ্টি করে দেহ দুটির রক্ত ও টিস্যুর গ্রুপগত অমিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৩৮ সালে সম্পন্ন করা বিদেশী বিজ্ঞানী জ. স্ভিণ্ডের এক এক্সপেরিমেণ্টের কথা। তিনি তাতে দেখান কেমন করে ধেড়ে ইঁদুরের মধ্যে পা ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা যায়। দুই ধেড়ে ইঁদুর নিয়ে তিনি প্রথমে তাদের পেছনের ঠ্যাং যথাক্রমে পরস্পরের সাথে সেলাই করে জুড়ে দেন। এই অবস্থায় ৯ দিন থাকার পর ঠ্যাংগুলির চামড়া ও মাংসপেশী পরস্পর পরস্পরের সাথে শক্ত হয়ে জুড়ে যায়। তারপর তিনি আস্তে আস্তে একটির ঠ্যাং কেটে অপরটির গায়ে জুড়ে দিয়ে ঠ্যাং পরিবদল করেন। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী আ. গ. লাপচিনস্কির এক্সপেরিমেণ্টে স্ভিণ্ডের পাওয়া ফল সমর্থিত হয়। পরিবদল করা ঠ্যাং নিয়ে তার এক্সপেরিমেণ্টের ধেড়ে ইঁদুর দুটি এক বছরের উপর অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচেছিল।

স্ভিণ্ড বা লাপচিনস্কির কেউই তাদের এক্সপেরিমেণ্টে ধেড়ে ইঁদুরের রক্তের শিরা পরস্পর সেলাই করেননি, কেননা ধেড়ে ইঁদুরের পায়ের শিরাগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তা পরস্পরের সাথে জুড়ে দেওয়া অসম্ভব। প্রথমে ঠ্যাং দুটোকে যেখানে পরস্পরের সাথে সেলাই করে যুক্ত করা হয় সেখানে পরস্পরের দেহ থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তের শিরা জন্মে যায়। বড় বড় জন্তু বা মানুষের ক্ষেত্রে নতুন জন্মান এই রকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তের শিরা পরিরোপিত অঙ্গের পুষ্টি চালাতে পারে না বলে স্ভিণ্ডের উপায়ে ঠ্যাং ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা কেবল মাত্র ছোট ছোট প্রাণীর মধ্যেই সম্ভব হয়। বড় বড় জন্তু বা মানুষের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে জুড়ে দেওয়ার পর দেহাংশ পরিবদল করতে হলে শুধু পরস্পরের চামড়া সেলাই করলেই চলে না সেই সব দেহাঙ্গের পুষ্টির জন্য তার পুষ্টিবাহক মূল রক্তের শিরাগুলিকেও পরস্পর সেলাই করে যুক্ত করতে হয়।

বিভিন্ন দেহাঙ্গ পরিরোপণ. গোটা দেহ বা তার অংশ ট্রান্সপ্ল্যাণ্টেশনের যে সব এক্সপেরিমেণ্ট আমরা আজ পর্যন্ত করেছি বা অন্যত্র অন্যান্য বিজ্ঞানীরা করেছেন তার ফলাফল মিলিয়ে দেখে আমরা এই উপসংহারে পোঁছেছি যে বড় বড় দেহাংশ পরিরোপণে কখনই টিস্যুর অমিল বা ইনকম্প্যাটিবিলিটি জনিত প্রতিক্রিয়া হয় না।

বিজ্ঞানে ইমিউনলজিক্যাল প্যারালিসিস বলে একটা কথা আছে। কথাটির অর্থ এই যে, শরীরে সামান্য পরিমাণ অন্য জাতের প্রোটীন প্রবেশ করালে তাতে করে দেহের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় সেই ভিন্ন জাতের প্রোটীন প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে যে সেই প্রতিক্রিয়া তখন অন্তর্হিত হয়। মনে হয় দেহের ইমিউনলজিক্যাল প্রতিক্রিয়ার শক্তি যেন 'অবশ হয়ে গেছে'।

চামড়া পরিরোপণের ব্যাপারেও বোধ হয় এই নিয়মটিই কাজ করে। ছোট এক টুকরো চামড়া পরিরোপণ করলে তা সহজেই ঝরে যায়, কিন্তু ঐ একই উপায়ে অথচ বড় এক খন্ড চামড়া যদি পরিরোপণ করা হয় তাহলে ঠিক বিপরীত, সহজেই তা জুড়ে যায়। অর্থাৎ তখন খারাপ প্রতিক্রিয়া হওয়া বন্ধ হয় বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শক্তি অবশ হয়ে যায় (ইয়ে. আ. জতভ, ম. ই. ইয়েফিমভ প্রভৃতি অন্যান্য অনেকে এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে এই তথ্যটিকে প্রমাণ করেছেন)।

উপরে যা বলা হল তার থেকে বেরিয়ে আসে যে একই বায়োলজিক্যাল শ্রেণীভুক্ত জীবের মধ্যে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সফলভাবে দেহাংশ পরিরোপণ করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য:

১। রক্ত তথা টিস্যুর গ্রুপগত চরিত্র বিচার করেই পরিরোপণের জন্য কার দেহ থেকে দেহাঙ্গ নেওয়া হবে তা বাছাই করা উচিত।

২। যে দেহাংশ ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা হবে তার পুষ্টিবাহক মূল রক্তের শিরাগুলিকে খুবই যত্ন সহকারে আশ্রয়দাতার রক্তের শিরার সাথে সেলাই করা দরকার যাতে করে শিরার সংযোগস্থলে যতদূর সম্ভব থ্রম্বোসিস হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায়। তাছাড়াও, অপারেশনের সময় ইনফেকশন যাতে না হতে পারে তার জন্য সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে যার দেহাংশ নেওয়া হচ্ছে ও যার দেহে তা পরিরোপণ করা হচ্ছে এই দুই-এর মধ্যে আগে সাময়িক ক্রশ রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করে তাদের রক্ত, টিস্যু ও দেহাংশের বায়োকেমিক্যাল সমতা সৃষ্টি করতে পারলে ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট সহজে জুড়ে যায়।

এই কয়েকটি নিয়ম পালন করলে কার্যত শুধু জন্তুর মধ্যে নয় মানুষের দেহেও দেহাংশ পরিরোপণ করা সম্ভব হবে। প্রশ্ন শুধু এই, কোথা থেকেই বা মানুষের দেহাংশ যোগাড় করা এবং কেমন করেই বা মানুষে ক্রশ রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করা?

মৃতদেহ থেকে নেওয়া দেহাংশের সজীবকরণ

১৯০৩ সালে রুশ বিজ্ঞানী আ. আ. কুলিয়াবকো হৃৎপিন্ডের পুষ্টিবহনকারী শিরায় মধ্যে রক্তের মতই এক প্রকারের পুষ্টিকর তরল পদার্থ সঞ্চালন করিয়ে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিন্ড সজীব করতে সমর্থ হন। এই হৃৎপিন্ডটিকে কেটে নেওয়া হয়েছিল একটি শিশুর মৃতদেহ থেকে তার মৃত্যুর ২০ ঘণ্টা পর।

কিছুদিন হল প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী স. ভ. আন্দ্রেয়েভ এমনকি মৃত্যুর ৪ দিন পরও এক মৃতের হৃৎপিন্ড সজীব করতে সমর্থ হয়েছেন। এতদিন পর অবশ্য তখনই হৃৎপিন্ড

সজীব করা সম্ভব হয় যদি সেই মৃতদেহ বা মৃতদেহ থেকে কেটে নেওয়া হৃৎপিন্ডটিকে ঠান্ডার মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়। ঠান্ডা টিস্যুতে যেমন পচন ধরা বন্ধ করে তেমনি তার পূর্ণ মৃত্যুর পথেও বাধা সৃষ্টি করে।

ফ. আ. আন্দ্রেয়েভ, স. স. ব্রুখোনেঙ্কো, ন. ভ. ইয়ানকভস্কি, ভ. আ. নেগভস্কি প্রভৃতি প্রমাণ করেন যে মৃত্যু হওয়ার সামান্য পরে শুধু যে মৃতের হৃৎপিন্ড পুনরুজ্জীবিত করা যায় তাই নয়; এক এক সময় মৃতের গোটা দেহকেও সজীব করে তোলা সম্ভব হয়। এঁরা প্রমাণ করে দেখান যে, মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টা থেকে গোটা কয়েক দিন পেরিয়ে গেলে পরেও কেবল মাত্র মস্তিষ্ক ছাড়া মানুষের দেহের অন্য সমস্ত দেহাংশ পুনরুজ্জীবিত করা যায়। ভ. আ. নেগভস্কির হিসাবে মস্তিষ্ক বা বিশেষ করে তার উচ্চতম অংশ মস্তিষ্ক কর্টেক্সকে মৃত্যুর মাত্র প্রথম ৫—৬ মিনিটের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। স. স. ব্রুখোনেঙ্কো ও ন. ভ. ইয়ানকভস্কির মতে তা হল ১৫ থেকে ৫০ মিনিট। সে যাই হোক আজ পর্যন্ত কী মানুষে কী জন্তুর মধ্যে, কারোরই মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর মস্তিষ্ক পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। অন্য দিকে মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর একমাত্র মস্তিষ্ক ছাড়া মানুষের অন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পুনরুজ্জীবিত করা গেছে।

এখন তাই মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে তার প্রচেষ্টা শুরু করা হয় মৃত্যুর প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে, মস্তিষ্ক কর্টেক্সে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হওয়ার আগে। কিন্তু মৃত্যুর পর প্রথম ১০ মিনিট পার হয়ে গেলে মানুষকে যদি বাঁচানর চেষ্টা করা হয় তাহলে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের ফাংশন আর ফেরে না, মানুষের ধড়টিকে শুধু সজীব করে তোলা যায়। অর্থাৎ কেবল মাত্র মস্তিষ্কের উচ্চতম অংশ ছাড়া শরীরের সমস্ত অংশ ও অঙ্গ পুনরুজ্জীবিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, তিন জন বিদেশী চিকিৎসকের লেখা একটি বাস্তব কেসের কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। তাঁরা ৩২ বছর বয়স্ক একজন স্ত্রীলোকের উপর অপারেশন করেন।

অপারেশনের শেষাশেষি রোগিনীর হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা চলে প্রায় ১০ থেকে ১১ মিনিট, তার কম নয়। তারপর তার হৃৎপিন্ডের কাজ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় ও গোটা দেহ তাতে পুনরুজ্জীবিত হয়। কিন্তু তাহলেও কি হবে? মস্তিষ্ক কর্টেক্সে তখন তার অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। দেহ পুনরুজ্জীবনের পরও স্ত্রীলোকটির মুখের চেহারা যেন মুখোস পরা, নিশ্চল, পরিবর্তনবিহীন; দৃষ্টিশক্তি নেই; শ্রবণশক্তি নেই; পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি কোন প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন নেই; ঘোর অজ্ঞান অবস্থা এবং তা কেটে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই; নিজে নিজে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ানোর সমস্ত ক্ষমতা অন্তর্হিত। হৃৎপিন্ডের কাজ ফিরে আসার ২৩ দিন পরেও ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফি করে দেখা যায় যে মস্তিষ্ক কর্টেক্সের ফাংশন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে বায়োলজিক্যাল কারেন্ট রেকর্ড করা যাচ্ছে না।

২৬ দিনের দিন ফুসফুস ও মূত্রাশয়ে ইনফ্লামেশন হয়ে অজ্ঞান অবস্থাতেই রোগিনীর মৃত্যু হয়। যদি ইনফ্লামেশন হওয়া রোধ করা যেত তাহলে পর মস্তিষ্কের ফাংশন বিহীন স্ত্রীলোকটির পুনরুজ্জীবিত দেহ হয়ত আরও বহুদিন ধরে বাঁচিয়ে রাখা যেত।

এই কেসেতেও মস্তিষ্কের দুই একটি অংশের কাজ পুনরুদ্ধারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। যথা রোগিনীর স্বতঃপ্রবৃত্ত নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে এসেছিল। মৃত্যু অবস্থা আরও দীর্ঘস্থায়ী হলে পুনরুজ্জীবনের পর নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতাও আর ফেরে না। তখন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে তালে তালে বুক ফুলিয়ে নিশ্বাসের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে তেমনি অন্যান্য দেশেও এই রকম যন্ত্র এখন তৈরী হয়েছে। যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস প্রথম তৈরী করেন স. স. ব্রুখোনেঙ্কো বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এই চমকপ্রদ যন্ত্রটির সাহায্যে যেমন পৃথক পৃথক দেহাংশের কাজ ফিরিয়ে আনা যায় তেমনি গোটা দেহকেও পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব।

১৯৩৮ সালে ছাত্র অবস্থায় আমি নিজেও সহজে বহন করা যায় এমন একটি 'যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড' তৈরী করি। সেই যন্ত্রটিকে আমরা কেটে বাদ দেওয়া কুকুরের হৃৎপিণ্ডের জায়গায় বসিয়ে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত কুকুরটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হই।

এরপর যে সব এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে ও বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সাহায্যে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহাংশের বদলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে সব কার্যকরী যন্ত্র তৈরী হয়েছে তার থেকে মনে হয়, যে আজ এমন 'যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড' তৈরী করা সম্ভব যার সাহায্যে মানুষ শুধু এক আধ ঘণ্টা নয়, নিজস্ব হৃৎপিণ্ড ছাড়া কয়েক সপ্তাহ বা মাসখানেক ধরে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে (হৃৎপিণ্ডের উপর অপারেশন করতে এখন ঘণ্টাখানেক ধরে তার কাজ বন্ধ করে রাখা হয়)।

যে সব কেসে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার পর দেখা যায় যে তার মস্তিষ্কের কাজ ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই, ভবিষ্যতে সেই সব পুনরুজ্জীবিত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার সার্থকতা দেখা দেবে এই দিক থেকে, যে তার দেহ থেকে নেওয়া দেহাংশ ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করে বা তার দেহের সাথে ক্রশ রক্তপ্রবাহে যুক্ত করে অন্য মানুষের জীবন উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে আমরা করোনারি আর্টারির উপর প্লাস্টিক অপারেশনের এমন এক নতুন উপায় বের করেছি যা হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব শিরার স্ক্লেরোসিসে কাজে লাগান যেতে পারে। সে রকম অপারেশন এখনও পর্যন্ত শুধু কুকুরের উপরই করা হয়েছে। অপারেশনটির মর্ম আর কিছুই নয় হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত কোন আর্টারি নিয়ে তাকে যে জায়গায় করোনারি আর্টারি সরু হয়ে গেছে তার ঠিক নীচে সেলাই করে যুক্ত করে দেওয়া। এই জটিল অপারেশনে যাতে জীবনের কোন ভয় না থাকে এবং রুগ্ন হৃৎপিণ্ড যুক্ত মানুষের উপরও যাতে তা করা যায়,

মনে হয়, তার জন্য ভবিষ্যতে অনুরূপ অপারেশনের সময় রোগীর দেহের সাথে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিহীন মানুষের, পুনরুজ্জীবিত হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস যুক্ত করার সার্থকতা আছে। এতে করে যদি কোন রকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না দেখা দেয় তাহলে পর প্রয়োজন বোধে এমনও করা যেতে পারে যে, রোগীর বুকে, তার নিজস্ব হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের পরিবর্তে সেই পুনরুজ্জীবিতের হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস বসিয়ে দেওয়া হল।

মনে হয় দেহের অঙ্গ পরিবদলের আরও নতুন নতুন উপায় বেরোবে৷ এ ব্যাপারে আ. গ. লাপচিনস্কির এক্সপেরিমেণ্ট খুবই আশার সঞ্চার করে। তিনি কুকুরছানার দাঁতের অঙ্কুর বসিয়ে বৃদ্ধ কুকুরের চোয়ালে নতুন দাঁত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

এই প্রবন্ধে আমরা কতগুলি সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা উল্লেখ করলাম। উল্লেখ করলাম যে সেই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরা কী ভাবছি ও কী ভাবে তা কাজে লাগাতে চাই। উপসংহারে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি ই. প. পাভলভের কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করছি; তিনি বলেন, 'ন্যাচারাল সায়েন্স হল সুললিত লজিক যাতে মানুষের সঠিক চিন্তা বাস্তব কাজে সর্বদা এমন ভাবে প্রমাণিত হয় যে তার থেকে বের করা যায় তার সত্যসিদ্ধ মূল সূত্র যাতে সন্দেহ বা ভুলের অবকাশ নেই।'

ম. প. চুমাকভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের
চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর
পূর্ণ সদস্য
ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

পলিওমাইয়েলাইটিস বিজিত

বাচ্চা পেতিয়ার হঠাৎ অসুখ হল। সকালেও ওকে কী চমৎকার আনন্দ ও ফুর্তি করতে দেখা গেছে কিন্তু কিছু বেলা বাড়লে ও কেমন যেন ঝিমিয়ে মিহিয়ে পড়ল। সামান্য সর্দি, কাশি ও জ্বর থেকে মনে হল যে ঠান্ডা লেগেই ওর এমনটা হয়েছে, অথচ বমি দেখে মন হল পেটটাই হয়ত খারাপ। দুর্বলতা ও নিঝুম ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন যেন মাঝে মাঝে ওর একটা উত্তেজনার ভাব দেখা দিচ্ছিল, জোর আওয়াজ বা উজ্জ্বল আলোতে ছেলেটি বিরক্ত হচ্ছিল, এক এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ও বাবা মাকেও চিনতে পারছিল না।

খুব বাচ্চা কিনা তাই ওর পক্ষে বলাও সম্ভব নয় যে ওর কী হয়েছে। এমনকি ওর যে মাথা ধরেছে সে কথাও ও বলে বোঝাতে পারছিল না। কম্বল বা গায়ের জামা বদল করতে গিয়ে বাবা মাই প্রথম লক্ষ্য করলেন যে শিশুর গায়ে ছোঁয়া লাগলে ওর যেন তা সহ্য হচ্ছে না, একটুতে বিরক্ত হচ্ছে কান্নাকাটি করছে।

এইভাবেই চলল কয়েকটা দিন, তারপর মনে হল যেন অসুখটা কমে আসছে। জ্বর কমে গেল, খিদে বাড়ল, ঘুমের উন্নতি হল, কিন্তু হঠাৎ বাবা লক্ষ্য করলেন যে শিশু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারছে না। তখন ওঁরা বুঝলেন যে শিশুর অসুখটা সামান্য সর্দি বা টনসিলের জ্বর নয় তার চেয়ে ঢের কঠিন অসুখ। ডাক্তার এসেও তাই বললেন, বললেন শিশুর ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস বা পলিওমাইয়েলাইটিস হয়েছে।

দুঃখের ছায়া নেমে এল তাদের পরিবারে, যে সব মাংসপেশী অবশ হয়ে গেছে তাদের আংশিকভাবে সচল করতেও হয়ত এখন মাসের পর মাস বছরের পর বছর লেগে যাবে। নিজ পায়ে দাঁড়াতে হলে দরকার হবে অধ্যবসায়ের সাথে দীর্ঘ চিকিৎসা, তাও হয়ত আবার তারই জন্য দরকার হবে স্প্লিন্ট বা বিশেষ অর্থোপেডিক জুতো।

এ ত হল একটা কেস। আরও একটা কেসের কথা বলছি। ১৯ বছরের ছাত্র সাশা ন. ছুটিতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ওর স্বাস্থ্য ও শক্তির

বেশ উন্নতি হয়েছিল, রোদে পুড়ে চামড়া তামাটে হয়ে বেশ দেখাচ্ছিল ওকে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার ঠিক আগে শরীরটা কেমন যেন ওর খারাপ লাগছিল, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে শরীরটা আরও খারাপ হয়ে পড়ল তাই ছাত্রটিকে ট্রেন থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালে যখন পৌঁছল তখন ওর হাত ও পা অবশ হয়ে গেছে। সেখানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া চালান হয়েছিল বলেই তখন কোন প্রকারে ওর জীবন রক্ষা পায়।

সাশারও কিন্তু ঐ একই রোগ পলিওমাইয়েলাইটিস। সবে হাঁটতে শুরু করা শিশুর কেসে যে রোগ তার পাদুটো অবশ করে ফেলে সে রোগ শক্তিমান ফুটন্ত যৌবন অল্পবয়স্ক ছাত্রটিকেও আঘাত করতে ছাড়ল না।

শিশু বা বয়স্ক সকলকেই যে রোগ আক্রমণ করে সেই পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের বিশেষত্ব কী?

পলিওমাইয়েলাইটিসের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, স্পাইন্যাল কর্ডের যে সব কোষ মাংসপেশীর পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরই তা আক্রমণ করে; এই সব কোষ স্পাইন্যাল কর্ডের ধূসর পদার্থে থাকে বলেই এই রোগের নাম হয়েছে পলিওমাইয়েলাইটিস (গ্রীক ভাষায় 'পলিওস' মানে হল ধূসর আর মাইয়েলস মানে হল স্পাইন্যাল কর্ড)।

পলিওমাইয়েলাইটিস রোগে নানা রকম উপসর্গ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলেও মোটামুটি এই রোগকে তিনটি ফর্মে তফাৎ করা যায়: প্যারালিটিক ফর্ম (যাতে অঙ্গ অবশ হয়ে যায়), ননপ্যারালিটিক ফর্ম (যাতে অঙ্গ অবশ হয় না) ও এবর্টিভ ফর্ম (উপসর্গবিহীন ফর্ম)।

প্যারালিটিক ফর্মে সর্বদাই মাংসপেশীর প্যারালিসিস হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ হয় পায়ের মাংসপেশী; হাত বা দেহের অন্যান্য মাংসপেশী অবশ হয় অপেক্ষাকৃত কম। এই রোগে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হয় তখন যখন শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার মাংসপেশী অবশ হয়ে দম আটকে মৃত্যু হওয়ার উপক্রম হয়। সে সব কেসে রোগীকে বাঁচাতে জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

আমেরিকায় গিয়ে এক সোভিয়েত চিকিৎসক দল দুজন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাদের কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ার যন্ত্রের সাহায্যে দেড় বছর ধরে নিশ্বাসের কাজ চালিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই বিচার করা যায় কত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই রোগের শ্বাস নেওয়ার কষ্ট। এই রকমই এক যন্ত্র, আমাদের উপরে উল্লিখিত সাশা ন...এর জীবন বাঁচিয়েছিল।

ননপ্যারালিটিক ফর্মে সাধারণ দুর্বলতা ও কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম আক্রান্ত হওয়ার কিছু উপসর্গ পাওয়া যায়। এতে মৃত্যু হয় খুবই কম, কিন্তু এসব কেসে রোগ ধরা শক্ত। এবর্টিভ ফর্মেও ঠিক তেমনি রোগ ধরা খুবই শক্ত এবং তাতে স্পাইন্যাল কর্ড আক্রমণের কোন উপসর্গই পাওয়া যায় না। তার উপসর্গগুলি হুবহু ইনফ্লুয়েঞ্জা, টন্সিল জ্বর বা সর্দি জ্বরের মতো।

কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে রোগ ছড়ানর দিক থেকে প্যারালিটিক ফর্মের তুলনায় হালকা ফর্ম কোন অংশে কম বিপজ্জনক নয়।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ মানুষের সুবিদিত। মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে এই রোগ মিশরে দেখা দিয়েছিল আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে। বিখ্যাত রুশ চিকিৎসক দিয়াদ্‌কভস্কি আজ থেকে একশ বছর আগে প্যারালিসিস যুক্ত শিশু রোগের এক বিবরণ লিখে যান। তার সমস্ত উপসর্গ মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যে সে রোগ ছিল পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ।

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দ্বীপগুলিতে পলিওমাইয়েলাইটিসের সবচেয়ে বড় মহামারী দেখা দেয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ ছড়িয়ে যায় দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে।

গত দশ বছরে দুনিয়ার অনেক দেশে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগটা খুবই বেড়ে গেছে। যেমন ডেনমার্ক, ডেনমার্কের মতো ছোট্ট দেশ, যার লোকসংখ্যা মোট ৪৫ লক্ষ মাত্র সেখানে ১৯৫২ সালে ৫,৭০০ পলিওমাইয়েলাইটিস কেস রেজিস্ট্রিকৃত হয়। সেই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পলিওমাইয়েলাইটিসে ভোগে এইরকম রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে উপরে ওঠে — মোট ৫৭ হাজারেরও বেশী। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালে অর্থাৎ পাঁচ বছরে আমেরিকায় সবশুদ্ধ ১৯৬ হাজার লোক পলিওমাইয়েলাইটিস রোগে ভোগে।

আজ যখন সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই-এ আধুনিক চিকিৎসা বিরাট সাফল্য অর্জন করছে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগটি তখন যেন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নতুন করে লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছে। যখন নানা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে ম্যালেরিয়া নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, শক্তিশালী এণ্টিবায়োটিকের সাহায্যে দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগ সেরে উঠছে, নিউমোনিয়া ও রক্তের ইনফেকশন জনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসছে, ভ্যাকসিনের সাহায্যে নানান সংক্রামক ব্যাধি কমছে, তখন এই সেদিনও পর্যন্ত নতুন নতুন আঘাত হেনে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগটা বেড়েই চলেছিল।

অন্যান্য বহু ইনফেকশনের তুলনায় পলিওমাইয়েলাইটিসের তফাৎ হল এই যে তার উপর এণ্টিবায়োটিক কোন কাজ করে না। রোগীকে পৃথক করে রাখা, তার পরিবেশ ডিসইনফেক্ট

করা বা অন্যান্য সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করা যা সাধারণত অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মহামারী প্রতিরোধে সাহায্য করে, এ ক্ষেত্রে সে সব ব্যবস্থা প্রায় অকেজো। তাছাড়াও, মনে হয় যে এই রোগের ভাইরাসের চরিত্র এখন অনেক বদলেছে, এখন যেন তার বাধা উল্লঙ্ঘনের ক্ষমতা বেড়েছে ও আরও ভীষণ সংক্রামক হয়ে উঠেছে সেই ভাইরাস। বড় বড় ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী ও প্রাপ্তবয়স্ক যাদের মধ্যে আগে এই রোগ দেখাই যেত না তাদের মধ্যে এখন বেশী বেশী করে দেখা দিচ্ছে এই রোগ। আগে পলিওমাইয়েলাইটিস ছিল দুগ্ধপোষ্য শিশুদের রোগ; এখন ৫—৬ বছরের বাচ্চাদের মধ্যেও এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে, এমনকি বড়দের মধ্যেও তা হতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়াও, বড় বাচ্চা বা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই রোগ শিশুদের তুলনায় ঢের বেশী কঠিন আকার ধারণ করে। পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের সবচেয়ে খারাপ পরিণতি প্যারালিসিস হওয়া তাও আজকাল ঢের বেড়ে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে আমাদের দেশ থেকে পলিওমাইয়েলাইটিস উৎখাত কল্পে কী কী করতে হবে সে সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু কী কী উপায় অবলম্বন করে সে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব সে কথা বলার আগে পলিওমাইয়েলাইটিস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিত হয়ে নেওয়া যাক।

পলিওমাইয়েলাইটিস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন জার্মান চিকিৎসক হেইনে ১৮৪০ সালে। তার প্রায় ৭০ বছর পর অস্ট্রিয়ার মাইক্রোবায়োলজিস্ট ল্যাণ্ডস্টেইনার ও পপ্পের ১৯০৯ সালে প্রথম প্রমাণ করেন যে এই রোগের উৎপত্তি হয় ভাইরাস ইনফেকশন থেকে। তাঁরা পলিওমাইয়েলাইটিস রোগে মৃত শিশুর স্পাইন্যাল কর্ড গুঁড়ো করে তার ইমালশন বানরে ইঞ্জেকশন করে বানরের মধ্যে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের উপসর্গ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। সেই এক্সপেরিমেণ্টের ফলেই সম্ভব হয় ল্যাবরেটারিতে পলিওমাইয়েলাইটিসের বীজাণুর চরিত্র অধ্যয়ন করা। তারপর শীগগিরই প্রমাণ হয় যে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের কারণ এক প্রকারের ফিল্টার-পাসিং ভাইরাস যাকে সবচেয়ে জোরাল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেও দেখা যায় না। ফিল্টার-পাসিং শব্দটি থেকেই বোঝা যায় যে, যে বিশেষ ফিল্টারের ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে একটিও ব্যাক্টেরিয়া বেরুতে পারে না, এই রোগের ভাইরাস এতই ক্ষুদ্র যে তা সেই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে সহজেই বেরিয়ে পড়ে। পলিওমাইয়েলাইটিসের ভাইরাস আকারে যে-কোন ব্যাক্টেরিয়ার চেয়ে অনেক ছোট।

কেবলু মাত্র এই সেদিন, ক্ষুদ্র জিনিসকে অভাবনীয়ভাবে বড় করে দেখা যায়, এই রকম ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পলিওমাইয়েলাইটিস ভাইরাসের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। এই দুরারোগ্য রোগের ভাইরাস আকারে এতই ছোট যে তা কল্পনা করা যায় না —

এক মিলিমিটারের মিলিয়ন ভাগের ৮ থেকে ১২ ভাগ মাত্র। মনে হয় আজ পর্যন্ত যে সব ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে এ ভাইরাস তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ৬০° ডিগ্রীর বেশী উত্তাপে বা এমনিতে ফুটিয়ে নিলেই এ ভাইরাস মরে যায়। কিন্তু তার ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা অদ্ভুত, এমনকি সবচেয়ে গভীর শীতেও তারা বেঁচে থাকে। ইথার বা স্পিরিট তাদের নষ্ট করতে পারে না, কিন্তু হালকা ব্লিচিং পাউডার বা পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট সলিউশনেই তারা নির্জীব হয়ে যায়। জলে ও খাবারের উপর অনেক দিন ধরে তারা বেঁচে থাকে। মাখন ও দুধের মধ্যে তারা তিন মাস পর্যন্ত বাঁচে এবং সাধারণ ঘরের ভেতরকার উত্তাপে ও জলের মধ্যে তারা বাঁচে প্রায় ১০০ দিন।

কমপক্ষে অন্তত তিন প্রকারের পলিওমাইয়েলাইটিস ভাইরাস আছে, তাছাড়াও, সোভিয়েত ইউনিয়নে চতুর্থ এক প্রকারের পলিওভাইরাস ধরা পড়েছে যাকে বলা হয় 'কারাগান্দা টাইপ'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ হয় প্রথম টাইপ ভাইরাসের সাহায্যে। কিন্তু তারপরও সে রোগীর তৃতীয় বা চতুর্থ টাইপ ভাইরাসের ইনফেকশন হতে পারে। আবার উল্টোটিও সম্ভব — প্রথমে চতুর্থ টাইপ ভাইরাসের ইনফেকশন হল তারপর অন্যগুলি। যদিও খুবই কদাচিৎ এমন হয়, তাহলেও উপরোক্ত কারণে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব। আজ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে অনুরূপ ৬০টি কেসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৯৪৯ সালে কালচার পদ্ধতির বিরাট উন্নতির ফলে পলিওভাইরাসকে দেহের বাইরে, অর্থাৎ টেস্ট টিউবে বা কাচের স্লাইডের উপর কালচার করে আইসোলেট করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে তা কালচার করা হত দুষ্প্রাপ্য জীবিত মস্তিষ্ক টিস্যুর উপর ও প্রত্যেকটি এক্সপেরিমেন্টের আগে তাকে যাচাই করে নিতে হত বানরে রোগ সংক্রমণ করিয়ে। অর্থাৎ ঐ সব এক্সপেরিমেন্টে যেমন বিরাট কাণ্ড করতে হত তেমনি সময় লাগত। তাছাড়াও, বারে বারে বানরের উপর এক্সপেরিমেন্ট করার মত এত খরচ খুব কম লেবরেটারিই করতে পারত।

বহুদিন ধরে অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করতে করতে আমেরিকান বিজ্ঞানী এণ্ডার্স, ওয়েল্লার ও রবিন্স মস্তিষ্ক কোষ বিবর্জিত মাংসপেশী বা অন্য টিস্যুর উপর সরল কালচারে এই ভাইরাসের দ্রুত বংশবৃদ্ধি করাতে সমর্থ হন। তারপর ঐ বিজ্ঞানীরা টিস্যু কালচারে যে ভাইরাস আছে তা প্রমাণ করে দেখান ঐ টিস্যু নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় ধরে। দেখা যায় যে এখানে সেখানে টিস্যু কালচারের কোষ গলে গেছে। এই তথ্য বেরুবার পরই পলিওভাইরাস নিয়ে গবেষণা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়, কেননা বারে বারে বানরের উপর পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা একেবারে চলে যায়।

গবেষণার টেকনিকের ক্ষেত্রে এই যে অগ্রগতি এর থেকেই শুরু হয় পলিওমাইয়েলাইটিস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ বিকাশের অতি গুরুত্বপূর্ণ, সম্পূর্ণ এক নতুন ধাপ। তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের সামনে এই ইনফেকশনের লেবরেটারি ডাইয়াগ্নোসিস করা,

ইনফেকশন ছড়ানোর সম্বন্ধে অনেক অস্পষ্ট ধারণা যাচাই করা ও সব শেষে এই দুরারোগ্য রোগের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস — রোগ নিবারণের ভ্যাকসিন তৈরী করার প্রশস্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়।

বিজ্ঞানীরা তখন ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ও ভাইরাসের চরিত্র অধ্যয়ন করা ছাড়াও ভাইরাসের ইনফেকশন কী ভাবে ছড়ায় তা নিয়েও খুঁটিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। ধরা পড়ে যে দুই রকম উপায়ে পলিওভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমত, তা ছড়িয়ে পড়ে রোগীর খুব কাছাকাছি থাকার দরুন ড্রপলেট উপায়ে ইনফেকশন হয়ে — অর্থাৎ প্রধানত হাওয়াবাহী ইনফেকশন হয়ে। দেখা গেছে যে এই রোগ শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী ইনফেকশন ছড়ানোর দিক থেকে অপরের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই সময় ভাইরাস থাকে রোগীর গলায়, কাজেই লালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু, কাশির শ্লেষ্মার অণু, শিশুর চোখের জল সবই তখন ভাইরাস বহন করে। এমনকি কথা বলার সময়ও হাওয়ার মধ্য দিয়ে এই ইনফেকশন স্পর্শকাতর অন্য লোকের মধ্যে প্রবেশ করে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ সৃষ্টি করতে পারে। মহামারীর সময় সাধারণত এই রোগ ছড়ায় জ্বোরো রোগীর সান্নিধ্য ও রোগের কেরিয়ারদের (বাহক) সঙ্গে মেলামেশার ফলে। কিন্তু তবু একথা বললে ভুল হবে যে সর্দি ও হামজ্বরের মতই পলিওমাইয়েলাইটিসও অতি সহজেই হাওয়ার মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে। পলিওমায়েলাইটিস ও সব রোগের মতো তত সংক্রামক নয়।

ইনফেকশন ছড়ানোর দ্বিতীয় পথ হল খাদ্যনালীর পথ। মুখের মধ্য দিয়ে ইনফেকশন গিয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্র আক্রমণ করে। কোন কোন কেসে দুধ, জল, না ধোয়া ফল ও অন্যান্য খাবার দাবার বা রোগীর লালা ও মলের সাথে নির্গত ভাইরাস দ্বারা দূষিত বিভিন্ন খেলনা ও অন্যান্য জিনিস অন্য বাচ্চার ইনফেকশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চারা সব জিনিসই মুখে নিতে ভালবাসে, কাজেই এই উপায়ে ইনফেকশনের সম্ভাবনাও খুবই বেশী। রোগীর মলমূত্রের সাথেও ভাইরাস নির্গত হতে পারে। রোগের প্রথম দু সপ্তাহে প্রায় ৭০% রোগীর মলমূত্রে ভাইরাস পাওয়া যায় এবং তাতে বীজাণুর কনসেনট্রেশনও খুবই গাঢ়। বানরের উপর এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে তাদের এক গ্রাম মলের মধ্যে এক মিলিয়ন পর্যন্ত ভাইরাসের অণু নির্গত হয়।

এই প্রসঙ্গে এক উদাহরণ দিচ্ছি কী করে মস্কোর শহরতলির এক কিণ্ডারগার্টেনে পলিওমাইয়েলাইটিস ছড়ায়। একদিন একটি জঞ্জালপূর্ণ গর্তের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি বেড়ালছানা পড়ে যায়, বেড়ালটি তখন চেষ্টা করে করে ছানাগুলিকে গর্ত থেকে টেনে তোলে। কিণ্ডারগার্টেনের শিশুরা ভিজে বেড়ালবাচ্চাগুলিকে দেখে ছুটে এসে হাতে তুলে নিয়ে তাদের আদর করতে থাকে। পরে এর কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যায় কয়েকটি শিশুর পলিওমাইয়েলাইটিস হয়েছে।

এরকম ঘটনাও কম নয় যে কিন্ডারগার্টেনে বা শিশু লালনাগারে একটু শরীর খারাপ নিয়ে কোন একটি শিশু এল। কেন্দ্রের সেখানকার শিক্ষয়িত্রী শিশুটিকে অন্য সকলের কাছ থেকে পৃথক করে রাখার পরিবর্তে সবার সাথেই মিশতে দিলেন, তারপর যখন দেখা গেল যে সেই শিশুর প্যারালিসিস হয়েছে তখন ধরা পড়ল রোগটি পলিওমাইয়েলাইটিস। এদিকে তখন অন্যান্য স্পর্শকাতর শিশুর মধ্যেও ইনফেকশন ছড়িয়ে গেছে। একজনকে পৃথক করার পরিবর্তে তখন পৃথক করে রাখতে হল সকলকে এবং প্যারালিসিস যাতে রোধ করা যায় তার জন্য সকলকেই গামাগ্লোবিউলিন ইঞ্জেকশন দিতে হল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পলিওমাইয়েলাইটিসের বিরুদ্ধে লড়তে হলে বিশেষভাবে সচেতন থাকা দরকার। অনেক সময় পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ অন্যান্য সহজ রোগের উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয় এবং কয়েকটা দিন না গেলে কিছুতেই তার আসল রূপ ধরা পড়ে না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে শিশুর সমস্ত রোগেই পলিওমাইয়েলাইটিস সন্দেহ করতে হবে। কিন্তু তাহলেও শিশুর প্রত্যেক অসুখেই সময়মত তাকে ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে তার উপদেশমতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাতে তার রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

মনে রাখা দরকার যে শিশু বয়সে যত ছোট পলিওমাইয়েলাইটিসের প্রতি তত সে স্পর্শকাতর। তাছাড়াও ডাক্তাররা লক্ষ্য করেছেন যে এই রোগের শুরুতে শিশু যত বেশী ছোটাছুটি করে রোগের শেষে তার তত বেশী কঠিন ইনফ্যানটাইল প্যারালিসিস হয়। কাজেই পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ সন্দেহ হলেই রোগের প্রথম দিনগুলিতেই বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কড়া নজরে রাখতে হয়।

আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেই সাধারণত পলিওমাইয়েলাইটিসের বেশী প্রাদুর্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলা চলে যে এই রোগ মরসুমী রোগ। এমনও হতে পারে যে এই কয়েক মাসে অসুখটা ছড়ানোর কারণ হল এই যে এ সময় মাছির সংখ্যা বেড়ে যায় ও বাইরেতেও অন্য সময়ের তুলনায় ইনফেকশন জমে বেশী। কিন্তু এক এক সময় মাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ও এই রোগ বিস্তার লাভ করার মধ্যে কোন সম্বন্ধই খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় যে এই রোগটি ছড়ায় বিভিন্ন উপায়ে।

এমন মতও আছে যে গরমের সময় মানুষের শরীরের উপর বিশেষ কতগুলি ফিজিওলজিক্যাল ও মিটিয়রলজিক্যাল ফ্যাক্টর তাদের প্রভাব বিস্তার করে দেহকে এই রোগের উপযোগী করে তোলে। এ সম্বন্ধে অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউই সোজা কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেননি; কিন্তু তাহলেও একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে গরমের সময়েতেই যখন এই রোগ বেশী বৃদ্ধি লাভ করে তখন সে সময় জ্বর হলেই খুব সাবধান হওয়া উচিত, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

কী ধারায় চলে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগ? ইনফেকশন হওয়া থেকে শুরু করে রোগের প্রথম উপসর্গ দেখা দেওয়া পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাকেই বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এ হল রোগের গুপ্ত সময়। পলিওর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ছয় থেকে দশ দিন। অবশ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড আরও বেশী দিন ধরে চলতে পারে তবে তা নির্ভর করে কতগুলি কারণের উপর। যেমন যে ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে তার শক্তি, তার প্রতি রোগীর দেহের স্পর্শকাতরতা বা সাসেপ্টিবিলিটি কতখানি ও দেহের কোন জায়গা দিয়ে ঢুকেছে সেই ইনফেকশন ইত্যাদি।

নিজের আসল রূপ নিয়ে দেখা দিলে এই রোগে চারটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ ইনফেকশনের পর্যায়, প্যারালিসিসের পর্যায়, রোগের অধোগতির পর্যায় ও শেষ পর্যন্ত রয়ে যাওয়া উপসর্গের পর্যায়। প্রথম পর্যায়টা খুবই ক্ষণস্থায়ী, চলে মাত্র দু তিন দিন, অবশ্য এক এক সময় ৫ দিন পর্যন্তও চলতে পারে। সে সময় দেখা দেয় শরীরের দুর্বলতা, গা ম্যাজম্যাজ করা ইত্যাদি। পেতিয়ার কেসের বিবরণ দিতে গিয়ে আমরা আগেই বলেছি যে পলিওমাইয়েলাইটিসকে এই সময় অন্য রোগ থেকে আলাদা করা খুবই শক্ত।

প্যারালিসিস পর্যায় আসে ভাইরাস নার্ভাস সিস্টেম আক্রমণ করার পর। তখন দেহের বিভিন্ন মাংসপেশীর প্যারালিসিস হয়। এই পর্যায়টি চলে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত। তারপর আসে রোগের অধোগতির পর্যায় বা সেরে ওঠার পর্যায়।

টেম্পারেচার কমে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় সেরে ওঠার পর্যায়। রোগ শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্যারালিসিস পর্যায়ের উপসর্গগুলি কমে আসতে থাকে। তবে বিভিন্ন রূপ নিয়ে এই অবস্থাটি অনেক দিন ধরে চলতে পারে। কোন কোন সময় দু মাসের মধ্যেই প্যারালিসিস হওয়া মাংসপেশীগুলি সম্পূর্ণভাবে সচল হয়ে ওঠে, কিন্তু আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সারাবার জন্য বহু বছর ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে চিকিৎসা করে যেতে হয়।

শেষের পর্যায় হল রয়ে যাওয়া উপসর্গের পর্যায়; এই নামটি থেকেই বোঝা যায় যে রোগের পরিণতি রয়ে গেছে, রয়ে গেছে প্যারালিসিস যাকে আর সারাবার উপায় নেই। এই সময় রোগীকে সাহায্য করা মানে তার কষ্ট লাঘব করা। এই পর্যায়ে যা করা যায় তা হল বিকলাঙ্গতার জন্য মাংসপেশী বা টেন্ডনের উপর অর্থোপেডিক অপারেশন, ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করা, স্প্লিন্ট প্রভৃতির সাহায্যে চলা ফেরার সুবিধা করা ইত্যাদি।

কিন্তু কোন কোন কেসে রোগের প্রথম তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শরীরচর্চা, মালিশ, বৈদ্যুতিক চিকিৎসা, মাটি মেখে চিকিৎসা প্রভৃতি চালিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংসপেশীগুলির কাজ অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক করে তোলা যায়। এমন কেসও হয় যাতে রোগের শুরু থেকে ১০—১৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপি করতে করতে তারপর উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়।

রয়ে যাওয়া উপসর্গের মধ্যে নানান রকমের প্যারালিসিস দেখা যায়। গাঁট নড়ানর মাংসপেশীগুলি অবশ হয়ে কখন কখন রোগীর হাত পা গুটিয়ে যায়। এই রকম ভাবে হাত পা গুটিয়ে যাওয়া অনেক পরিমাণে নির্ভর করে রোগের একিউট পর্যায়ে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে রাখার কায়দার উপর।

পলিওমাইয়েলাইটিস রোগকে পুরোপুরি সারানোর চেয়ে এই রোগ নিবারণ করা ঢের সহজ। মাংসপেশীর চলনশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী খুব বেশী সংখ্যক স্পাইন্যাল কর্ডের নার্ভ কোষ মরে গেলে সে সব মাংসপেশীর কাজ পুরোপুরি ফিরিয়ে আনার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অন্য টিসুর কোষের মতো নার্ভ কোষ বংশবৃদ্ধিও করে না বা তাকে পুনরুদ্ধার করাও সম্ভব নয়, তাই বহু সংখ্যক নার্ভ কোষ মরে গেলে মাংসপেশীর অক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তাতেও যে খানিকটা উন্নতি দেখা যায় তার কারণ অন্যান্য নার্ভ কোষের যে কেন্দ্রগুলি বেঁচে থাকে তাদের শক্তি বর্ধন ও কাজের উন্নতি। অবশ্য এই সামান্য উন্নতিটুকুও পেতে হলে মাংসপেশীগুলির খানিকটা সুস্থ অবস্থায় থাকা চাই।

দাঁড়ান ও নড়াচড়ার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে বা অবশ হয়ে যাওয়া মাংসপেশীগুলির কাজ উন্নত করতে হলে চিকিৎসামূলক ব্যায়াম তাতে খুবই সাহায্য করে। বর্তমানে পা অবশ হয়ে যাওয়া শিশুদের হাঁটা শিক্ষার একটা চমৎকার পদ্ধতি তৈরী হয়েছে। সাধারণ ব্যায়াম ও মালিশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী এক্সারসাইজ চালিয়ে যেতে হয়।

কব্জাবিহীন স্প্রিং-এর এমন এক বিশেষ যন্ত্র এখন তৈরী হয়েছে যার সাহায্যে হাঁটার সময় রোগীর মাংসপেশীর সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই তার সমস্ত গাঁটে এমন মুভমেণ্ট হয় যে তার হাঁটা স্বাভাবিক হাঁটার মতই দেখতে হয়। অনুশীলন করতে করতে শিশু রোগীদের হাঁটার একটা অভ্যাস জন্মে যায়। এতে যে সমস্ত মাংসপেশী অক্ষত রয়েছে তারাও অবশ হয়ে যাওয়া মাংসপেশীর কাজ কিছু পরিমাণে গ্রহণ করে। পলিওমাইয়েলাইটিস হওয়ার পর তাই যত তাড়াতাড়ি এই সব স্প্রিং-এর যন্ত্রে অনুশীলন আরম্ভ করা যায় রোগীর পক্ষে তত তাড়াতাড়ি ফল লাভ করার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এপিডেমিক পলিওমাইয়েলাইটিসের রয়ে যাওয়া উপসর্গের চিকিৎসার জন্য এখন স্বাস্থ্য নিবাস ইয়েভপাতোরিয়াতে এবং 'কালুগা বর' স্যানাটোরিয়ামে ও আরও অন্যান্য জায়গায় কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র সংগঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পলিওমাইয়েলাইটিসের রয়ে যাওয়া উপসর্গ চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত কাজাকস্তানের শিশু চিকিৎসা স্যানাটোরিয়াম 'আক্সায়া'র অভিজ্ঞতা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেই চিকিৎসা কেন্দ্রে মালিশ, ব্যায়াম, বিভিন্ন রকমের বাথ, মাটি মেখে চিকিৎসা, তাপ চিকিৎসা প্রভৃতি বহু প্রকারের চিকিৎসা করা হয়।

অনেকেই জানেন যে অনেক কেসে প্যারালিসিস প্রভৃতি কোন রকম খারাপ উপসর্গ না হয়েই পলিওমাইয়েলাইটিস সেরে যায়। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? প্রথম হল তা নির্ভর করে

ইনফেকশনের সময় কী সংখ্যায় পলিওমাইয়েলাইটিসের ভাইরাস রোগীর দেহে প্রবেশ করেছে। তার উপর, দ্বিতীয়ত, ভাইরাসের নিজস্ব সক্রিয়তার উপর এবং সব শেষে রোগ কী ভাবে চলবে তা নির্ভর করে রোগীর স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থার উপর। যদি শিশু রোগীর দেহে আগে কখন সামান্য কিছু পলিওভাইরাসও প্রবেশ করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বার ইনফেকশন পড়ার আগে রোগীর দেহ তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য কিছুটা প্রস্তুত হয়েই থাকে, অর্থাৎ রোগীর দেহে ইমিউনিটি জন্মে বা রোগের প্রতি তার স্পর্শকাতরতা অন্তর্হিত হয়।

শরীরে ইনফেকশন হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি শুরু হওয়ার আগে শরীরে তৈরী হয় ভাইরাস বিরোধী পদার্থ বা এণ্টিবডি। এণ্টিবডি হল এক রকমের বিশেষ বায়োকেমিক্যাল পদার্থ যা তৈরী হয় ভাইরাস ইনফেকশন জনিত কোষের ইরিটেশনের ফলে। এই সব পদার্থ রক্তের মধ্যে যদি থাকে তাহলে তা ভাইরাসকে মেরে ফেলে। কিন্তু তার আগেই যদি ভাইরাস কোন প্রকারে নার্ভাস সিষ্টেমে ঢুকে পড়তে পারে তাহলে এণ্টিবডির পক্ষে সে পর্যন্ত ভাইরাসকে ধাওয়া করা মুশকিল। ভাইরাস সেখানে তার দুর্গ গেড়ে বসে যায়। অন্য দিকে ভাইরাস যদি রক্তে পেঁাছে এণ্টিবডির পর তাহলে সেখানেই তার রাস্তা বন্ধ হয়, কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিষ্টেম পর্যন্ত তা আর পেঁাছতে পারে না। সেখানে রক্তের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। অমন দেহে ঐ রোগ তাই ঢের হালকাভাবে চলে।

কাজেই মানুষকে যদি এই রোগে ভোগার হাত থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে দেহের মধ্যে এণ্টিবডির বাধা সৃষ্টি করতে হয় যা ভাইরাসের পথে বেড়া সৃষ্টি করে কিছুতেই আর তাকে নার্ভাস সিষ্টেমে পেঁাছতে দেবে না। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জিনিস হল ভ্যাকসিন।

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করার জন্য এই রোগ বিরোধী ভ্যাকসিনের কথা বহু দিন ধরে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বহু অধ্যবসায় নিয়ে চেষ্টা করেও বহু দিন সে রকম ভ্যাকসিন তৈরী করা সম্ভব হয়নি। কেননা সহজে বহু সংখ্যক ভাইরাস একত্র সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৯-৫১ সালে যখন ডাঃ এণ্ডার্স টিসুর উপর কালচার করে ভাইরাস সংগ্রহের উপায় আবিষ্কার করেন ও তারপর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাকে আরও উন্নত করতে সমর্থ হন তখনই সত্যিকারে সেই সমস্যা সমাধানের আশা উন্মুক্ত হয় যার উপর নির্ভর করে হাজার হাজার শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্য। যাঁরা প্রথম পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী ভ্যাকসিন তৈরী করার প্রচেষ্টা করেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ডাঃ জোনাস সল্ক হলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা চালান ১৯৫২-৫৩ সালে।

সল্কের পদ্ধতি অনুযায়ী দেহের বাইরে কাচের পাত্রে মূত্রাশয় থেকে নেওয়া টিসুর কালচারে পলিওমাইয়েলাইটিসের তিন রকম ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করান হয়। কাচের পাত্রে রাখা হয় বানরের মূত্রাশয়ের টুকরো যুক্ত বিশেষ পুষ্টি মিডিয়াম। সেই পুষ্টি মিডিয়ামের

সলিউশনে কয়েক দিন ধরে বংশবৃদ্ধি করে জমা হয়ে ওঠে বহু সংখ্যক পলিওভাইরাস। তারপর সেই ভাইরাসকে নির্জীব করে মেরে ফেলা হয় হালকা ফরম্যালিন সলিউশন দিয়ে। ভাইরাস তখন তার ইনফেকশনের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সংক্ষেপে এই হল সল্কের পদ্ধতির সারমর্ম।

মৃত ভাইরাস যদি দেহের মধ্যে ইঞ্জেকশন করা হয় তাতে তখন রক্তের মধ্যে তৈরী হয় এক রকমের ভাইরাস বিরোধী পদার্থ যাকে বলে এন্টিবডি। এর ফলে মানুষের দেহে পলিওমাইয়েলাইটিসের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি জন্মে।

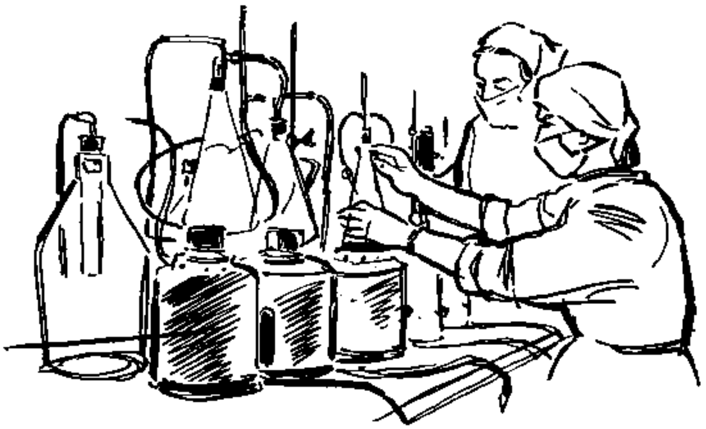

সল্কের মৃত ভ্যাকসিন সিরিঞ্জে করে চামড়ার তলায় বা মাংসপেশীর ভিতর ইঞ্জেকশন করতে হয়। প্রথমে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ব্যবধানে ১ সিঃ সিঃ করে দুবার ইঞ্জেকশন করতে হয় এবং তারপর আরও দুবার তা দিতে হয় ৭ থেকে ১২ মাসের ব্যবধানে।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সল্কের মৃত ভ্যাকসিন সোভিয়েত ইউনিয়নে ও আরও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (বিশেষ করে ব্যবহার হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)। এতেই পলিওমাইয়েলাইটিস নিবারণে প্রথম সুফল লাভ করা সম্ভব হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর পলিওমাইয়েলাইটিস ইনস্টিটিউট ১৯৫৬-৫৭ সালে এই ভ্যাকসিন তৈরীর অতি জটিল টেকনিকটি রপ্ত করতে সমর্থ হয় (এর জন্য প্রতি বছর ভারতবর্ষ ও চীন দেশ থেকে প্রায় ১০ হাজারের মতো মাকাক-রিসাস বানর আমদানি করতে হত)। ১৯৫৭-৫৮ সালে মস্কোর পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী ভ্যাকসিন তৈরীর আর একটি ইনস্টিটিউটও মৃত ভাইরাসের পলিওভ্যাকসিন বের করে। গুণের দিক থেকে সোভিয়েতের ভ্যাকসিন আমেরিকার সেরা পলিওভ্যাকসিন, সল্কের ভ্যাকসিন থেকে

কোন অংশে খারাপ হয়নি। ১৯৫৭ সাল ও ৫৮ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট প্রায় এক কোটি শিশুকে, সল্কের উপায়ে মাংসপেশীর মধ্যে ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন করে ইমিউনাইজ করা হয়।

সল্কের উপায়ে ভ্যাকসিন দিয়ে ভ্যাকসিন না নেওয়া শিশুদের তুলনায় ভ্যাকসিন নেওয়া শিশুদের মধ্যে প্রায় ৭৫% থেকে ৮০% মতো শিশু প্যারালিসিসের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা যায়। টিকা দেওয়া সত্ত্বেও যাদের এ রোগ দেখা দেয় তাদের মধ্যে ঐ রোগে মৃত্যু হওয়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ এতে রোগের তীব্রতা অসম্ভব রকম কমে আসে। সল্কের প্রথায় ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু হওয়ার পরই সর্ব প্রথম বড় রকমের আশা দেখা দেয় যে, পলিওমাইয়েলাইটিসের মতো দুর্ধর্ষ ইনফেকশনের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম সফল হবে।

কিন্তু সল্কের মৃত ভাইরাস থেকে তৈরী ভ্যাকসিনের অনেক গুণ থাকলেও তাকে কিছুতেই পলিওমাইয়েলাইটিস প্রতিরোধের আদর্শ ভ্যাকসিন বা বিরাট জনসংখ্যাকে ঐ রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার সন্তোষজনক উপায় বলে বর্ণনা করা চলে না। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও ঐ শিশুদের বেশ বড় এক অংশ, প্রায় ২০% থেকে ৩০% শিশু প্যারালিসিস প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করে না। অর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ঐ ভ্যাকসিন তেমন শক্তিশালী নয়। তাছাড়াও, সল্কের ভ্যাকসিনের ইঞ্জেকশন নেওয়ার পরও পলিওভাইরাসের উপসর্গবিহীন ইনফেকশন হতে পারে; ঐ ভাইরাস তখন আশ্রয়দাতা শিশুর অন্ত্রের দেওয়ালে বংশবৃদ্ধি করে নতুন করে অন্য লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

সল্কের ভ্যাকসিন তাই নতুন মহামারীর বিপদ দূর করে না, কেননা ঐ রোগের বীজাণু— পলিওমাইয়েলাইটিস ভাইরাস, মানুষ থেকে মানুষে প্রবাহিত হতে হতে এক এক সময় একসঙ্গে এমন অনেক লোক পেয়ে যেতে পারে যাদের ঐ বীজাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটুও ক্ষমতা নেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে যত ভালই গণ ভ্যাকসিনের সংগঠন থাকুক না কেন জনসংখ্যার সমস্ত শিশুকে ভ্যাকসিন দিয়ে ওঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঐ যে কিছু ভ্যাকসিন না নেওয়া শিশু রয়ে গেল, সবার আগে তারাই হল পলিওমাইয়েলাইটিসের নিভু নিভু আগুনকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তোলার ইন্ধন। সল্কের ভ্যাকসিন মাংসপেশীর ভেতর ইঞ্জেকশন করে দিতে হয় বলে গণ ভ্যাকসিনের পক্ষে ঐ ভ্যাকসিন তেমন সুবিধেজনক নয়, বিশেষ করে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যদি তাকে কয়েকবার করে দিতে হয়। সল্কের ভ্যাকসিন তৈরী করতে প্রচুর বানর দরকার হয় যাদের মূত্রাশয় টিসু দিয়ে পুষ্টি মিডিয়াম তৈরী করে পলিওমাইয়েলাইটিস ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করাতে হয়, তাছাড়াও আবার সেই ভ্যাকসিনের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যও অনেক বানর দরকার। এই সব কারণে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ ভ্যাকসিন তৈরী করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সল্কের ভ্যাকসিনের চেয়ে উন্নততর, বেশী কার্যক্ষম ও গণ ভ্যাকসিনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক তেমন কোন ভ্যাকসিন কি বেরিয়েছে?

হ্যাঁ, তেমন ভ্যাকসিন বেরিয়েছে এবং আমাদের দেশে তা এখন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঐ ভ্যাকসিনকে বলে 'জীবন্ত ভ্যাকসিন', তাতে পলিওমাইয়েলাইটিসের ভাইরাস জাতীয় অন্য এক রকম নির্জীব করা ভাইরাস থাকে যা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপদবিহীন।

আজ বহুদিন হল বসন্ত, রেবিস, পীত জ্বর তুলারিমিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে ভ্যাকসিন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে জীবন্ত ভ্যাকসিন। পলিওমাইয়েলাইটিসের নতুন ভ্যাকসিনও বসন্তের ভ্যাকসিনের মতই রোগ প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। তবে তাতে থাকে মানুষ ও বানরের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপদবিহীন পলিও গোষ্ঠীর এক রকম ভাইরাস। সে ভাইরাসকে বিশেষভাবে সিলেকশন করে, তাকে অন্য স্ট্রেন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে তাতে বিশেষ চরিত্র আরোপ করার জন্য কয়েক পুরুষ ধরে বিশেষভাবে কালচার করিয়ে নেওয়া হয়। যেমন ভাবে কৃষিতে উদ্ভিদ ও পশু প্রজননের ক্ষেত্রে স্পেশাল সিলেকশন করে মানুষের পক্ষে উপকারী উদ্ভিদ ও পশুর নতুন সর্ট সৃষ্টি করা হয় ঠিক তেমনি ভাবেই স্পেশাল সিলেকশন করে এই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা হয়।

ডাঃ আলবের্ট সেবিন অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে মানুষের পক্ষে বিপদবিহীন ঐ নির্জীব বা দুর্বল করা পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী জীবন্ত ভ্যাকসিনের নতুন স্ট্রেন বের করতে সমর্থ হন।

১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মস্কোর পলিওমাইয়েলাইটিস গবেষণা ইনস্টিটিউটে ও লেনিনগ্রাদের এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের ইনস্টিটিউটে ঐ স্ট্রেন নিয়ে জোর পরীক্ষা চলে। তাতে দেখা যায় যে ঐ স্ট্রেনকে পলিওমাইয়েলাইটিসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা চলে। একই সময় অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও ঐ স্ট্রেন পরীক্ষা করে অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও কিছু শক্তিশালী আমেরিকান ফার্মের তৈরী সল্কের ভ্যাকসিন অধিকতর উন্নত 'জীবন্ত ভ্যাকসিনের' ব্যাপক প্রয়োগ অনেক পরিমাণে আটকে রাখে। ঐ সব ফার্ম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং 'জীবন্ত ভ্যাকসিন', এই নামের সুযোগে নতুন ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে ভয় প্রচার করে সে ভ্যাকসিনের প্রচলন বন্ধ করে রাখে।

সোভিয়েত মেডিসিন ব্যবসাদারী মেডিসিনের সমস্ত কুসংস্কার ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত মেডিসিন। তাই যখনই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, জীবন্ত ভ্যাকসিনই হল পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী অধিকতর শক্তিশালী ভ্যাকসিন তখনই একটুও সময় নষ্ট না করে ঐ ভ্যাকসিন তৈরী করার অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবেই গত দেড় বছরে,

পলিওমাইয়েলাইটিসের মহামারী বিরোধী সবচেয়ে শক্তিশালী ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ থেকে অনেক এগিয়ে যায়।

মস্কোতে তৈরী পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী জীবন্ত ভ্যাকসিনের সাহায্যে আমাদের দেশে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে টিকা দিয়ে ১৯৫৯ সালেই ১ কোটি ৫০ লক্ষের উপর মানুষকে ইমিউনাইজ করা হয়। তাতে করে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে (যেমন এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে) পলিওমাইয়েলাইটিসের প্রাদুর্ভাব ১০ থেকে ২০ গুণ কমিয়ে ঐ রোগের মহামারী ঠেকানো সম্ভব হয়। জীবন্ত ভ্যাকসিন শরীরের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকারক নয় বা তাতে কোন রকম খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্যরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর দেশের ২ মাস থেকে ২০ বছর বয়স্ক সমস্ত মানুষকে (প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশী মানুষ হবে) জীবন্ত ভ্যাকসিনের টিকা দিয়ে ইমিউন করার কর্মধারা অনুমোদন করেন। এখন ঐ কর্মধারা সফলভাবে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চলেছে, ১৯৬০ সালের প্রথম ৬ মাসেই ৬ কোটি ৫০ লক্ষের উপর মানুষকে দুই তিন বার করে পলিওমাইয়েলাইটিসের জীবন্ত ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। তাছাড়াও, মিত্রতামূলক সাহায্য হিসাবে পলিওমাইয়েলাইটিস গবেষণা ইনস্টিটিউট দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সোভিয়েতের তৈরী জীবন্ত ভ্যাকসিন পাঠায়। হাঙ্গারীতে পাঠানো হয় ২৫ লক্ষ লোকের উপযুক্ত ভ্যাকসিন, জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিকে পাঠানো হয় ৬০ লক্ষ লোকের উপযুক্ত ভ্যাকসিন, চেকোস্লোভাকিয়ায় ২৫ লক্ষ এবং বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও পাঠানো হয় ঐ পরিমাণ লোকের উপযুক্ত ভ্যাকসিন।

মৃত ভ্যাকসিনের তুলনায় জীবন্ত ভ্যাকসিন কিসে ভাল? জীবন্ত ভ্যাকসিন দিতে বেদনাদায়ক ও অসুবিধাজনক ইঞ্জেকশনের সাহায্য নিতে হয় না। ঐ ভ্যাকসিনের ২—৩ ফোঁটা জলের সাথে মিশিয়ে বা মুখরোচক লজেঞ্চুস জাতীয় বড়ির মধ্যে ভরে খেতে দেওয়া হয়। তাই ঐ ভ্যাকসিনের সাহায্যে গণ ভ্যাকসিন দেওয়া যথেষ্ট সুবিধাজনক। এতে ইঞ্জেকশনের সূচও ফোটাতে হয় না বা শিশুর চোখের জলও মোছাতে হয় না। এতে করে যথেষ্ট কম সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার সমস্ত শিশু বাচ্চা ও অল্পবয়সী যুবকদের ভ্যাকসিন দেওয়া যায়।

পলিওমাইয়েলাইটিস বিরোধী জীবন্ত ভ্যাকসিন তৈরী করাও তেমন কঠিন নয়, ঐ ভ্যাকসিন যত খুশি তত পরিমাণ তৈরী করা চলে এবং এক বছরে দেশে যত মানুষ আছে তাদের সবার উপযুক্ত ভ্যাকসিন তৈরী করে ফেলা যায়। মৃত ভ্যাকসিনের তুলনায় এই ভ্যাকসিন তৈরী করতে ১০০ গুণেরও কম বানর দরকার হয় এবং এর জন্য মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থও অনেক কম খরচ করতে হয়। সল্কের ভ্যাকসিনের তুলনায় জীবন্ত ভ্যাকসিনের গুণাবলী পরীক্ষা করাও ঢের সহজ এবং সে পরীক্ষার ফল অনেক বেশী

নির্ভরযোগ্য। সব শেষে সল্কের ভ্যাকসিনের তুলনায় জীবন্ত ভ্যাকসিন অনেক বেশী কার্যকরী, কেননা এর সাহায্যে জনসংখ্যার কাউকে বাদ না দিয়ে সমস্ত মানুষকেই একত্র ভ্যাকসিন দেওয়া চলে (এর সবচেয়ে বড় গুণ হল এর গণ ভ্যাকসিন উপযোগী চরিত্র)। তাছাড়াও দেখা গেছে যে, এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পর, যারা সে ভ্যাকসিন নিল তাদের বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এই রকম মানুষের দেহে পলিওমাইয়েলাইটিসের বিরুদ্ধে শুধু যে এণ্টিবডি তৈরী হয় তা নয়, তাছাড়াও, আস্তে আস্তে তাদের দেহে, খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে টিস্যুতে ঐ ইনফেকশন প্রবেশ করা প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা জন্মে; অর্থাৎ যাকে বলে ইনফেকশন ঢোকার দরজার মুখে ঐ বীজাণুর বংশবৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে পলিওমাইয়েলাইটিস রোগের ভাইরাসের সার্কুলেশন কমে আসে ও তারপর তা সমূলে ধ্বংস হয়। কাজেই মৃত ভ্যাকসিনের ইঞ্জেকশনের তুলনায় জীবন্ত ভ্যাকসিনের ইমিউনিটি অনেক বেশী দৃঢ়ভিত্তিক।

জীবন্ত ভ্যাকসিনের ক্রিয়া দৃঢ় করার জন্য প্রতি বছর একবার করে ভ্যাকসিন ভরা লজেঞ্চুস খেতে হয়। এ আর তেমন শক্ত কী?

আগামী তিন বছরের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা যাবে জীবন্ত ভ্যাকসিনের পর কতদিন টিকে থাকে তার ইমিউনিটি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশও জীবন্ত ভ্যাকসিন তৈরী করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা এক ধারায় যুক্ত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পলিওমাইয়েলাইটিসের মতো মারাত্মক শত্রুর পথ একেবারে রুদ্ধ করে দেবে।

উপরে আমরা আগেই বলেছি যে পলিওমাইয়েলাইটিসের পর প্যারালিসিস হলে তা পুরোপুরি সারিয়ে তোলা খুবই কঠিন। এখন কিন্তু চিকিৎসা করে তা সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলার আশা দেখা দিচ্ছে। অবশ মাংসপেশীর চিকিৎসায় চিকিৎসামূলক ব্যায়ামের সঙ্গে নার্ভ ও মাংসপেশী স্টিমুলেট করার কিছু নতুন ওষুধও এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগ পুরোপুরি সারান না গেলেও অনেক পরিমাণে রোগীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। অবশ হয়ে যাওয়া মাংসপেশীর পুষ্টির জন্য আজকাল কয়েকটি এমাইনোত্রসিড ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলেও মাংসপেশীর দুর্বলতার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল চিকিৎসামূলক ব্যায়াম, মালিশ এবং ফিজিওথেরাপি ও অর্থোপেডির বিভিন্ন ব্যবস্থা।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সৃজনশীলভাবে বিজ্ঞানের সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে বাচ্চাদের মধ্যে শিশু প্যারালিসিস হওয়া বন্ধ করা যায়।

ব্যাপকভাবে জীবন্ত ভ্যাকসিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আজ খুলে গেছে পলিওমাইয়েলাইটিসের প্যারালিসিস নিবারণের প্রশস্ত পথ।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

২১, জুবোভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers

21, Zubovsky Boulevard,

Moscow, Soviet Union